বায়ু পরিবর্তনে এসে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই স্থান কাল পাত্রের অপরিবর্তনীয় রূপটা বড় বেশী করে অনুভব করতে লাগলাম। ছোট শহর। শহর নয়, গ্রামই বলা চলে। এখানে-ওখানে কিছু কিছু বাড়ি ছড়িয়ে আছে। বেশির ভাগই তালাবন্ধ। বাড়ি আর বাগান মালীদের রক্ষণাধীন। চেঞ্জারদের ভিড় এড়াবার জন্যে আমরা দিন দশেক আগেই এসে পড়েছি। কয়েকটি দিন নিরিবিলিতে প্রকৃতির কোলে চুপচাপ শুয়ে বসে ঘুমিয়ে কাটিয়ে যাব এই আশা।

আমার যাঁরা সঙ্গে এসেছেন—বলা ভাল আমি যাঁদের সঙ্গে এসেছি, তাঁরা নিরিবিলিতে থাকবার মানুষ নন। দুই জোড়া

স্বামী স্ত্রী, সঙ্গে পুত্রকন্যাও গুটি চারেক আছে। দুই ভদ্রলোকই একই ইন্সিওরেন্স আফিসে কাজ করেন। তাঁদের স্ত্রীদের মধ্যেও বেশ বন্ধুত্ব আছে। হৈ-চৈ গল্পগুজবে বাড়িটাকে তাঁরা প্রায় একটা পাড়া করে তুলেছেন। আমি এসেছি একা তাঁদের অতিথি হয়ে। আদর আপ্যায়ন পরিচর্যার কোন ত্রুটিই হচ্ছে না। আমি সবই পাচ্ছি। তাঁদের সান্নিধ্য আর সাহচর্য ছাড়া। দোষটা আমারই। সকলের সান্নিধ্য আমি নিতে পারি না, দেওয়ার সাধ্যও কম। তাই তাঁরা যখন তাস খেলেন কি বেড়াতে বেরোন, আমি ইচ্ছা করেই একটু দূরে সরে থাকি। অবসরমত বই পড়ি। পড়তে ভাল না লাগলে ছোটখাট পাহাড়গুলির দিকে চেয়ে থাকি।

বই যা সঙ্গে ছিল আমার আর তাঁদের, কয়েক দিনের মধ্যেই সব শেষ হল। সময় আর কাটে না। ও'দের সময় তাসের সেতুর উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ও'রা টেরও পান না। সেদিন বিকেলে ও'রা যখন গভীরভাবে মগ্ন, আমি অরসিক দর্শকের আসন থেকে এক ফাঁকে উঠে বেরিয়ে পড়লাম।

ছোট একটি জংলা পাহাড় ডানদিকে রেখে পিচের ঢালু রাস্তা দিয়ে আমি এগিয়ে চললাম। পথের একটা নেশা আছে। বিশেষ করে অচেনা পথের। তা কেবলই সামনের দিকে টানে। দু দিকেই লোকালয়। সাঁওতাল-পল্লী। কিছুটা দেহাতী বিহারী-দের বাস। পিচের রাস্তা ছেড়ে কখন কাঁচা রাস্তা আরম্ভ হয়েছে আমি খেয়াল করিনি। যখন খেয়াল হল, দেখি চারদিকেই পাহাড়। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। ডাইনে বাঁয়ে পথের চিহ্ন যে দেখা যাচ্ছে না তা নয়, কিন্তু কোন্ পথে যে এসেছি, কোন্ পথ দিয়ে গেলে যে সুবিধা হবে, তা ঠিক করতে পারছি না। ধারে কাছে এমন কেউ নেই যে, জিজ্ঞাসা করে নেব। এদিকে টর্চ সঙ্গে নেই, হাতে একখানা লাঠিটাঠি পর্যন্ত নেই। পকেটে একটিমাত্র কলম সম্বল। তরবারির সঙ্গে তার তুলনা ত দূরের কথা, তাকে দিয়ে ছুরি-কাটারির কাজও চলবে না। হঠাৎ আমি বড় অসহায় বোধ করলাম। চোর ডাকাত সাপ বাঘের ভয়ে যে আতঙ্ক হল তা নয়, আমার মনে হল আমি যেন হারিয়ে গিয়েছি। বেরোবার পথ আর কোন দিন খুঁজে পাব না।

আমি মরীয়া হয়ে যে পথ সামনে পেলাম, সেই পথেই জোর পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম। হঠাৎ সামনে এক ছায়ামূর্তি। আমি থমকে দাঁড়ালাম। মনের এইসব অবস্থায় এক অহেতুক আদিম ভয় আমাদের এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, পরিচিত গাছপালা কুকুর বিড়ালও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। মানুষকেও মনে হয় কোন এক অপার্থিব জগতের বাসিন্দা।

আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, "কে আপনি?"

ভদ্রলোক আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমার নাম রাম-জীবন চক্রবর্তী। আপনি কি এদিকে নতুন এসেছেন? বেড়াতে বেরিয়েছেন?"

তাঁর মুখে পরিষ্কার বাংলা ভাষা শুনে আমি আশ্বস্ত হয়ে বললাম, "হ্যাঁ। শহরের রাস্তাটা আমি ঠিক চিনে উঠতে পারছি না। আপনি যদি দয়া করে—।"

রামজীবনবাবু বললেন, "আসুন আমার সঙ্গে।"

তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি আমার পরিচিত পথটি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

এবার আমি আমার সেই ভীতসন্ত্রস্ত মনকে নিজেই পরিহাস করতে পারি। ছি-ছি-ছি, এত ভয় পাবার কী হয়েছিল! আমার মত বয়স্ক লোকের হারিয়ে যাবার জায়গা কি এত কাছে আছে? তা কি এত সহজে মেলে? আমার মনে পড়ল, ছেলে-বেলায় গাঁয়ে থাকতে একবার আমাদের পাড়ার চৈত্র-সংক্রান্তির মেলায় বছর ছয়েক বয়সের সময় এমনি হারিয়ে যাবার আতঙ্কে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। কাকার সঙ্গে সেই মেলায় গিয়েছিলাম। তাঁর হাত ধরে চলতে চলতে কখন যে তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছি তার ঠিক নেই। তাঁকেও পাচ্ছি না, ভিড়ের মধ্যে বেরোবার পথও পাচ্ছি না। খানিক বাদেই দেখি, কাকা আমাকে ব্যস্ত হয়ে খুঁজছেন। তিনি আমাকে দেখে হেসে বললেন, "তুই যে হারিয়ে গিয়ে-ছিলি।"

তাঁকে দেখে আমিও হাসলাম। কিন্তু তার আগের কয়েক মুহূর্তের আতঙ্ক আমার মনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে ছিল। শৈশব-বাল্যের সেই স্তূপীকৃত ভয় আর আতঙ্ক কি কোন কোন সুযোগে আমাদের মনের উপরের তলায় উঠে এসে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের যুক্তিবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেয়? মনে মনে নিজের হাস্যকর ভীরুতার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করবার পর আমি বললাম, "এবার আমি যেতে পারব।"

রামজীবনবাবু বললেন, "এই কাছেই আমার বাড়ি। দয়া করে যদি একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যান বড় আনন্দ পাব।"

ভদ্রলোক বিনয়ের অবতার। কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে আমি হাসতে পারলাম না। ভদ্রলোক অতি বৃদ্ধ। সত্তরের কাছাকাছি হবে বয়স। মাথার চুল সব পাকা। দাঁত সামান্যই অবশিষ্ট আছে। চেহারা একেবারে জীর্ণ। গলায় পৈতা। খোলা গা। হাতের ছড়িখানা চাষীদের ছড়ির মত। ছেলেবেলায় গাঁয়ে যেসব প্রতিবেশীকে ঠাকুরদা বলে ডাকতাম, তাঁদের কথা আমার মনে পড়ল। বললাম, "চলুন, দেখে আসি আপনার বাড়ি।" খানিক এগোতেই তাঁর বাড়ির দেখা মিলল। পুরনো একতলা কোঠাবাড়ি। জায়গা যে কম তা নয়। কিন্তু কেমন যেন পড়ো বাড়ি বলে মনে হয়। পশ্চিম দিকে একটা ইঁদারা। তার পিছনে বাগান। যেন বিরাট এক অন্ধকারের রাজত্ব।

তিনি আমাকে তাঁর বাইরের ঘরখানায় নিয়ে বসালেন। সেখানে একখানা তক্তপোশ পাতা। দেয়াল ঘেঁষে খান দুই চেয়ারও রয়েছে। ছোট একটি হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম, তার রঙ একেবারে কুচকুচে কালো।

একটি ছোকরা চাকর আছে দেখলাম। সে ইঁদারার জল তুলে দিল। গামছা এগিয়ে দিল। রামজীবনবাবু সঙ্গে সঙ্গে এলেন।

আমি বললাম, "এসব কেন? আমি ত এক্ষুনি চলে যাব।"

তিনি বললেন, "তাই কি হয়! সন্ধ্যার সময় গৃহস্থবাড়িতে এসেছেন। হাত মুখ ধুয়ে একটু জলটল না খেয়ে যাবেন কী করে? চা খান ত?"

বললাম, "খাই। কিন্তু দরকার নেই ওসব হাঙ্গামার।"

রামবাবু বললেন, "তাই কি হয়?"

আমার আপত্তি না শুনে তিনি ভিতরে চলে গেলেন। খানিকক্ষণ বাদে তিনি নিজের হাতে চা আর একটা বাটিতে করে মুড়ি আর বাতাসা নিয়ে এলেন।

আমি বিব্রত হয়ে বললাম, "দেখুন ত কী কাণ্ড! আপনি বুড়ো মানুষ, কেন কষ্ট করে—।"

তিনি বললেন, "কষ্ট আর কী! আমার স্ত্রী অসুস্থ। নইলে তিনিই ওসব করতেন। আমরা যদিও সেকেলে মানুষ, কিন্তু আপনি আমাদের ছেলের মত। আপনার সামনে বেরোতে আর লজ্জা কিসের?"

কথায় কথায় তিনি বললেন, তাঁরা দুপুরুষ ধরে এই অঞ্চলে আছেন। তাঁর বাবা রেলের চাকরি নিয়ে এখানে আসেন। রামজীবনবাবুও রেলেই চাকরি করেছেন। স্টেশন মাস্টার পর্যন্ত হয়েছিলেন। নানা জায়গায় বদলি হতে হতে শেষে এখানে এসে রিটায়ার করলেন। আগে আগে বাংলা দেশের সেই হুগলী জেলায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জায়গাই পছন্দ হয়ে গেল। কিছু জমি-টমিও করলেন। নড়াচড়া আর হল না।

আমি বললাম, "আর কেউ নেই?"

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন

"না, আর কেউ নেই। আমরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দুজনই এখন এ পুরীর পাহারাদার।"

পিছনে কোন দুঃখের স্মৃতি আছে অনুমান করে আমি সতর্ক হয়ে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলাম। উঠনে চাষীশ্রেণীর জন দুই লোক এসে দাঁড়াতে তিনিও বেরিয়ে গেলেন। খানিক বাদেই ফিরে এলেন। একটু হেসে বললেন, "আমার জমি চাষ করে। সেইসব কথাবার্তা হচ্ছিল। ফসলের অবস্থা ভাল নয়। কী যে হবে! অবশ্য নিজের জন্যে আর ভাবনা কী! আমার সব ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। ওদের জন্যে—"

আমি বললাম, "এবার আমি উঠি। রাত হয়ে গেল।"

রামজীবন বললেন, "আমার একটা প্রস্তাব আছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথায় যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে বলি।"

"বলুন।"

তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমি বলি কী, এই রাত্রে আপনার আর ফিরে গিয়ে কাজ নেই। আপনি নতুন মানুষ। একা একা অসুবিধে হবে। আজকের মত এখানে থাকুন। দুটি ডাল ভাতের ব্যবস্থা করি। তারপর কাল ভোরে উঠে—।"

আমি ব্যস্ত হয়ে আপত্তি করে বললাম, "না না না, তা কী করে হয়! আমি যাঁদের সঙ্গে এসেছি, তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। হয়ত এরই মধ্যে তাঁরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছেন।"

রামবাবু কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন, "খোঁজাখুঁজি শুরু করেছেন! আচ্ছা, আপনি সেজন্যে ভাববেন না। আমি আমার লোক দিয়ে এক্ষুনি খবর পাঠাচ্ছি। আপনি তাঁদের নাম ঠিকানাটা দিন। হরিলালের একটা সাইকেল আছে। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে খবরটা পৌঁছে দিতে পারবে।"

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে তিনি হেসে বললেন, "আপনার কোনও ভয় নেই। বৃদ্ধ বাঙালী ব্রাহ্মণ। ডাকাতটাকাত কিছু নই।"

তাঁর পরিহাসে আমি একটু লজ্জিত হয়ে বললাম, "ভয়ের কী আছে! সেজন্য নয়। আপনাদের অসুবিধে হবে।"

তিনি বললেন, "অসুবিধে কী বলছেন! এখানে কি আমরা বাঙালী ভদ্রলোকের মুখ দেখি? আদর আপ্যায়নের কোন সুযোগ পাই? কেউ এলে দুটো কথা বলেও আনন্দ।"

আমি আর আপত্তি করতে পারলাম না। তিনি শহরে লোক পাঠিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে বসে শুধু সারাক্ষণ কথাই বললেন না। ফাঁকে ফাঁকে গৃহকর্মও করতে লাগলেন।

গরু আছে একটা। কিন্তু দড়ি পুরনো হয়ে গিয়েছে। যে-কোন সময় দড়ি ছিঁড়ে অন্যের জমির শস্য নষ্ট করতে পারে। তাই তিনি চাকরকে সঙ্গে করে গরুর দড়ি পাকাতে বসলেন। ভিতরে গিয়ে রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও দেখে আসতে লাগলেন। এই বয়সেও তাঁর কর্মশক্তি এবং তৎপরতা দেখে অবাক হলাম।

ঘণ্টা দুই বাদে রান্নাবান্না শেষ হল। ডাক পড়ল খাবার। রামবাবু আমাকে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। মেঝেয় আসন পাতা আছে। রামবাবুর স্ত্রী একগলা ঘোমটা টেনে ভাতের থালা দিয়ে গেলেন। ডাল, ডালের বড়া, তরকারি, ডিমের ঝোল, অনেক কিছু করেছেন।

আমি রামজীবনবাবুকে বললাম, "দেখুন ত, উনি অসুস্থ। তবু এত কষ্ট করে—"

তিনি একটু হেসে বললেন, "না করে ছাড়ল না মশাই। আমি ত বাধাই দিয়েছিলাম। কিন্তু তা কি শুনল? বললাম, তোমার শরীর খারাপ, আমিই সব করেটরে দিই। রামুনের ছেলে। সব বিদ্যাই জানা আছে। কিন্তু শুনল না।"

বললাম, "আপনি কিছু খেলেন না?"

তিনি হেসে মাথা নাড়লেন, "রাত্রে কিছু খাই না। কোন কোন দিন দুধ আর খই শুধু চলে। এই বয়সে তার বেশী সইবে কেন?"

মাঝখানে তিনি একবার উঠে গেলেন। একটা অস্পষ্ট বাক্যাংশ কানে এল, "আরে, না না, সে নয়। তার সঙ্গে কোন মিলই নেই। তুমি মাথা ঠিক করে কাজকর্ম কর ত।"

রামবাবু ফিরে এসে আবার আমার খাওয়ার কাছে বসলেন। কী প্রসঙ্গে কাকে যে ও-কথাগুলো বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। তেমন খেয়ালও করলাম না।

খাওয়াদাওয়ার পর আরও খানিকক্ষণ আলাপ আলোচনা চলল। চাষ-আবাদের কাজ দেখা ছাড়াও তিনি সকালের দিকে একটা পাঠশালায় পড়ান। বেশির ভাগই এই অঞ্চলের কিষাণ-কামলাদের ছেলে। ভারি দুষ্টু। পড়াশুনো করতে চায় না।

একটু বাদে তিনি হেসে বললেন, "আপনার বোধ হয় ঘুম পাচ্ছে!"

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, "না না না।"

তিনি বললেন, "এ ঘরটাই হার থাকবে। আপনার শোয়ার ব্যবস্থা ভিতরে করে দিয়েছি। আসুন।"

ভিতরে ছোট-বড় খান চার-পাঁচ ঘর। তার একটিতে তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা রয়েছে।

তিনি বললেন, "কুঁজো, জলের গ্লাস সব রইল। হ্যারিকেনটা ডিম করে রেখে গেলাম তক্তপোশের তলায়। তবু দরকার হলে ডাকবেন। আমি পাশের ঘরেই আছি।"

তিনি চলে যাওয়ার পর আমি দরজার খিল দিতে গিয়ে দেখলাম খিলটা ভাঙা। বাড়িটা জীর্ণ হয়ে গিয়েছে, অনেক দিন চুনকাম হয়নি, তা আগেই চোখে পড়েছিল। দরজার খিল না থাকায় আমি বেশী মাথা ঘামালাম না। এমন কোন মূল্যবান জিনিস নেই সঙ্গে, কি বেশী টাকাপয়সাও নিয়ে আসিনি যে, ভাববার কারণ থাকবে। ঘড়িটা হাতেই পরা রইল। পেনসুদ্ধ জামাটা খুলে মাথার কাছে রেখে শুয়ে পড়লাম। আর শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এল। জীবনে আমাকে আর সব-কিছুই সাধাসাধি করে আনতে হয়, করেও আনতে পারি না—একমাত্র নিদ্রাটাই এখন পর্যন্ত অনায়াসে আসে। অচেনা জায়গাতেও তার কোন সঙ্কোচ নেই।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম বলতে পারি না, হঠাৎ চোখে আলো পড়ায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে যা দেখলাম, তাতে রক্ত হিম হল। শীর্ণ শুকনো চেহারার এক বৃদ্ধা হ্যারিকেনটা উঁচু করে ধরে আমার দিকে অপলকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর মাথায় আঁচল নেই, কাঁচা-পাকা এলো চুল পিঠ ভরে ছড়ানো। লম্বাটে মুখ, ভাঙা গাল। কোটরে-বসে-যাওয়া চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। মুখে অদ্ভুত একটু হাসি।

আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম, "কে? কে আপনি? রামবাবু, শিগগির এ-ঘরে আসুন, রামবাবু!"

"কী হয়েছে? কী ব্যাপার?" বলতে বলতে রামজীবনবাবু পাশের ঘর থেকে উঠে এলেন। ঘরের ভিতরে একটু তাকিয়ে দেখে বললেন, "আপনার কোনও ভয় নেই। উনি আমার স্ত্রী।"

আর ভয় নেই। আমার তখন সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছে। এমন দশা আমার জীবনে এই প্রথম। আমি কোন কথা বললাম না।

রামবাবু তাঁর স্ত্রীকে হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "ছি-ছি-ছি, তোমাকে ফের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। তুমি এমন কাণ্ড আবার আরম্ভ করবে জানলে আমি কি ভদ্রলোককে এখানে থাকতে বলি? ছি-ছি-ছি, ওঁর কাছে আমাকে কী অপ্রস্তুত করলে বল ত।"

পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে তিনি আরও কয়েকটা কড়া ধমক লাগালেন স্ত্রীকে। তাঁর চাপা কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগল।

একটু বাদে রামবাবু ফিরে এসে বললেন, "বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে মার্জনা করতে হবে। আমি আপনার কাছে অপরাধী। তবে আপনি আমার প্রায় পুত্রতুল্য।"

আমি বিছানার উপর উঠে বসে বললাম, "না না না, আপনার অত লজ্জিত হবার কিছু নেই। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কী হয়েছে বলুন ত?"

রামবাবু বললেন, "বরং কাল শুনবেন। আজ আপনি ঘুমন। আর কোনও গোলমাল হবে না। আমি কথা দিচ্ছি।"

আমি বললাম, "না। আপনি দয়া করে আজই বলুন। ঘুম এখন আর আমার হবে না।"

রামবাবু তক্তপোশের একধারে বসে তাঁর কাহিনী বলতে লাগলেন—

"কাজকর্ম চাষ-আবাদ নিয়ে মোটামুটি সুখেই ছিলাম মশাই। সন্তান নেই—এই ছিল একমাত্র দুঃখ। আমার চেয়ে আমার স্ত্রীর দুঃখই বেশী। পুজো মানত তাবিজ কবচ সবই করে দেখা হল। কিছুতেই কিছু হল না। আমি আমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি—দেখ, ভগবান না দিলে ত আর পাবার সাধ্য নেই। এ জন্মে পেলে না, আর-জন্মে পাবে। কিন্তু মেয়েমানুষের মন কি আর সে-কথা মানে! পরের ছেলে দেখে আর তার মন আনচান করে। আমরা আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু বিধির নির্বন্ধ, নইলে আর এমন হবে কেন? আমার চল্লিশ পার হয়ে গেছে, আমার স্ত্রীও তখন একত্রিশে পড়েছে, তখন মনের অভাব্য অঘটনই ঘটল। আজ অঘটনই বলি। কিন্তু সেদিন যেন হাতে চাঁদ পেলাম। বিয়ের সময় আমার স্ত্রীর বয়স ছিল তেরো। ত্রিশ পার হবার পর সে যখন ফিস ফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে আমাকে খবরটা শোনাল, তার চেহারার দিকে চেয়ে আমার মনে হল, ফের যেন সেই কিশোরীটি আমার ঘরে ফিরে এসেছে। দুজনে মিলে তখন নিজেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা—ছেলে হবে কি মেয়ে হবে। আমরা যেন সেই প্রথম-যৌবনে ফিরে গেছি। আঙুল ধরে ভাগ্য পরীক্ষা করি। আমি দুটি আঙুল উঁচু করে ধরি। আমার স্ত্রী একটা ধরলে আমি হেসে বলি—মেয়ে। আমার স্ত্রী দুটি আঙুল বাড়িয়ে দেয়। আমি একটা ধরি। সে হেসে বলে—ছেলে, আমার আঙুলের ফলই ঠিক হবে দেখে নিয়ো। আমি বলি—ছেলে হক মেয়ে হক একটা হলেই হল। বাঁজা নাম ত ঘুচুক। সে বলে—শুধু দুর্নাম ঘোচাবার জন্যেই বুঝি? এ যে কী আরাধনার ধন, তুমি পুরুষমানুষ, তুমি তা বুঝবে না।

শেষ পর্যন্ত আমার স্ত্রীর কথাই সত্য হল। তার কামনাই ফলল। পুত্র সন্তানের মুখ দেখলাম। সে যে কী সুখ—আপনার ছেলেমেয়ে আছে? আছে। তা হলে বুঝবেন। দুজনের আহ্লাদে সোহাগে সে বড় হতে লাগল। বুড়ো বয়সের ছেলে, বুঝতেই পারেন। আমার বাবা-মা অনেক দিন আগেই গত হয়েছেন। আমার স্ত্রীর বাবা-মাও নেই। আমরাই মানিকের প্রায় ঠাকুরদা-ঠাকুরমা হয়ে উঠলাম। হ্যাঁ, ওর নাম রাখলাম—মানিক। মনে মনে বললাম সাতরাজার ধন। সাতরাজা না হক, এক জোড়া রাজারানী ওকে বুকে করে রইল। পাঁচ বছর বয়সে পাঁজিকায় শুভদিন দেখে হাতেখড়ি দিলাম। ধারেকাছে তখন পাঠ শালা ছিল না। বই শ্লেট কিনে দিয়ে নিজেই পড়াই। আমি পড়াই বই থেকে, ওর মা পড়ায় মুখে মুখে। শ্রীকৃষ্ণের শতনাম মুখস্থ করায়। আমরা দুজনে মিলে একটি তোতা-পাখি পেয়েছি।

"দেখতে দেখতে আট বছর হল বয়স। বুড়ো বয়সের ছেলে হলে হবে কী, দেখতে বেশ স্বাস্থ্যবান হৃষ্টপুষ্টই হয়েছে। কিন্তু পড়ায় যত না মন, তার চেয়ে দুষ্টু বুদ্ধি বেশী। আর ভারি ডানপিটে। আমার ঘরের জিনিসপত্র ত ভাঙেই, পাড়াপড়শীর গাছ-পালা নষ্ট করেও আমাকে বড় বিব্রত করে। আমি বলি—এখন ত শুধু আর আদর দিলে চলবে না, শাসন করা দরকার। আমার স্ত্রী হেসে বলে— কর না শাসন, বারণ করে কে! ওর গায়ে আমিও হাত তুলতে পারি না, সেও হাত তুলতে পারে না। বরং রাগবশে মানিকই আমাদের দুজনকে ধরে ধরে মারে। সে মার আমরা উপভোগ করি। এতদিন ধরে ভাগ্যের মার খাচ্ছিলাম। তার কাছে ওর মার ত সুখের।

"তারপর ওর হাতের মারে মাঝে মাঝে আমরা এখন একটু একটু ব্যথা পেতে লাগলাম। ও তখন বড় হয়ে উঠেছে। তেরো ছাড়িয়ে চোদ্দয় পড়ল, চোদ্দ উতরে পনের। কিন্তু স্বভাব শোধরাবার লক্ষণ নেই। আমি থাকি অফিসে। ওকে আগলাবার আমার সময় কই! ওর মার কথাও গ্রাহ্যই করে না। এই নিয়ে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। একজন আর-একজনকে দোষারোপ করি, খোঁটা দিই। কিন্তু তাতে ছেলের স্বভাব শোধরায় না! স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। কিন্তু মাস্টাররা বলে—স্কুলে যায় না। বকাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে বিড়ি খায়, বাজে ইয়ারকি দেয়। আমি স্ত্রীকে বলি—তোমার ছেলের জন্যে ত গাঁয়ে মুখ দেখানো ভার হল। জাতমান কিছু আর রইল না। আমার স্ত্রী বলে—এখন বুঝি শুধু আমার ছেলে হল? লোকে ওকে আমার নামে চেনে? না, তোমার নামে চেনে? সবাই ত তোমার দোষ দেয়। বাপ শক্ত না হলে কি ছেলে ভাল হয়? একথা শুনে আমি মনে মনে গজরাতে থাকি।

"তারপর একদিন আমাদের প্রতিবেশী মংরু সাঁওতাল এসে ওর নামে নালিশ করল, ও নাকি ওর বন্ধুদের সঙ্গে মিশে মংরুর মুরগি চুরি করে তা দিয়ে পিকনিক করেছে। আমি মানিককে ডেকে কান মলে কষে চড় বসিয়ে দিলাম ওর গালে। আমার পাঁচ আঙুলের দাগ ওর কাঁচ গালে জ্বল-জ্বল করতে লাগল। ওর মা বাঘিনীর মত তেড়ে এল—দেখ ত কী করলে! আমি বললাম—বেশ করেছি। ওর এইরকম শাস্তি হওয়াই দরকার। মানিক আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করল, আর কোন অপরাধ করবে না। আমি বললাম—আমার ঘরের জিনিস নিয়ে তুমি যা খুশি তাই কর, কিন্তু পরের জিনিসে হাত দিতে পারবে না। আমার নির্দেশমত মানিক নিজের হাতে নিজের কান মলল। কিন্তু মললে কী হবে, দুদিন যেতে না যেতেই ওর নামে ফের নালিশ এল—ও বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে ফটিক মাহাতোর গরুটার পা খোঁড়া করে দিয়েছে। ফটিক নাকি ওকে বাপ তুলে গালা-গালি করেছে। আমি ছেলেকে বললাম—তোমার বাপ তুলে গালাগাল এখন সবাই করবে, যে গুণধর ছেলে হয়েছ তুমি। ফটিকের বিচার পরে হবে, আগে তোমার বিচার হয়ে যাক। তারপর আমি ওকে গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে ছিটে কঞ্চি দিয়ে গো-মার মারলাম। ও কাঁদল না, চেঁচাল

না, দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে মার খেল। 'খুন করে ফেললে গো!'—বলে চিৎকার করে আমার স্ত্রী আমাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছিল, কিন্তু আমি তাকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম। সে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

"দড়ি দিয়ে গরু ছাগল বেঁধে রাখা যায় ছেলেকে রাখতে পারলাম না। সে দড়ি ছিঁড়ে পালাল। পরদিন ভোর থেকেই তার আর খোঁজ নেই। প্রথমে ভাবলাম ওর বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে গিয়ে বুঝি লুকিয়ে আছে। পাড়ার লোকজন নিয়ে প্রত্যেকের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে এলাম, কোথাও যায়নি। ওর বন্ধুদের কাউকে সঙ্গে নেয়নি, একাই চলে গেছে। ওর মা বলল—তুমি ওকে ওর খেলার সঙ্গীদের সামনে পিটিয়েছ। ওর মুখ দেখাতে লজ্জা করে না? তাই ও লুকিয়ে রয়েছে। আমি ভাবলাম, কদিন আর লুকিয়ে থাকবে? আসবেই। কিন্তু দুদিন গেল চার দিন, সপ্তাহ, এক মাস কাটল। ও ফিরল না। ওর মা পাগলের মত হল। আমি বাইরে স্থির রইলাম, কিন্তু ভিতরটা অঙ্গার হয়ে গেল। গণৎকার দিয়ে গনালাম। সবাই বলল—মরেনি, বেঁচে আছে। কোনদিকে গেছে। কেউ বলল—উত্তরে, কেউ বলল—দক্ষিণে, কেউ—পূবে, কেউ—পশ্চিমে। কেউ এক কথা বলে না। আমি চারদিকেই খোঁজ করলাম। একজন বলল, ট্রেনে করে তাকে কলকাতার দিকে যেতে দেখেছে। ছুটলাম কলকাতায়। থানায় থানায় খবর দিলাম। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম—বাবা ফিরে এস, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। তুমি শুধু ফিরে এস।

"কিন্তু সে আর ফিরল না। আজ এই পনের বছর। গণৎকাররা বলে, সে আছে, মরেনি। কোথায় আছে? তার উত্তরে এক-একজন এক-এক কথা বলে। এই ভূভারতে জায়গা কি কম! যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, তাকে কি আর ধরবার জো আছে?

"প্রথম প্রথম আমরা স্বামী-স্ত্রী একজন আর-একজনের শত্রু হয়ে দাঁড়ালাম। কেউ কাউকে দেখতে পারি না। দেখলেই মাথায় খুন চাপে। যে ছেলে আমাদের মাঝখানে এসে আমাদের দুজনকে একমন একপ্রাণ করে দিয়েছিল—সে সরে যাওয়ায়, আমারই দোষে চলে যাওয়ায় আমরা একজন আর-একজনের কাছে থেকে যোজন যোজন দূরে ছিটকে পড়লাম। দিনরাত শুধু ঝগড়া আর শাপ-শাপান্ত। কিন্তু আমার স্ত্রী যখন পাগল হল, তখন ওর দশা দেখে আমার বড় দুঃখ হতে লাগল। ভগবানকে ডেকে বললাম—ভগবান, যে গেছে, তাকে তুমি আর ফিরিয়ে দেবে কিনা জানি না, কিন্তু ওর কোলে আর-কাউকে দাও। তাকে নেড়েচেড়ে ও শান্ত হক। আমার জন্যে নয়, শুধু ওর জন্যে। মেয়েমানুষ যে বড় অসহায়। কিন্তু ভগবান কি আর মানুষের সব প্রার্থনা শোনেন? সব প্রার্থনা রাখেন?

"আমার স্ত্রীর উন্মাদতা আপনা থেকেই কমে গেল। আমি তখন ওকে নিয়ে তীর্থ-পর্যটনে বেরলাম। খান দুই জমি বিক্রি করলাম। দু-চার টাকা যা জমিয়েছিলাম তাও সঙ্গে নিলাম। গয়া কাশী প্রয়াগ বৃন্দাবন মথুরা—পঞ্চতীর্থ সারলাম। কিন্তু মন্দিরে মন্দিরে আমরা ত দেবতার মুখ দেখি না। সেই শত্রুর মুখ এসে সব আড়াল করে দাঁড়ায়। তীর্থে অর্থব্যয়ই সার হয়, আমাদের কোন পুণ্য হয় না। তা ছাড়া মন্দিরগুলির ঘাটগুলির আশেপাশে আমরা তাকেই খুঁজে বেড়াই। আমার স্ত্রী যেখানেই ছাইমাখা দাড়িওয়ালা সাধুসন্ন্যাসী দেখে, ভাল করে তার মুখের দিকে তাকায়। সে যদি সাধু হয়ে গিয়ে থাকে! আমার অভিজ্ঞতা ত আরও বেশী। আমি শুধু সাধুদের মধ্যেই তাকে খুঁজি না, চোর বদমাস, গুণ্ডাদের মধ্যেও তার সন্ধান করি। বলা ত যায় না, সে যদি ওই দলে গিয়ে ভিড়ে থাকে! সেই আশঙ্কাই ত বেশী। কিন্তু সাধু হক চোর হক, সে ফিরে আসুক। আমি তাকে নতুন মানুষ করে গড়ে তুলব। আর অমন করে মারব না, ধৈর্য হারাব না। ছেলেকে কী করে মানুষ করতে হয়, মনে মনে আমি তা বুঝে নিয়েছি। কিন্তু সে সুযোগ আর সে আমাকে দিল না। সেও দিল না, ভগবানও দিলেন না।

"আমি আমার স্ত্রীকে বললাম—অনাথ কোন ছেলেকে এনে পালি, পুষি। তাতে আমার স্ত্রী মহাখাপ্পা। নিজেদের এই দুর্ভাগ্য হবার পর থেকে সে কিছুদিন পরের ছেলেমেয়েকে দুচোখে দেখতে পারত না। মেয়েমানুষ বড় অবুঝ আর বড় অসহায়। তাই তার পাপ খণ্ডনের ভার আমি নিয়েছি। আমি না নিলে আর কে নেবে? পাড়ার গরিব ছেলেদের নিয়ে এক পাঠশালা খুললাম। যেটুকু বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তাদের দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আজ-কালকার ছেলেপুলে ভারি দুরন্ত। প্রত্যেকেই সেই হতভাগাটার মত। আমি ভাবি, এদের মধ্যে একটাও যদি মানুষের মত মানুষ হয়, আমার কিছুটা আশা মেটে। মুখ থাকে। ছাত্রও যা ছেলেও তাই।

"এবার আমার স্ত্রীর আচরণের কথা বলি। আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ওও ত গণৎকারের কাছে যায়। তাবিজ, কবচ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন যে যা বলে, তাই করে। আমি সব জানিও না। কতজনে ওকে ঠকায়। আমি গ্রাহ্য করি না। ভগবান যে ঠকান আমাদের ঠকিয়েছেন, তার চেয়ে ত আর বেশী কেউ পারবে না। কে যেন ওকে বলেছে—তোমার ছেলে একদিন ছদ্মবেশে এসে তোমাকে দেখা দিয়ে যাবে। তুমি যদি সতর্ক হও, তা হলে ধরতে পারবে, চিনতে পারবে। না হলে সে আবার ফাঁকি দিয়ে পালাবে। আমি ওকে বুঝিয়ে বলেছি—এসব বাজে কথা। যদি আসে সে নিজের বেশেই আসবে। ছদ্মবেশে আসবে না। আমার স্ত্রীর মাথা যখন ঠিক থাকে, তখন সে আমার কথা শোনে। বিশ্বাসও করে। আবার আমাদের মধ্যে অনেকটা সেই আগের ভাব ফিরে আসে। আমরা দুজনে বসে বসে তার গল্প করি। তার সেই আসবার সূচনা থেকে শুরু করে চলে যাওয়ার দিনটি পর্যন্ত—কিছুই ত আমরা ভুলিনি। কিন্তু ওর মাথা মাঝে মাঝে বিগড়য়। সেই আগের মত ছিট দেখা দেয়। তখন ও ঘর থেকে একেবারে বেরিয়ে যায়। যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। আমি আর বাধা দিই না। ও যাতে শান্তি পায়, তাই ও করুক। আগে আগে জোর করে ধরে আনতাম। এখন আর সে চেষ্টা করিনে। এই সব সময় ও আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করে না, বোধ হয় আর সকলের কথাই বিশ্বাস করে। ওর যে মুহূর্তে যে ধারণা হয়, তাকেই ও সত্য বলে ধরে নেয়। আপনার সম্বন্ধেও ওর ধারণা হয়েছে—। অথচ কী করে যে হল, কোন মিলই ত নেই। কিন্তু পাগলের মাথায় কখন যে কোন্ খেয়াল চাপবে, তা কেউ বলতে পারে না।

"আপনাকে এখানে জোর করে ধরে রেখে অনর্থক কষ্ট দিলাম। কিছু মনে করবেন না। আপনি এবার শুয়ে পড়ুন। এখনও বেশ রাত আছে। আপনার ভয় নেই। আর-কোন গোলমাল হবে না। আমি ওকে আগলে রাখব।"

রামবাবুর স্ত্রীর চাপা কান্নার শব্দ তখনও থেকে থেকে শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু সে কান্না শোকের, না উন্মত্ততার বোঝা শক্ত।

আমি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ফের শুয়ে পড়লাম। কিন্তু সে-রাত্রে ঘুম আর এল না।

দরজা

বিমল কর

আকাশে প্রথম তারাটি ফুটলে গোনা যায়, তার পরও দু চারটি; শেষে অগুনতির ভিড়, কে-ই বা তারা গোনার খেলা খেলে! আমার খেলা শুরু হয়েছিল। চোদ্দ বছর আগে—বয়স বুঝি পনের তখন; ধোওয়া-মোছা শ্লেটের মতন আকাশটুকু পরিষ্কার। প্রথম তারাটি ফুটেছিল ভয়ে ভয়ে। সে-তারা ছোট, তার আলো উজ্জ্বল নয়। নিশীথ এসে এমনভাবে সদরে কড়া নেড়েছিল যেন ও ঠিক জানে না কোথায় এসেছে। অনিশ্চিত বলে ওর হাত ছিল দুর্বল, কড়া নাড়ার খুট খুট শব্দটুকু শুনে মনে হয়েছিল বাতাসের দমকা লেগে কপাট নড়ছে। নিশীথের দ্বিধা কী কম—হয়ত এ-বাড়ি, হয়ত এ-বাড়ি নয়— কড়ার মৃদু দুর্বল খুট খুট শব্দটুকু তাই বাজল, থামল, আবার বাজল। আমি জানতাম না নিশীথ এসেছে, আমি ভাবিনি কেউ আসতে পারে; সদর খুলব কি খুলব না ভেবেও কখন না জানি খুলে দিয়েছিলাম। দেখি, নিশীথ সামনে দাঁড়িয়ে। ("কোন নিশীথ? নিশীথ হালদার, না নিশিনাথ মুখুজ্যে? নিশিনাথের কাঠগোলা তোমাদের বাড়ির পাশেই ছিল!")

নিশিনাথ নয়, নিশীথ। কাঠগোলার নিশিবাবু আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে চোখ নামিয়ে হাটতেন। যমুনাদি হেসে বলত, নিশিবাবুর চোখ ভীষণ ট্যারা। বাঁয়ে তাকিয়ে ডাইনে দেখেন, নিচু চোখে উঁচু জিনিস। কথাটা খুব মিথ্যে নয়, পরে বুঝেছিলাম। আমার নিশীথ ট্যারা নয়, তার চোখ ছিল ছোট—ছোট্ট তারার মতন, বড্ড কাঁপত, যেন এই বুঝি নিভে যায়। অত ভয় অত লজ্জা আর দেখিনি কারও। ওর ভয় ওর লজ্জা আমায় সাহসী অলাজুক করে তুলেছিল। কেন যে, আমি জানি না। হয়ত দুই অন্ধ এক হলে এক-অন্ধকে সাহস করে অন্য-অন্ধের হাত ধরতে হয়।

("নিশীথ ছেলে হয়ে যা পারল না, মেয়ে হয়ে তুমি তা পারলে?")

পারলাম। নিশীথ পুরুষ বলে অনেক কিছুই পারেনি, আমি মেয়ে বলেই অনেক কিছু পেরেছি। পনের বছরের মেয়ে হয়ে আমি উনিশ বছরের ছেলেকে পাগলের মত ভালবাসতে পেরেছিলাম। মার গলার হার চুরি করে নিশীথের পকেটে দিয়ে দিয়েছিলাম, তার সঙ্গে এক টুকরো চিঠি:

এই হার বেচে তোমার দিদির বিয়েতে কাপড় জামা কিনে দিও।

("তোমার মা জানতে পারেনি?")

পেরেছিল। আমার মা-র দু-চোখে দশ জোড়া চোখের দৃষ্টি ছিল। মা সব দেখত, সব বুঝত, সব জানতে পারত। মা বলেছিল, ভিখিরির হাল যে ছোঁড়ার—তার এত দেয়ে-টান কেন! লজ্জাও করে না! বারণ করে দিবি, এ-বাড়িতে আর যেন না আসে।

("বারণ করেছিলে?")

না। বলেছিলাম, তুমি আমায় নিয়ে পালিয়ে চল। আমি ত তোমারই। পালিয়ে গিয়ে আমরা বিয়ে করব, বর বউ হয়ে থাকব।

("এ ত সেই পুরনো গল্প; নিশীথ বোধ হয় এবার তোমার হাতের বালা কিংবা চুড় নেবে, সোনা বিক্রির টাকায় টিকিট কিনে আনবে বলে স্তোক দিয়ে চলে যাবে, আর ফিরে আসবে না?")

উহুঁ, গল্পটা সে-দিক থেকে পুরনো নয়, হয়ত অন্য দিক থেকে পুরনোই। নিশীথ বলেছিল, হাঁ সে আমায় বিয়ে করবে; বিয়ের আগে চাকরিটা তার জুটে যাক।... নিশিবাবুর কাঠগোলায় তার একটা চাকরিও জুটল। পঞ্চাশ টাকা মাস মাইনে। একদিন সন্ধে বেলা নিশীথ এল। শুধলো, নিশিবাবু তোমার কে হয়, পারুল? আমি অবাক; নিশিবাবু আমার কে হবে, কেউ না। বললাম, নিশিবাবুরা বামুন, আমরা কায়স্থ; ও আমাদের কে হবে, কিছু নয়। নিশীথ মাথা নাড়ল, যেন আমার কথা তার বিশ্বাস হল না। বলল, নিশিবাবু তোমার মাকে মাস খরচা দেয়, বাবুর নিজের খরচার খাতায় তোমার মার নাম দেখেছি।

("নিশীথ ভুল দেখেনি ত?")

না। নিশীথ ঠিকই দেখেছিল। পরে আমি মা-র কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলাম, নিশিবাবু ভবিষ্যত ভেবে আমার জন্যে দাদন দিয়ে যাচ্ছেন, চোদ্দ বছর বয়স থেকে।

("আশ্চর্য, নিশিবাবুর যে অনেক বয়েস!")

অনেক; আমার মার সমান সমান।

("ব্যাপারটা জানার পর তুমি কী করলে?")

অল্প বয়সে ঝোঁকের মাথায় মেয়েরা যা করে। কাপড়ে আগুন ধরিয়ে মরতে গিয়েছিলাম। মরা হল না। মরতে গিয়ে না-মরলে ফিরে আর মরা হয় না। বাঁচার কষ্ট সইতে পারে না বলে মানুষ মরতে যায়, মরার কষ্ট জানতে পারলে বাঁচতে চায়। কাপড়ে নতুন করে আগুন ধরাব কিংবা গলায় দড়ি দেব—সে-সাহস আর আমার হয়নি। বাঁচা মরা দুইই সমান কষ্টের; ওরই মধ্যে বাঁচাটা কেমন লোভ দেখানো—আজ মনে হয় কাল বুঝি কপাল ফিরবে, কাল মনে হয় পরশু...

("এ-ঘটনার পর নিশীথ আসেনি?")

না। নিশিবাবু তাকে জুতো মেরে গোলা থেকে তাড়িয়ে দিলেন। গোলার লোকে বলাবলি করল, আমার কানে সে মন্তর দিয়েছিল, নয়ত ষোলো বছরের মেয়ে আবার কাপড়ে আগুন ধরিয়ে মরতে যায় নাকি। এতটা সতীপনা আমাদের পাড়ায় আর কেউ দেখায়নি। নিশীথ পুলিসের ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

("তারপর বোধ হয় নিশিবাবু আসরে এলেন?")

এসেছিলেন। যতদিন ওপর ওপর চোখ ছিল—অল্প দিনই—ততদিন আমার দুঃখে গলে পড়েছিলেন। একদিন আমার শরীরের পোড়া ঝলসানো দাগগুলো তাঁর চোখে পড়ল। নিশিবাবু সেই যে চলে গেলেন আর এলেন না।

("মাস খরচাও বন্ধ হল?")

হল। মা বলল, এর চেয়ে আমার মরাই ভাল ছিল।...আর একদিন বুঝি তিতিবিরক্ত হয়েই বলেছিল, এই নুনে পোড়া তরকারি নিয়ে আমি করব কী, কার পাতে দেব, সবাই থু থু করে ফেলে দেবে।

("তোমার মার মায়া মমতা ভালবাসার বালাই ছিল না দেখছি। কী স্বার্থপর নীচ মন!")

এক সময়ে আমিও তাই ভাবতাম। কার মনের তলায় কতটুকু আছে বোঝা মুশকিল। নিশিবাবু চলে গেলে মধুসূদন যাওয়া আসা শুরু করেছিল। মধুসূদনকে চেনেন ত! সাইকেল-সারাই দোকানের মালিকের ছেলে। তার মনটা বড় ভাল। একটু বুঝি মাথা পাগলা। মধুসূদনকে দেখে আমার আশা হয়েছিল। সংসারে আর পাঁচটা মানুষের মত এ-লোকটা হয়ত ধরা বাঁধা হিসেব করবে না। সতের বয়সে পড়ে আমার বুদ্ধিসুদ্ধিও তখন অনেকটা ফলন্ত। আকাশের চাঁদ ছোঁয়ার জন্যে হাত বাড়াইনি, নাগাল বুঝেই হাত বাড়িয়েছিলাম। মধুসূদন আমায় নিয়ে ঘর করতে পারত। তার ওপর আমার টান হয়েছিল, তাকে আমার ভাল লাগত, হয়ত আমি তাকে ভালবেসে-ছিলাম। মা সহজে সে-কথা মানতে চায়নি, বিশ্বাসও করেনি। পরে একদিন মা বোধ হয় আমাদের কথাবার্তা শুনেছিল আড়াল থেকে। সে-দিনই আমায় বলল, ওকে বল দোকান দিতে হয় অন্য কোথাও গিয়ে দোকান দিক, আমার শেষবেশ যা আছে সব আমি দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে এ-বাড়িতে বসে, বউ নিয়ে বাপের কাছে গিয়ে উঠতে হবে—তারপর নতুন জায়গায় বাসা করে বউ নিয়ে থাকুক গে যাক।...মার কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম। আমার মা আর যাই হক স্পষ্টবাদী, মার মধ্যে ছল চাতুরী ছিল না। মুখে যা বলেছে মা তার নড়চড় করবে না। শেষবেশ বলতে মার আর কিই বা আছে, তবু যা আছে মা দিয়ে দেবে, নিজের জন্যে কিছু না রেখেই। মেয়ের জন্যে মা এর বেশী আর কী পারে! কিন্তু সবার আগে মা চায় মর্যাদা। আমি মধু-সূদনের কাছে সরাসরি ওটা চাইনি। বেশ্যার মেয়ে নিয়ে ঘর করা এক কথা, লোক জানিয়ে বিয়ে করা অন্য কথা।

("মধুসূদন রাজী হল না?")

জানি না। হয়ত সে রাজী হত। খেয়ালী গোঁ-ধরা মানুষ, আমার মা আর তার বাবার সঙ্গে রেষারেষি করে, লোক দেখানো বাহাদুরির জন্যেই রাজী হয়ে যেত। ভেবে চিন্তে আমিই রাজী হইনি। মর্যাদাও শরীরের মত, তাই না! একবার পুড়লে তার নানা জায়গায় দাগ ধরে যায়, ফিরে আর তা নতুন করা যায় না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম মা বোকামি করে সর্বস্ব খুইয়ে বসবে, আমরা কেউই কিছু পাব না।

("যতীন মাস্টার না বলেছিল আর্য সমাজে নিয়ে গিয়ে তোমায় বিয়ে করবে?")

বলেছিল। যতীন মাস্টার আমায় দেখেনি তাই বলেছিল।

("কথাটা সত্যি নয়, যতীন মাস্টার তোমায় অনেকবার দেখেছে। শেষে ত তুমি তার কাছে নেশা হয়ে গিয়েছিলে। নিত্য সে তোমায় দেখত।")

জানি, যতীন মাস্টারের কথাও আমি জানি। মাস্টার আমায় পথ থেকে দেখত, কখনও বা ভোলাবাবুর চায়ের দোকানে বসে বসে আমার জানলার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকত। কিন্তু ওর চোখে আমার কতটুকুই

বা ধরা পড়ত! এই মুখটুকু, দুটো হাত, সদরে যদি দাঁড়িয়ে থাকতাম বড় জোর পায়ের পাতা দুটো—এর বেশী কিছু নয়। ভগবান আমার মুখ সুন্দর করেছিলেন, হাত পা গা—সবটাই; আগুনে আমার মুখ পোড়েনি—হাত কিংবা পায়ের পাতাও না; ভেতর পুড়েছিল, শাড়ি সায়া জামার আড়াল ডিঙিয়ে সেখানে চোখ যায় না। নিশিবাবুর চোখ যেদিন এই আড়ালটুকু ডিঙলো সেদিনই আঁতকে উঠে তিনি পালালেন। মাস্টারের বিয়ে আমার মুখের সঙ্গে হত না, তারপর......! মাস্টার লুকিয়ে চুরিয়ে আমার ঘরে অনেক চিঠি ফেলেছে। আমি স-ব চিঠি পড়েছি। হাজারবার মাস্টারের একই কথাঃ পারুল, তোমায় দেখে দেখে আমার আর আশা মেটে না। তুমি কী সুন্দর দেখতে! পাঁকে পদ্ম ফুল। তোমার কথা ভেবে ভেবে আমার রাতে ঘুম আসে না। যেটুকু ঘুমোই স্বপ্নে তোমায় পাশে টেনেনি। ("যতীন মাস্টার মিথ্যে কথা লেখেনি, সত্যিই তুমি সুন্দর ছিলে, পারুল; আজও তোমায় দেখলে দুদণ্ড তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে"।)

আপনি সব জেনে শুনেও আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। যতীন মাস্টার পাঁকের পদ্ম ফুল তুলে শুধু কি সাজাত! আমি ফুল নই, মাস্টারও গাছ নয়। নিশিবাবুর মতন মাস্টারও আমায় ফেলে পালাত। মেয়েদের রূপ শুধু যদি মুখে হত আমি নুনে পোড়া তরকারির মত হতুম না। (.....বলতে কি মেয়েদের রূপ স্বপ্ন দেখার জিনিস নয়। যতীন মাস্টার স্বপ্ন নিয়ে থাকবে যদি—তবে আর্যসমাজে যেতে চাইবে কেন! ("অল্প বয়স থেকে ঘা খেয়ে খেয়ে তুমি অনেক শিখেছ, পারুল। কিন্তু এখনি যে-ভাবে বেঁচে আছ এ-বাঁচাতেই বা সুখ কী!")

সুখ অসুখ জানি না। বাঁচার সুখ বলে আলাদা কিছু আছে কি না কে জানে! আমার কাছে সবই অভ্যেস বলে মনে হয়। আমরা রাতারাতি জন্মে ভোর হবার আগে আগেই মরতে পারি না, দিন মাস বছর—বছরের পর বছর ধরে বাঁচতে হয়—কতদিন কত কাল ধরে—সুখ বোধ হয় এর কোথাও নেই, তবু সুখ পাই। কে জানে, হয়ত সুখ পাবার অভ্যেস করে নিতে হয়। আজ আমার অনেক কিছুতেই সুখ। সন্ধে-বেলায় সাজতে বসলে সুখ পাই, বেলার সঙ্গে রঙ্গ করে কথা বললেও সুখ। বিশ্বাস করুন, আমি মন খারাপ করে পথে দাঁড়াই না, হাসিখুশী মুখ করেই দাঁড়াই; সুখ না থাকলে কে দাঁড়াত, কে বা হেসে হেসে আপনাদের ডাকত; কাছে এলে হাত ধরত, ঘরে এনে বসাত, বিছানায় শুতে দিত। উঁহু, লজ্জা বা মন খুঁত খুঁত করে আমি টাকা নিই না, বরং যদি বলেন বেশ খুশী হয়েই নি। আমার কাছে মানুষ যা চায় আমি দিতে পারি।...না না, অভিমান করে বলছি না, সত্যি কথাই বলছি, বিশ্বাস করুন। এরা যা চায় তার পরমায়ু অল্প—অল্প বলেই বেহুঁশ অন্ধের মত চায়। আমার ঘরটা দেখেছেন—একেবারে কোনার ঘর, এ-ঘরে এখনই কেমন অন্ধকার, প্রয়োজনে আরও অন্ধকার করে নিই। অন্ধকারে অন্ধরা যা পায় নেয়, নিয়ে চলে যায়।

("তুমি কাঁদছ?")

কাঁদছি, কই না! কাঁদব কেন। আমি কি ছেলেমানুষ! এখন আমার বয়স কত জানেন? উনত্রিশ পেরিয়ে এলাম প্রায়, তিরিশই বলতে পারেন। দূর থেকে দেখলে আপনার অতটা মনে হবে না, কাছে এলে হয়ত আরও বেশী মনে হবে। ঠিক কি না বলুন ত!

("তা হয়, তোমার চোখের তলায় কালি পড়েছে, গর্ত হয়েছে; গাল শুকিয়ে আসছে, কপালে দাগ—পারুল, তুমি সুন্দরী ছিলে, এখনও দুদণ্ড তাকিয়ে দেখার মতন—কিন্তু এখন বোধ হয়...")

বাসিমালা। ঠিক বলেছি না। আপনাদের মুখের কথা আমরা কেমন ধরতে পারি দেখেছেন। মনরাখা কথা বলতে আপনি বেশ পটু। যাক, এবার বোধ হয় উঠবেন আপনি—অনেক রাত হয়ে গেল। দেখছেন না, সব কেমন চুপ হয়ে গেছে, ঝিমিয়ে পড়েছে। বাইরেটা থমথমে। মিউনিসি-প্যালিটির বাতির তলা দিয়ে যাবার সময় একটু সামলে যাবেন; একটা বিরাট গর্ত খুঁড়েছে ওরা—ওই যে রাস্তা সারাইয়ের লোকরা।

("নাই বা গেলাম আজ। তোমার ঘর খুব ছোট নয়, ইচ্ছে করলে একটা লোককে রাখতে পার।")

না;আপনি যান। আমার ঘর ছোট, নোংরা, অন্ধকার; এই দমবন্ধ ভ্যাপসানো ঘরে আপনি থাকতে পারবেন না। অযথা কষ্ট; আপনার, আমারও।

("কেন, কিসের কষ্ট, এতক্ষণ থাকতে পারলাম—")

বেশিক্ষণ থাকার জন্যে আপনি আসেননি, আমিও আনিনি। আমার কাছে থাকার পরমায়ু যার যত কম আমি তাকে তত পছন্দ করি।

("শেষ সময় মিথ্যে কথা বললে, পারুল।")

মিথ্যে! কী যে বলেন আপনি!

("কি বলছি তুমিই তবে ভেবে দেখো। আমি ত দেখছি, চোদ্দ বছর ধরে নিশীথ দিব্যি বেঁচে আছে, তোমার কাছে থাকার এতটা পরমায়ু, তার কী করে হল।...যাক, উঠি এবার। না না আর আমায় সাবধান করে দিতে হবে না, রাস্তার মধ্যে গর্তটা আমি চিনতে পারব, একটা আলো না জ্বলছে পাশেই।")

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে পারুল তার ঘর দরজা জানলা কিছু ঠাওর করতে না পেরে অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে শুয়ে থাকল। পরে বুঝতে পারল, তার বোধ হয় জ্বর এসেছে আবার। খু-ব জ্বর। নিশীথকে ডাকল, নিশ্বাসের মত নিঃশব্দ সে-ডাক নিশীথ শুনতে পেল না। পারুল হাত বাড়াল—যেন হাতড়ে হাতড়ে কাউকে ছোঁয়ার চেষ্টা করল। কাউকে ছুঁতে পারল না। চোখ মেলে তাকাল, ঘর অন্ধকার। এত অন্ধকার পারুল জীবনে দেখেনি। সেই অন্ধকারের মধ্যে পারুল অনেক চেষ্টা করল দরজাটা ঠাওর করবার। আশ্চর্য, এই ঘরে দরজা নেই; দরজা জানলা বা আলো-বাতাসের একটা ফোকর—না, কোনো ফাঁকই নয়।

কোথাও কোনো পথ নেই দেখে পারুল আস্তে আস্তে চোখ বুজল। বোজা চোখে সে অনুভব করল, তার মাথা কাঁপছে, শরীরটা যেন দুলছে, কানের পাশে কেমন একটা শব্দ হচ্ছে। পারুলের মনে হল, সে একটা বন্ধ মাল-গাড়ির মধ্যে শুয়ে শুয়ে কোথাও চলে যাচ্ছে।

নেকনজরে

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

এই অসীম জগতে এত লোক থাকতে হঠাৎ কে একজন আর-একজনের বিশেষ নেক-নজরে পড়ে নতুন জগৎ গড়ে তুলবার কারণ হয়, তার কৈফিয়ত তলব করলেই মহা ফাঁপরে পড়ে যাবেন। এমন দৃষ্টিবিনিময় যাদের হয়েছে তাদের ছাড়াছাড়ি করে দিন, তখুনি দেখবেন, তাদের দু-জনার চোখ-গেল চোখ-গেল ভাব। কালো চোখের চাতুরী এমন দুজনকে আবার কাছাকাছি করে দিন, দেখবেন একজনের চোখ থেকে আর-একজনের চোখে যা বোলানো হল, তার পরশ পেয়ে তখন দুজনেরই চোখ গোল-গোল। নজরবন্দী ত জবাববন্দী। এই পৃথিবীতে সবাই সবাইকে দেখছে (সত্যি কি আর দেখছে?)। অথচ এমনভাবে দেখা আর তেমনভাবে দেখার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। নয়নে সবাইকে লাগছে না, তাই মনেও নয়। দেখা যখন কটাক্ষ হয়ে দাঁড়ায় তখনই জানবেন, তার আঘাতে মন-পাখি ছটফট করে।

সবার দৃষ্টির সীমা এক নয়। আপনি কী করে দেখেন তা আপনি জানেন। আমি চোখের সামনে কাচ বসিয়ে বেশী দেখবার চেষ্টা করে থাকি। সব ঠিক দেখি সেকথা কী করে হলপ করে বলি! আর তা ছাড়া কী যে আদর্শ দেখা, তাও কি ছাই কারও জানা আছে! যুধিষ্ঠির দেখলেন, ভীম দেখলেন, দুর্যোধন দেখলেন। কিন্তু দেখার মত দেখা দেখলেন এক অর্জুন। এমন লক্ষ্যভেদের চাহনি কজনের থাকে বলুন? দাদা মশাইয়ের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তবু এখনও তিনি দিদিমাকে নিয়মিত দেখে যাচ্ছেন। এ দৃষ্টি হল পরম নির্ভরতার। আবার একটি ছেলে যেমন করে একটি মেয়েকে দেখে, সে দেখা আশ-না-মেটা দেখা। আইনস্টাইন দুনিয়ার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে [illegible]-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তা দার্শনিকের দেখা। রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীর ফুল-ফল লতা-গুল্ম, পুরুষ-প্রকৃতিকে যে কী চোখে দেখেছিলেন! কালো হরিণচোখ দেখার মত তাঁর চোখ ছিল। দৃষ্টির তল নেই—চোখের ভিতর দিয়ে তিনি স্বপ্ন-রাজ্যে স্বচ্ছন্দে বিহার করতেন। আর ওই হিটলার এক বোধ হয় ইভা ব্রাউনকে ছাড়া সারা দুনিয়াকে দেখেছিলেন রক্তচক্ষু দিয়ে। কার্ল মার্ক্স বঞ্চিতের হয়ে তাঁর দৃষ্টি দিয়ে সামনে পিছনে তাকিয়েছিলেন।

যখন শুনতে পান 'লেডীস সীট' এই কথাটি...

ঠিক সেই রকম না হলেও আর-এক রকম আপসোসের দৃষ্টি নিয়ে, ট্রামের মধ্যে সামনের দিকের সীটের কেউ কেউ পিছনে দৃকপাত করেন, যখন শুনতে পান 'লেডিস সীট' এই কথাটি। এই দুই দেখার মধ্যে প্রভেদ কম নয়। পাইলে একজন, আর রুপালী পর্দায় আর-একজনের মুখ নাড়া দেখে আসা—এ হল না-দেখেও দেখা, না-শুনেও শোনা। চক্ষু একরকমের নয়—লোকচক্ষু, মানসচক্ষু, দিব্যচক্ষু। কিন্তু হরিণচক্ষু হলেও মুশকিল, সেখানে অতল তলে পড়লে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব।

দুই চোখে আমাদের দুই ক্যামেরা বসানো আছে। প্রকৃতির তৈরী এই ক্যামেরা না থাকলে দামী ক্যামেরারও কোন অর্থ হত না। দিনরাত এই চোখ-ক্যামেরা দিয়ে আমরা কতবার ছবি তুলছি তার ইয়ত্তা নেই। ছবি চোখ দিয়ে তোলা হলেও তা ব্রেনে গিয়ে ডেভেলাপ হয়। কবি যখন বলছেন, "নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই", আসলে সত্যি ঠাঁই হয়েছে মাথার স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে।

প্রকৃতিদত্ত এই ক্যামেরার বিশেষত্ব অনেক। চোখের বাইরের সাদা অংশটি কর্নিয়া—যাকে সেফটি গ্লাস বলা যেতে পারে। এটা সব সময়ে ভিজে থাকে। চোখের পাতা ত পাতা নয়, এ যেন উইণ্ড স্ক্রিন ওয়াইপার। নেত্রপল্লব ধুলোবালি থেকে চোখকে রক্ষা করে। ভুরু দুটি উড়ন্ত চিলের ডানা, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। একটু কটাক্ষ করলেই তখুনি আবার উড়ে চলে যাবে। কর্নিয়ার সাদা জায়গার মাঝে লেন্স বসানো আছে—যার ভিতর দিয়ে আলো বাহির-বিশ্ব থেকে অন্তর-বিশ্বে প্রবেশ করে বাইরে থেকে আলো ভিতরে রুপালী পর্দায় গিয়ে প্রতিফলিত হয়। লেন্সের সাহায্যে কাছের ও দূরের ছবিকে সহজে আয়ত্তাধীন করা চলে। লেন্স পর্দায় ছায়া ফেলবার জন্য অহরহ নড়চড় করে। প্রতি অপলক দৃষ্টির জন্য চোখের লেন্স ঘুরঘুর করছে। একজন দু বছরের শিশু যত কাছের জিনিস দেখতে পারে সে তুলনায় একজন ত্রিশ বছরের যুবা তত কাছে দেখতে পায় না। আবার চল্লিশ বছরের ভদ্রলোক তার থেকেও [illegible] থেকে জিনিস দেখবে। পঞ্চাশ বছরের কেউ আরও অনেকখানি

তফাত পর্যন্ত দেখবে। লেন্স শক্ত হয়ে গেলে চোখের মধ্যে উপযোজন (একোমোডেশন) ক্ষমতা নষ্ট হয়। সেই জন্য চশমা দিয়ে নতুন দৃষ্টিদান করতে হয়। অবশ্য চাঁদনী রাতে বিনে চশমার একজন আর-একজনকে তাজমহল দেখিয়ে যে দৃষ্টিদান করে, তেমনি দৃষ্টিদানের সাধ্য কোন চোখের ডাক্তারের নেই। মনের ডাক্তার না হলে উপায় নেই। স্বাভাবিক চোখে লেন্স থেকে ছায়া রেটিনা নামক পর্দায় এসে পড়ে। দীর্ঘদৃষ্টি বা লং-সাইটেড হলে রেটিনার পিছনে ছায়া পড়ে। আর স্বল্পদৃষ্টি বা শর্ট-সাইটেড হলে ছায়া রেটিনার আগে এসে পড়ে। দীর্ঘদর্শীরা কিন্তু সব সময়ে দূরদর্শী নন। চোখের সামনে কাচ লাগিয়ে এই ত্রুটি সংশোধন করা যায়। যাদেরই আমরা চশমা পরতে দেখি তাদের চোখে
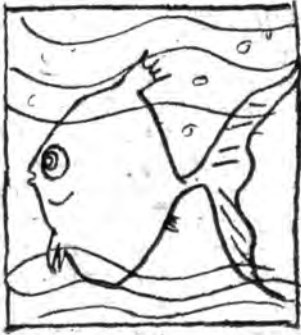
জলের মধ্যে মাছ সব সময় তাকিয়ে আছে তো আছেই, দেখার বিরাম নেই

চোখের সামনে কাচ লাগিয়ে এই ত্রুটি, সংশোধন করা যায়

রেটিনায় ছায়া প্রতিফলিত ঠিকভাবে হয় না। কোন বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে একটু নজর করে দেখলেই দেখা যায়, পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে থাকলে সবাই দূরে থেকে কাছে পর্যন্ত সব দূরত্বের মধ্যে বাসটিকে ফোকাসে দেখতে পারে না। যারা পারে না, বুঝতে হবে, তাদের চোখের রেটিনায় ছায়া ঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না।

চোখের ক্যামেরার মুখে কতখানি আলো প্রবেশ করবে কি করবে না তার জন্যে আছে আইরিশ ডায়াফ্রাম বা কনীনিকা পর্দা। রেটিনা পর্দার সঙ্গে চোখের নার্ভের যোগ আছে। রেটিনার পর্দায় আলোকগ্রাহী সেল (Photosensitive cells) আছে এই সেলরা দু রকমের হয়, রড ও কোন্‌স্ (Rhods and Cones) ঠিক দেশলাইয়ের কাঠির মত (অন্ধকার দূর করে ত!) সারি সারি বসানো আছে। বাইরে থেকে আপনা মনে চোখের কোণে যা কিছু আমরা দেখি—না তা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফুটোকিতে ভেঙে যায় ও চোখের ভিতর এসে তা রড ও কোন্‌দের

কেঁচো মাটির তলায় তলায় ঘুরে বেড়ায়, চোখ বলতে আমরা যা বুঝি তা ওর নেই

নিরালায় দু'জনায়   আলোকচিত্রী : শ্রীঅনিল বসু

স্পন্দিত করে তোলে। ছাপার হরফে আমরা যে-সব ছবি দেখি তা প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ১০০টি ফুটকি হিসাবে বসানো থাকে। চোখের মধ্যে মধুর মিলন ঘটাতে রয়েছে কিন্তু 8700 points per inch। সমস্ত রেটিনায় প্রায় ৫০ মিলিয়ন পয়েন্ট আছে এবং একটি পয়েন্ট থেকে আর-একটি পয়েন্ট এত কাছাকাছি যে তাদের মধ্যকার দূরত্ব মাত্র ০·০০৩ মিলিমিটার। কোন কোন পাখির চোখে আরও প্রায় চার-গুণের কাছাকাছি পয়েন্ট আছে। চোখের সামনে কেউ যখন তার প্রিয়কে দেখছে তখন দৃষ্টির ভিতর দিয়ে সেই মুখের ছায়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়েন্টে ভেঙে যাচ্ছে এবং চোখের ভিতরের রেটিনার মধ্যে অবস্থিত রড ও কোনদের পয়েন্টগুলোকে আলোড়িত করে তুলছে। রড ও কোনদের ভিতর অবস্থিত পয়েন্টদের সঙ্গে নার্ভের যোগ আছে। আর সেই স্পন্দন নার্ভবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়।

কোন বাস্তব জিনিস দেখা হলে তা রেটিনার ভিতর এসে শেষ পর্যন্ত বৈদ্যুতিক শিহরণ-রূপে নার্ভের ভিতর দিয়ে মাথার ভার্করুমে গিয়ে পৌঁছয়। আবার সেখানে ছোট ছোট পয়েন্টগুলি একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ প্রাঞ্জল ছবিতে পরিস্ফুট হয়।

জীবজগতে চোখের নানা রকম কেরামতি লক্ষ্য করা যায়। এককোষী প্রাণী অ্যামিবার কোন চোখ নেই; তবু আলো-অন্ধকার ঠাওর করবার শক্তি তার আছে। কোষটির স্পর্শকাতরতা সুস্পষ্ট। কেঁচো মাটির তলায় তলায় ঘুরে বেড়ায়। চোখ বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি তা ওর নেই। তবে আলোর সঙ্কেত বহনের মত স্পট ওর গায়ে আছে। কেঁচোর কাছাকাছি জীব জোঁকের চোখ আছে। আরশোলারা দশ জোড়া চোখ নিয়ে দেখে। কিন্তু সে দেখা কতখানি সার্থক তা অবশ্য বিবেচ্য। পতঙ্গ-দের অসংখ্য চোখ থাকে। এই চোখকে বলা হয় পুঞ্জাক্ষী। এদের মাথায় হাজার চোখের মেলা। তাই এক দেখা মানে হাজার বার দেখা। আশে-পাশে, ডাইনে-বাঁয়ে মাথা না ঘুরিয়েও এরা দেখতে পায়। কিন্তু পতঙ্গ পুরুষ তার দোসর কোনজনকে ভুলেও কখনও বলবে না—বিধি, ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে সে কি আমার পানে ভুলেও...। জলের মধ্যে মাছ চোখ নিয়ে সব সময়ে তাকিয়ে আছে ত আছেই। দেখার বিরাম নেই। কোন কোন সরী-সৃপের ত্রিনেত্র আছে—তবে তা দিয়ে কাউকে ভস্ম করতে পারে না। স্তন্যপায়ী মাত্রেরই Binocular Vission; পেঁচা স্তন্যপায়ী না হলেও Binocular Vission-ওয়ালা।

যাঁরা Vission-টার মধ্য দিয়ে mission খুঁজে পান, তাঁরা চক্ষুষ্মান। তাঁদের দৃষ্টি শুধু বাইরের দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সব-কিছুর ভিতরে অন্তর্লোকেও প্রসারিত। সেই জন্যে মানুষ শুধু নিছক দেখে না, সে কখনও কখনও দ্রষ্টা হয়ে ওঠে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি দু চোখ দিয়ে যা উপলব্ধি করেছিলেন তা তাঁর সমসাময়িক স্থান-কাল-পাত্রকে পার হয়ে বহুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। কোপার-নিকাস, গ্যালিলিও প্রভৃতি মহাজনের দৃষ্টি এমনি সুদূরপ্রসারী ছিল। রামমোহন রায় কবে এসেছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতের মত ও পথ তাঁর মানসচক্ষে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

চোখে চোখে শুধু দেখাই হয় না, কখনও কখনও অনেক কথাও হয়। যৌবনের উৎসব দৃষ্টির বন্ধনে। কাজলবিহীন সজলচোখে যারা মরমের ফাঁদ পাততে পারেন, তাঁরা সুনয়নী। তাঁরা চোখ থেকে কখনও ভীষণ তীর ছুঁড়তে বা দরকারে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ছড়াতে পারেন। তবে কি না বয়সের সঙ্গে আর ভাবাকুলা-লোচনার সে-ভাব থাকে না। তখন কালো করে গাঢ় করে কাজল দিয়েও আর-কিছু হয় না। নেকনজরে আর-কেউ এসে এমনিতে ধরা দিতে চায় না।

দৃষ্টি যতদিন আছে, ততদিন শুধু বিস্ময় কুড়াবার জন্যে চপল আঁখিকে বনের পাখি হয়ে পালাতে দিন—তাদের যেদিকে খুশি সেদিকে। স্থির জেনেছি, এ আকাশে সব তারার মধ্যে নিজের কাছে যে দুটি সচকিত তারা আছে, সে দুটি না থাকলে সব তারা, সূর্য, চন্দ্র থাকা-না-থাকা সমান হত। বর্ণানুভূতির শেষ কথা বুঝতে হলে চোখের ভাষা বুঝবার আশা জলাঞ্জলি দিতে কোন দৃষ্টি-বিজ্ঞানী কখনও বলবেন না।

প্রতিবন্ধ

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আর একটু পরে সামনের বাড়ির সেকেলে মোটরটা ধুঁকতে ধুঁকতে এসে দাঁড়াবে। কয়েকটা কর্কশ হর্ন বাজবে পরপর। একটু শব্দ করেই ছোকরা চাকরটা দরজা খুলে দেবে। তারপর সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ। সেই আধবুড়ো ভদ্রলোক আস্তে আস্তে উপরে উঠে যাবে।

রাত ঠিক সাড়ে দশটা। কল্পনার জানলার কাছে এসে দাঁড়াবার সময়। শাড়িতে হলুদের দাগ। হাতে সরু সরু চুড়ি। কপালে অল্প অল্প ঘাম। ভিজে-ভিজে চোখ। আর সারাদিন সংসারের খুটিনাটি সামলে ছোট একটা ঘরে ছটফট করার উৎকট ক্লান্তি সমস্ত শরীরে। নীতীশ ফিরবে এখন।

বৃষ্টি একটু ধরে এসেছে। হাওয়ার জোর আছে এখনও। বাইরে ঝিরঝির একটানা শব্দ। রাস্তা ফাঁকা। একটা লোকও নেই। ডাস্টবিনের পাশে সারাদিন শুয়ে থাকা রোগা কুকুরটা জলের ভয়ে কার বারান্দায় গিয়ে উঠেছে কে জানে। জানলার সস্তা দরের ছিটের পর্দাটা ভিজে সপ সপ করে। হাওয়ার ঝাপটায় থেকে থেকে ওঠে নামে। আর একা ঘরের মধ্যে ছটফট করতে করতে চমকে ওঠে কল্পনা। কেউ কোথাও নেই।

কোন সকালে বেরিয়ে যায় নীতীশ। জলে ঝড়ে, শীতে গ্রীষ্মে রোজ। নিয়মের এদিক-ওদিক হয় না। মনের মধ্যে হিংস্র ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠলেও রোজকার বাঁধা কঠিন ছকটা উল্টে দিতে পারে না কল্পনা।

ঘাম—কখনও বৃষ্টির জল। হয় শার্টের হাতা ফেঁসে যায়, নয় চটির স্ট্র্যাপ ছেঁড়ে। তারপর আরও দুজন ছাত্রের সঙ্গে তিন-চার ঘণ্টা গলা ফাটিয়ে আবার যখন সে রাস্তায় নামে তখন চাঁদের আলো থাকলেও চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যায়। ভারী একটা ইঁটে ধাক্কা খেয়ে বুড়ো আঙুলটা টনটন করে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ হাঁপায়।

এরপর মাঝে মাঝে আরও বাকি থাকে। মাসের শেষে চেনা, আধ-চেনা লোকের কাছে বিরস মুখে টাকা ধার করতে যাওয়া। সব সেরে যখন বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছায় নীতীশ, তখন রাতটাও যেন ক্লান্তিতে ঝিমঝিম করে। পুকুরের ধারে নিমগাছটা স্থির হয়ে থাকে। মিষ্টির দোকানের বন্ধ ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে একটু একটু আলো দেখা যায়। আর কুকুরটা চিৎকার করতে করতে তাকে পথ ছেড়ে দেয়। রোজকার মত আশে-পাশের রূপটা একরকমই থাকে—শুধু নীতীশের কোন দিকে চোখ তুলে তাকাবার মত মনের অবস্থা থাকে না। ক্লান্ত শীর্ণ একটা মূর্তি কোনরকমে বিছানায় দেহ এলিয়ে দিতে পারলে যেন বেঁচে যায়।

ঠিকে ঝি যখন নীতীশের এঁটো থালা-গেলাস তোলবার জন্যে দুমড়ে যাওয়া শরীরটা একটু ভাঙে তখন সে অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রামে উঠে বসেছে। কোন কথা নেই মুখে। মাঝপথে অল্পবয়সী ছাত্রের বাড়িতে নামতে হবে। সেখান থেকে সটান আপিস।

শনিবার ছাড়া আপিসের পর আর এক-দিনও সোজা বাড়ি ফিরে আসতে পারে না নীতীশ। চৌরঙ্গী আর এসপ্লানেডে যখন হু হু হাওয়া আর আকাশ চিরে-চিরে আলোর রেখা ঝলসে ওঠে, পুরনো গাছের পাতায় আর ময়দানের তাজা সবুজ ঘাসে, তখন হঠাৎ এক সময় সে বোবা একটা পশুর মত মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকায়। শুধু অজস্র মানুষের ভিড় আর হোটেলে রেস্তোরাঁয় কিংবা প্রেক্ষাগৃহের দরজায় ধারাল তলোয়ারের মত ঝকঝক করে জীবন।

দৃষ্টি মুহূর্তে ফিরে আসে নীতীশের। ট্রামে ওঠবার চেষ্টায় ঠোকাঠুকি অনেক মানুষের সঙ্গে। শরীরে কখনও দরদর

কল্পনা নীতীশকে দেখে দিনের পর দিন। একটু একটু করে ক্ষয়ে যাওয়া রুগ্ন একটা শরীর। ভাবনায় আর ক্লান্তিতে জিভটা যেন অসাড়। মুখে কথা আসে না। একটা ঠাণ্ডা ঝাপটায় কল্পনাও পিছিয়ে আসে। বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। আধ-ঘুমন্ত লোকটার মুখে অলৌকিক একটা কিছু করে হাসি ফোটাতে চায়।

তাই মাঝে মাঝে কল্পনা এসে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। বিয়ের সময় পাওয়া অল্প দামের নিষ্প্রভ একটা আয়না। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে মুখ অস্পষ্ট হয়ে যায়। অদ্ভুত দেখায়। আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে হাসি আসে তার। আর নিজের আসল রূপটা দেখবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায়।

হয়ত নিঃঝুম লম্বা একটা দুপুর ট্রাম রাস্তার ধারে বটগাছটার মত ঝিমোয়। যাই-যাই করেও যায় না। বাইরে কড়া রোদের দাপট। টেনে টেনে ফেরিওলা ডেকে

যাচ্ছে। কখনও বাসনের শব্দ হচ্ছে ঠংঠং। কখনও ঝুমঝুমি বাজছে ঝুমুর ঝুমুর। কল্পনা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে যাচাই করে।

শরীরটা শুকিয়ে গিয়েছে। চোখ দুটোর যেন ভাষা নেই। শিথিল দুটো গাল। কিন্তু না থাক মুখের জৌলুস, পায়ের জোর বোধহয় এখনও ঠিক তেমনি আছে। মাটিতে পা ঠুকে দুপদুপ শব্দ করে সে। অনেক-দিনের অনভ্যাস, হয়ত বেশিক্ষণ দম থাকবে না। কিন্তু একটু একটু করে অভ্যাস করলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন নীতীশ রাজি হলে হয়।

শাড়ি তুলে নিজের পা দুটো টিপে টিপে দেখে কল্পনা। আর কিশোরী জীবনের কথা আবার নতুন করে মনে পড়ে যায়। ছোট্ট একটা চঞ্চল শরীর। তরল বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রগতি। বাজনার তালে তালে মঞ্চের এদিক থেকে ওদিকে যেত হরিণীর মত।

কিন্তু যতই অভাব থাক সংসারে, শাশুড়ীর টাকা পাঠান হক বা নাই হক, মাইনের তাগাদায় ঠিকে-ঝি মুখভার করুক দিনের পর দিন, চেহারাটা বুড়িয়ে যাক নীতীশের, হু হু করে পাকুক মাথার চুল —কল্পনা জানে যে সে যদি নাচের ইস্কুলে অল্পক্ষণের কাজটা নিয়ে কিছু রোজগারের কথা তোলে তাহলে চমকে উঠবে নীতীশ। চোখ দুটো থরোথরো বিস্ময়ে অন্যরকম হয়ে যাবে। খকখক করে কাশবে। জোর করে শীর্ণ মুখে হাসি টেনে বলবে, 'পাগল নাকি।' তারপর পাশ ফিরে পড়ে থাকবে মড়ার মত। ঘুমোবে না। টাকার ভাবনায় নির্জীব হয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে তার দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনে কল্পনা মনের মধ্যে সান্ত্বনার ভাষা হাতড়ে ফিরবে।

তখন ইদুরের বাচ্চাটা কিচকিচ করে এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়াবে। আয়নার উপর একটা আরসোলা খরর্ খরর্ করবে। রাস্তার কুকুরগুলো হঠাৎ আরও জোরে ডেকে উঠবে। আর টংটং করে রঙের নতুন কারখানায় রাত বারোটার ঘণ্টা বাজবে।

জানলার কাছ থেকে সরে আসে কল্পনা। বৃষ্টি থেমে গেছে। কাদা টপকে-টপকে আসছে নীতীশ। এ-সময় এ-পাড়ার আর কেউ ফেরে না। পায়ের শব্দ কল্পনা চিনতে পারে। খুট করে মাত্র একবার ক্লান্ত হাতে কড়া নাড়ে নীতীশ। রাস্তার আলো হঠাৎ ম্লান হয়ে এসেছে। চিমনিতে দপদপ করছে লালচে একটা রঙ।

নীতীশের চেহারা দেখে রাগ হয়ে যায় কল্পনার। ভিজে কুঁকড়ে গেছে লোকটা। আধ-ময়লা পাঞ্জাবিটা সেঁটে গিয়েছে ফুটো ফুটো গেঞ্জির সংগে। চুল থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। যদি অসুখে পড়ে তাহলে তার চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় হাঁপাতে হাঁপাতে মরবে একটা লোক। তাকেও মারবে।

ঝাঁজে কর্কশ হয়ে ওঠে কল্পনার গলার স্বর, "কী আশ্চর্য! এমন করে ভিজে আসতে হয়? ছি, ছি, এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার?"

ভিজে রুমাল কাঁধের কাছে একবার বুলিয়ে নিয়ে অসহায়ের মত হাসে নীতীশ, "ট্রাম থেকে নামতেই জোরে জলটাও এল—"

"কে তোমাকে নামতে মাথার দিব্য দিয়ে-ছিল শুনি? বুদ্ধি করে আর একটু এগিয়ে যেতে পারলে না?"

"এত রাত হয়ে গেছে", ভিজে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে নীতীশ বলে, "আর কতক্ষণ না খেয়ে বসে থাকবে তুমি?"

"রাতই যখন হয়েছে তখন না-হয় আর-একটু হত", গজগজ করতে করতে একটা গামছা তাড়াতাড়ি নীতীশের হাতে দিয়ে কল্পনা বলে, "নাও শিগগির ভাল করে মাথা মুছে কাপড় বদলে নাও—আমি দেখি উনোনে একটু আঁচ আছে কি-না। ভাত-তরকারি এতক্ষণে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

একটা দমদেয়া-যন্ত্রের মত খাবারের থালা নিয়ে আসে কল্পনা। নীতীশ আর তাকায় না তার দিকে। বিষণ্ণ মুখে আস্তে আস্তে ভাত মাখে। আর মাঝে মাঝে খাওয়া থামিয়ে কি ভাবে। ততক্ষণে আর একটা থালা নিয়ে কল্পনাও বসে পড়েছে তার পাশে। কম-কম তরকারি। নামমাত্র ডাল। নীতীশের চেয়ে তাড়াতাড়ি হাত চালায় কল্পনা। রাত অনেক হল।

"বৃষ্টিটাও এমন সময় এল," ঢকঢক করে জল খায় নীতীশ, "আর কোন কাজ হল না আজ। ছাত্রের বাড়িতে বসে বসেই সময়টা নষ্ট হল—"

মুখ তুলে কল্পনা জিজ্ঞেস করে, "আবার কী কাজ?"

"বাঃ, দুটো টাকা মোটে আছে না তোমার কাছে? কাল বাদ পরশু থেকে চলবে কেমন করে?"

"যাকগে, এখন আর সেকথা ভেবে মুখ ভার করতে হবে না তোমার। জোড়া-তালি দিয়ে আমি ঠিক চালিয়ে নেব।"

নিশ্বাস ফেলে নীতীশ বলে, "তুমি আর কোথা থেকে চালাবে?"

খাওয়া শেষ করে খাটে গড়িয়ে পড়ে নীতীশ। এঁটো বাসন রান্নাঘরের কলের কাছে রেখে আসে কল্পনা। ঠিকে ঝি আসবে ভোর ছটায়। যেদিন না আসে সেদিন আর কোনদিকে তাকাবার সময় থাকে না। থেকে থেকে চিৎকার করে নীতীশ সময়টা জানিয়ে দেয়। তার সব সময় ভয় পাছে দেরি হয়ে যায়।

নাক ডাকছে নীতীশের। হাতের দু-একটা কাজ সারতে সারতে কল্পনা দূর থেকে তাকিয়ে থাকে তার ঘুমন্ত মুখের দিকে। কপালের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়েছে। ফ্যাকাশে মুখ। সারাশরীরে ক্লান্তির গভীর ছাপ। দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা চোখে কল্পনা খুট করে আলো নিবিয়ে দেয়।

একরাশ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে আসে কল্পনা। নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ে হাতটা রাখে কপালের উপর। হাওয়ায় শীত-শীত লাগে। কাছাকাছি কোথা থেকে একটানা কিচকিচ শব্দ আসে। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না তার। স্নায়ু টনটন করে। অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা। বড় রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ি যাওয়ার দমকা চঞ্চলতা। বিছানায় শুয়ে সে এপাশ-ওপাশ করে অনেকক্ষণ। নীতীশের ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে যায়। নির্জীব একটা দেহ পড়ে আছে তার পাশে। অবশ অচেতন।

অন্ধকারে ছটফট করতে করতে আগুনের ঝিলিক লাগে কল্পনার মাথায়। শরীরের শিরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কান দুটো যেন বন্ধ হয়ে যায়। আর মনে হয় যে সে এখন কথা বলতে পারবে না। গলা বসে গেছে। ভাঙা-ভাঙা স্বর বার হবে।

পাশে পড়ে থাকা ঠাণ্ডা পাথরটা নড়ে না। নাক দিয়ে অস্বাভাবিক শব্দ বার হয়। থর-থর করে কাঁপে কল্পনা। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে। যৌবনের উষ্ণ ছোঁয়া লাগে শিরায়-শিরায়। পাশের মানুষটাকে জাগাতেই হবে। নীতীশের হিম-শরীরটার উপর নিজের আগুন-লাগা দেহ আছড়ে দেয় কল্পনা। ফ্যাকাশে মুখটা মুহূর্তের জন্যে অন্য রূপ নিক। দিনের পর দিন রাতের পর রাত অস্বস্তির এই খোঁচা সহ্য করতে পারবে না সে, ধিকধিক করে জ্বলতে পারবে না। একটা অবয়ব আস্তে আস্তে গড়ে উঠুক তার রক্তের স্বাদ নিয়ে। রূপ বদলাক। তার মধ্যে ছটফট করে ভয়ঙ্কর নির্জনতা দূর করে দিক। তারপর তর দেই তোল-পাড় করে আসুক তার সারা দিনরাতের সংগী হয়ে।

হিমশীতল কঠিন পাথরে মুখ ঘষে কল্পনা। ঘুমের ঘোরেই নীতীশ আর একটু দূরে সরে যায়। কল্পনার ব্যগ্র হাতটা আস্তে সরিয়ে দেয় নিজের ঠাণ্ডা বুকের উপর থেকে ঈষৎ বিরক্ত। আর ঠিক তখন একটানা কান্নার মতো শহরতলীর শেয়াল ডেকে ওঠে।

নীতীশের মাথাটা জোরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে স্বরটা উগ্র করে তোলে কল্পনা, "শুয়ে-শুয়ে দুটো কথা বলতে পার না আমার সঙ্গে?"

"উঁ", পিটপিট করে তাকায় নীতীশ, "ভোর হয়ে গেছে?"

ভাঙা গলায় কল্পনা বলে, "ঘুমোও নাকি তুমি?"

কিছু বুঝতে না পেরে খাটের উপর নীতীশ উঠে বসে, "আরে হল কী তোমার, অ্যাঁ?"

"কিছু না।"

এদিক-ওদিক তাকায় নীতীশ। ভোর হতে অনেক দেরি। গভীর রাত। হঠাৎ বিরক্তিতে চোখ দুটো ছোট হয়ে যায় তার। একটু বেশী শব্দ করে খাট থেকে নামে কল্পনা। দুপদুপ পা ফেলে কুঁজোর কাছে এগিয়ে গিয়ে পরপর দু-গেলাস জল খায়।

"কী হল কি?" হাই তুলতে তুলতে আবার নীতীশ জিজ্ঞেস করে।

"কিছু না। তুমি ঘুমোও।"

"কি যে খিটিমিটি কর রাত-বিরেতে", পাশ ফিরে বিড়বিড় করে নীতীশ, "কাল ভোরে উঠতে হবে না? এখন রাত কত জানো?"

চিৎকার করে ওঠে কল্পনা, "না না না। আমার কাছে দিন রাত সকাল দুপুর সব সমান—রাতের খবরে দরকার কী আমার?"

"তবে ঘুমোও চুপ করে।"

আর কোন কথা বলে না কল্পনা। কার সঙ্গে কথা বলবে? কাকে মেজাজ দেখাবে? প্রাণ আছে নাকি তার পাশের মানুষটার! উত্তেজনায় চোখ বুজতে পারে না সে। নড়ে না। কথাও বলে না। চোখ ঠেলে জল নামে। আর গোঙানির মত কান্নার আওয়াজ সে কিছুতেই চাপতে পারে না। তখন একটা ঠান্ডা হাতের ছোঁয়া লাগে তার কপালে। নীতীশ চুলে আঙুল চালায়।

"কাঁদছ কেন?" ভিজে গলার স্বর, "ছি, এত রাতে এমন করে কাঁদতে নেই—"

নীতীশের হাতটা এক ঝাপটায় সরিয়ে দিয়ে জোরে কেঁদে ওঠে কল্পনা, "কেউ নেই আমার—কেউ নেই। একদিন একা-একা আমি ঠিক মরে যাব দেখো—"

"ও কি কথা?" ক্লান্ত দেহটা কোন রকমে কল্পনার কাছে টেনে নিয়ে আসে নীতীশ। তার মনের কথাটা এতক্ষণ পর বুঝতে পেরে তাকে আদর করে বলে, "আর একটু যাক—একটু গুছিয়ে নিই," কথা বলতে বলতে সে যেন হাঁপায়, "এই অভাবের সংসারে আর একটা কাঁচা প্রাণ এনে কী

হবে? তুমি আরও বেশি দুঃখ পাবে তখন—"

একটু শান্ত হয় কল্পনা। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমার কাউকেই দরকার নেই।"

তার বুকে মাথা দিয়ে নীতীশ শুয়ে থাকে অনেকক্ষণ। আর কল্পনা নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। সাবধানে নিঃশ্বাস ফেলে—পাছে নীতীশের ঘুম ভেঙে যায়। সারাদিন এত খাটাখাটির পর ভাল করে যদি ঘুমাতে না পারে মানুষটা, তাহলে বাঁচবে কেমন করে। হঠাৎ নিজের ওপর কল্পনার রাগ হয়ে যায়। ক্লান্ত নীতীশের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে এমন করে আঘাত করবার দুঃখটা যেন কিছুতেই মন থেকে মুছে যেতে চায় না। ঠাণ্ডা অন্ধকারে শুধু তখন দুজন মানুষের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ।

এমন করে জাগানো যায় না। চোখের দু ফোঁটা জল ফেললেই অভাবের জালটা টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়ে না। কিন্তু ওকে জাগাতেই হবে। ওর শুকনো কালি-মাখা মুখে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে যৌবনের স্বাভাবিক জৌলুস। তখন ওর শরীরে এত অবসাদ থাকবে না। অকাল বার্ধক্য শিথিল করে দেবে না গায়ের চামড়া। ভাবনায় ভাবনায় কল্পনার যৌবনকে ভুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার সাহসও ওর থাকবে না তখন। ভয় করবে না পাছে হঠাৎ কল্পনা আর কাউকে এনে ফেলে এই অভাবের সংসারে। কিন্তু তা কেমন করে হবে। তা কি কোন দিনও হবে না? কাঁটার মত অভাবের এই সংসারটা ছড়ে ছড়ে দিচ্ছে দুজনের দেহ—তার কি হবে।

একটু আগে আজ ফিরে এসেছে নীতীশ। শরীরটা ভাল নেই। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। সামান্য জ্বরও হয়েছে বোধ হয়। দু-হাতে মাথাটা চেপে ধরেছে। লাল-লাল চোখ।

একটা গেলাসে অল্প জল ঢেলে নীতীশের পাশে এসে বসে কল্পনা। কাগজের ছোট একটা মোড়ক খুলে দুটো বড়ি মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে হেসে বলে, "খাও।"

"এটা কী?"

"ওষুধ। খাও না শিগ্‌গির।"

"কোথায় পেলে?" সন্দেহের শুকনো দৃষ্টি নীতীশের চোখে।

"ঝিকে দিয়ে আনিয়েছি।"

"পয়সা পেলে কোথায়?"

"আমার কাছে ছিল। খাও।"

বড়ি গিলে হাত বাড়িয়ে নীতীশ জলের গেলাসটা নেয়। উষ্ণস্বরে বলে, "শুধু-শুধু পয়সা নষ্ট কর কেন? একটু মাথা ধরেছে — কাল সকালেই ঠিক হয়ে যেত," একটু থামে ও। লাল চোখে তাকায় কল্পনার দিকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, "আর কত পয়সা আছে তোমার কাছে?"

নীতীশের কথার উত্তর দেয় না কল্পনা। গেলাসটা সরিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কয়েক মিনিট ইতস্তত করে। বলবে কি না। না বললে চলবে কেন। যদি রাজি না হয়? বুক ওঠানামা করে ঘন ঘন। ভয়-ভয় ভাব। নীতীশের দিকে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। তার চোখের সামনে একটা জীবন তিল তিল করে শেষ হয়ে আসছে।

চুড়ি দুটো শব্দ করে টুং টুং, মুদি এসে ফিরে যাচ্ছে রোজ, একবার কেশে গলাটা ঠিক করে নেয় কল্পনা, "পনেরো টাকা বাকী হয়েছে। আর ধারে জিনিস দিতে চায় না। আর—"

ঠাণ্ডা স্বরে থেমে থেমে নীতীশ জিজ্ঞেস করে, "আর কী?"

"তোমার জন্যে একটা ধুতি না কিনলেই নয়।"

"এখন থাক," চোখ বুজে থাকে নীতীশ, "আলোটা নিবিয়ে দেবে—চোখে বড় লাগছে।"

কল্পনা ওঠে না। আর একটু কাছে সরে বসে নীতীশের। হাত দিয়ে বালিশ ঠিক করতে করতে বলে, "মার টাকা পাঠানো হয়নি দু' মাস। খুব রেগে পোস্ট কার্ড লিখেছেন একটা। উনি ভাবছেন আমিই বোধ হয় টাকা পাঠাতে দিই না তোমাকে—"

"ভাবেন ত আর কী করব", কল্পনার হাতটা আস্তে সরিয়ে দিয়ে নীতীশ বলে, "আসছে মাসে কিছু পাঠাব এখন। নিয়ম করে মাসে মাসে পাঠানো সম্ভব নাকি আমার পক্ষে!"

জোর করেই নীতীশের মাথায় আবার হাত রাখে কল্পনা। আসল কথাটা বলতেই হবে এবার। একটুও হাওয়া নেই। ভ্যাপসা গরম। আয়নায় ধুলো জমেছে। ঝাপসা মুখ। একটু-একটু ঘামছে নীতীশ। জ্বরটা ছেড়ে যাবে বোধ হয়। পাশের বাড়ির একতলা থেকে বেসুরো কীর্তনের মাথা-ধরানো আওয়াজ ভেসে আসছে। বলা না-বলার অস্বস্তিতে কল্পনার হাতটা কিছুক্ষণের জন্যে অবশ হয়ে থাকে। দুরু দুরু আশঙ্কার বিদ্যুৎ-প্রবাহে মাথাটাও ঝিম ঝিম করে। আর একটু পরেই নীতীশ ঘুমিয়ে পড়বে।

একনিঃশ্বাসে বলতে আরম্ভ করে কল্পনা, "রাজু কাকা কাল আবার এসেছিলেন—"

"আবার? পয়সা খরচ করে খাবার আনাতে হয়েছিল ত? আত্মীয়দের যতই এড়িয়ে যাই—ওরা দেখছি ততই আমাকে পেয়ে বসে।" মুখ দিয়ে বিরক্তির একটা শব্দ করে পাশ ফিরে নীতীশ চোখ বন্ধ করে।

"উনি বলছিলেন—"

"কী? দুটো টাকা ধার চাই?"

"না না," একটু থামে কল্পনা। নীতীশের গালে হাত রেখে শেখান পাখির মত যেন মুখস্থ বলে, "ভবানীবাবুর নাচের ইস্কুলে একটা কাজ নাকি খালি আছে—"

কাজের কথা শুনে এদিকে তাকিয়ে চোখ খোলে নীতীশ, "কী কাজ?"

"রোজ বিকেলবেলা এই ধর, ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে ছোট ছোট মেয়েদের নাচ শেখাতে হবে। মাসে মাসে আপাতত মাইনে দেবে একশো টাকা।"

"দূর," হাই তুলে আবার পাশ ফেরে নীতীশ। কল্পনার কথা শুনে মুখটা নিভে যায় ওর, "ও-কাজের খবরে আমার দরকার কী?"

কল্পনা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নীতীশকে এপাশে ফেরাবার চেষ্টা করে বলে, "আমি বলছিলাম, লক্ষ্মীটি তুমি আপত্তি কর না, কাজটা আমি নিয়েই নি?"

"তুমি?" ঘুম ছুটে যায় নীতীশের। কল্পনার একটা হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে শুকনো হেসে বলে, "নাচ শেখানর কাজ তোমার কেমন করে হবে?"

"হবে গো হবে," নীতীশের কথার ফাঁকে এর মধ্যেই কল্পনা যেন সম্মতির চাপা আভাস পেয়ে গিয়েছে, "বড় ভুলো মন তোমার। আমার কথা কিছুই আর মনে থাকে না, না?" হাসতে হাসতে সে বলে যায়, "ইস্কুলে কত নাম ছিল আমার জান না? ইচ্ছে করলে এখনও পারি। পায়ের জোর কম হয়েছে নাকি ভাব? রাজু কাকা বলছিলেন, ভবানীবাবুকে বলে দিলেই আমার কাজটা হয়ে যায়—সংসারে যখন এত অভাব—টাকার এত দরকার—"

"না না," বিস্মিত নয়, উত্তেজিত নয়, ভীত চাপা স্বরে ফিসফিস করে ওঠে নীতীশ, "লোকে বলবে কী?"

সাহস পেয়ে নীতীশকে শক্ত করে ধরে কল্পনা। রীতিমত জোরে কথা বলে, "রাখ তোমার লোক। কে এসে ধার শোধ করছে তোমার? নিজের কী চেহারা হয়েছে দেখতে পাও না? অত খাটাখাটি করলে কত দিন বেঁচে থাকতে পারে একটা মানুষ, দু-বেলা ছাত্র পড়ান তোমাকে ছাড়তেই হবে আমি বলে দিলাম—"

"ছাড়ব? ঠিক বলছ?" অনেক দিন পর নীতীশের কথায় রসিকতার স্বাদ পায় কল্পনা। তার জ্বরের ঘোর যেন একটু-একটু করে কেটে যাচ্ছে। চোখ দুটো তত লাল নেই। আর আশ্চর্য, কল্পনার দিকে তাকিয়ে এখনও হাসছে নীতীশ। সেই বিয়ের পর প্রথম-প্রথম যেমন করে হাসত—ঠিক তেমন করে। একটুও ভুল হয়নি কল্পনার।

অফিসের পর সোজা বাড়ি চলে আসে নীতীশ। ছাত্রদের সংগে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে হয় না। দীন চোখে এখানে-ওখানে টাকা ধার করতে যাওয়ার পালাও চুকে গেছে। সে ঠিক লক্ষ্য করে না, হয়ত মুখের দু-একটা গভীর রেখাও মিলিয়ে গেছে এতদিনে। সোজা হয়ে চলে নীতীশ। চলতে চলতে চোখে কৌতূহল নিয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। আর মাঝে মাঝে সিগারেট ঠোঁটে চেপে চায়ের দোকানেও ঢুকে পড়ে।

অফিস থেকে ফিরতে না ফিরতেই সারা দিনরাতের চাকর চা আর জলখাবার সামনে ধরে দেয়। মাথার উপর পাখা ঘোরে। ঘরের দেয়াল ঝকঝক করে। অনেকক্ষণ সে আলো জ্বালায় না। নতুন পর্দাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কখন চোখ দুটো বুজে আসে।

এক সময় চোখ খুলে নীতীশ চমকে ওঠে। একরাশ অন্ধকার। আন্দাজে এগিয়ে গিয়ে সে আলোর সুইচ টিপে দেয়। ঘরটা যেন চমকে ওঠে। আর একটু পরে রাত সাড়ে আটটা বাজবে। তারও কিছু পরে এঁড়িয়ে-গড়িয়ে একটা সাইকেল-রিক্‌শা এসে দাঁড়াবে দরজায়। কল্পনা ফিরে আসবে।

একা-একা চুপচাপ বেশিক্ষণ ঘরে বসে থাকতে পারে না নীতীশ। চাকরকে ডেকে আর এক কাপ চা করে দিতে বলে। একবার জানলার কাছে দাঁড়ায়। একবার বাইরে বেরিয়ে অনেক দূর অবধি তাকিয়ে দেখে। সাইকেল-রিকশার দেখা নেই। অপ্রশস্ত নির্জন রাস্তা। যেন ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আছে। নিষ্প্রভ লালচে চাঁদটাকে হালকা সাদা মেঘ হঠাৎ ঢেকে দেয়। আর নীতীশের মাথাটা কেমন-কেমন করে। রোজ রোজ এত রাত অবধি কী কাজ কল্পনার। ভাবতে ভাবতে সিগারেট এত ছোট হয়ে যায় যে, নীতীশের মুখে আগুনের আঁচ লাগে।

রিকশাটাকে মোড় ফিরতে দেখে নীতীশ তাড়াতাড়ি ভিতরে আসে। কল্পনা যেন তাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে না দেখে। একটা পত্রিকা টেনে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখবার ভান করে নীতীশ। থমথমে গম্ভীর। মুখে হাসি নেই। চোখে বিরক্তি।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে কল্পনা। নীতীশের দিকে তাকিয়ে হাসে। কি একটা বলতে গিয়ে ছোট টেবিলের উপর চায়ের কাপ দেখে চোখ রাঙায়, "অফিস থেকে ফিরে আবার দু কাপ চা খেয়েছ? না, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। একটা রোগ না বাধিয়ে ছাড়বে না তুমি! রামকে বলে যেতে হবে, কাল থেকে কিছুতেই যেন—"

তাকে থামিয়ে দিয়ে কর্কশ কাটা-কাটা স্বরে নীতীশ জিজ্ঞেস করে, "এত দেরি কেন তোমার?"

"একটু দেরি হয়ে গেল। কাল শ্রীরামপুরে যাচ্ছে কি-না সব—"

"থাকগে, কৈফিয়তে কাজ নেই," উত্তেজিত আঙুলে নীতীশ পত্রিকার পাতা উল্টে যায়, "রোজই ত আজকাল দেরি হয়, রোজ শ্রীরামপুরে যাবার পালা থাকে নাকি ওখানে?"

"আহা শুধু শুধু রাগ কর কেন?" কল্পনা ঝপ করে নীতীশের পাশে বসে পড়ে বলে, "খুব খুশি ওরা আমার কাজে। মাইনেটা বাড়িয়ে দিল বলে। এ বাড়িটা তখন কিন্তু বদলাতে হবে। ভবানীবাবু বলেছেন, ইস্কুলের কাছাকাছি একটা ভাল ফ্ল্যাট দেখে দেবেন। তখন আমার ফিরতে এত দেরি হবে না গো। যাব আর আসব—"

হঠাৎ পত্রিকাটা দেয়ালে ছুঁড়ে মেরে চিৎকার করে ওঠে নীতীশ, "আর একটা মোটরগাড়ি কিনে দেবেন না ভবানীবাবু? আরও তাড়াতাড়ি হবে তাহলে—নির্লজ্জ!"

বিবর্ণ মুখ। বোবা চোখ। অতর্কিত আঘাত খেলে যেমন হয়। শুকনো ঠোঁট দুটো কাঁপে। কল্পনা সেখানে আর বসে থাকে না। অন্য আর এক যন্ত্রণার জোরে কেঁদে উঠতে চায়। সে জানে নীতীশের জ্বালা কোথায়। কিন্তু এ কী হল! কী করবে সে। দেয়ালে মাথা ঠুকে কল্পনা মাটিতে আছড়ে পড়তে চায়।

আর মিশকালো পশুর মত থমথমে ভয়ঙ্কর রাত্রি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধে তাকে। হিস-হিস মসৃণ দীর্ঘ অলস রাত। শেষ হতে চায় না। আলোর আশায় কতবার কল্পনা যে বাইরে তাকায়। নীতীশ যেন অপরিচিত অন্য আর এক

জন্তের মানুষ। অনেকক্ষণ ঘুমোয় না। মাঝে মাঝে যেন জ্বলন্ত লোহা দিয়ে আঘাত করে কল্পনাকে।

"কথাবার্তা সব নাচের ইস্কুলে শেষ করে এসেছ নাকি?" নীতীশের কঠিন হাতটা শব্দ করে এসে পড়ে কল্পনার হাতের উপর।

বিছানার এক প্রান্তে শরীরটা কোন রকমে গুটিয়ে রাখে কল্পনা। ভারী একটা ঠাণ্ডা পাথর—আগেকার নীতীশের মত। শুধু চোখে তার ঘুম নেই। বুকের মধ্যে দপদপে আগুনের একটা পিণ্ড রক্তমাংস পুড়িয়ে পুড়িয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। এখন নীতীশকে ভয় করে কল্পনা। আরও সরে আসে। কথা বলে না।

"কী ব্যাপার তোমার? একেবারে বোবা হয়ে গেলে?"

"কী বলব।"

গড়িয়ে গড়িয়ে নীতীশ চলে আসে কল্পনার কাছে। অন্ধকারে চোখ দুটো জ্বলে ওঠে কাঁপা-কাঁপা উন্মাদনায়। আগুনের আঁচের মত নিঃশ্বাস। কঠিন হাত। কঠিন দেহ।

"না না," কল্পনা ছটফট করে, "ওগো না—"

"বয়স বাড়ছে না? এখন না হলে আর কবে? মানুষ করে যেতে হবে না?"

নিজেকে মুক্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টায় কল্পনা আবার বলে, "না না, কিছুতেই না," সে উঠে দাঁড়ায়। পাণ্ডুর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে। চিক চিক করে চোখ।

"মেয়েমানুষ নাকি তুমি?" চিৎকার করে ওঠে নীতীশ, "আমি জানতাম, আমি সব জানতাম—"

কি একটা বলতে গিয়ে কল্পনা বলতে পারে না। দূরে দাঁড়িয়ে আস্তে জিজ্ঞেস করে, "কী জানতে?"

"এমন করে ধাপে ধাপে তুমি নেমে যাবে," উত্তেজনায় উন্মাদের মত নীতীশ উঠে বসে, "চাকরির ছুতো করে তুমি আমাকে ফাঁকি দেবে। কিন্তু তুমি আমাকে চেন না। আমি খুন করব তোমাকে—"

প্রতিবাদের ভাষা নেই কল্পনার মুখে। পড়ে যেতে যেতে সে কোন রকমে নিজেকে সামলে নেয়। তার পায়ের ভারে ঠাণ্ডা মেঝেও যেন দেখতে দেখতে গরম হয়ে ওঠে। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। নীতীশ সত্যি তাকে মারবে নাকি?

"অভাবের সময় ছেলের জন্যে ঘুম হত না ওঁর। আমার জন্যে কত ভাবনা," নীতীশের বিকৃত গলার স্বর গমগম করে, "আমি কিছু বুঝি না ভাব? আহা, আমার কষ্টে ওঁর বুক ফেটে যায়," একটা বালিশ কল্পনার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নীতীশ বলে, "কে তোমার ওই বদমাস ভবানীবাবু, যার ভাবনায় তুমি আমাকে ঠেলে দিতে সাহস কর? আমার ছোঁয়া বাঁচাতে রাত-বিরেতে উঠে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কার ধ্যান কর—"

"আঃ," ক্ষীণস্বরে কল্পনা বলে ওঠে, "কী বলছ—"

"থাম," লাফিয়ে খাট থেকে নেমে কল্পনার কাছে হিংস্র নীতীশ এগিয়ে আসে, "তোমার মত মেয়েমানুষের সঙ্গে একঘরে থাকতে প্রবৃত্তি নেই আমার," খট করে খিল খুলে হাতের কঠিন ধাক্কায় সে বাইরে ঠেলে দেয় কল্পনাকে, "যাও—বেরিয়ে যাও। আমার কাছে থাকতে হবে না তোমাকে"—শব্দ করে নীতীশ দরজার খিল তুলে দেয়।

উঠোনের নিচু দেয়ালের গায়ে কল্পনা ছিটকে পড়ে। মাথায় লাগে। হাত ছড়ে যায়। অন্ধকারে একটা পোকা ধাক্কা খায় বন্ধ দরজার উপর। টক করে একটা শব্দ। কিন্তু এখন আর একটুও ভয় পায় না কল্পনা। উঠোনের পাশে ইঁট বের করা ভাঙা সিঁড়ির উপর বসে সে মাথা তুলে এক ফালি আকাশের দিকে তাকায়।

কালো পুরু মেঘ। মূক নির্বিকার অনেক খুঁজে-খুঁজে কল্পনা একটা তারা দেখতে পায়। আর পাতলা ধোঁয়ার মত সাদা একটা রেখা কালো মেঘ ঘেঁষে কেটে-কেটে যায়। চোখের জলে-ভারী পাতা বুজে আসে। অনেক খুঁজে পাওয়া সেই তারাটাও কোথায় হারিয়ে যায়।

কল্পনার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ে। তার দেহ তোলপাড় করে সে এলে কী হবে? অক্ষম অকর্মণ্য হয়ে কল্পনা ছটফট করবে ঘরের মধ্যে। শরীর ভেঙে যাবে। তখন এ চাকরিটাও থাকবে না আর।

আবার নীতীশের মুখে রেখার আঁচড় পড়বে। কাঁটা তারের মত অভাব ঘিরে ধরবে সংসারকে। আর সারাদিন খাওয়ার আশায় একটা শিশু চিৎকার করে কাঁদবে। কিন্তু তার জন্যে এক ফোঁটা দুধও থাকবে না কল্পনার বুকে।

ঠাণ্ডা সিঁড়ি আঁকড়ে কল্পনা বসে থাকে। চাপা কান্নায় শরীরটা ফুলে ফুলে ওঠে ওর। শুধু সেই কথাটা কেন সে বুঝিয়ে বলতে পারে না নীতীশকে।

একটি শুধু কাব্য — আলোকচিত্রী : শ্রীনেপাল মুখোপাধ্যায়

লিখেছেন

শ্রীযামিনীকান্ত সোম; শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত; শ্রীনরেন্দ্র দেব; শ্রীঅখিল নিয়োগী; শ্রীলীলা মজুমদার; শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র; শ্রীবিমল ঘোষ; শ্রীশচীন কর; শ্রীশৈল চক্রবর্তী; শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু; শ্রীমণীন্দ্র দত্ত; শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীমনোজিৎ বসু; শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র; বুদ্ধু-ভুতুম; শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ বসু; শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়; শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়; শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীঅমিতা ঘোষাল; জাদুকর এ সি সরকার ও মৌমাছি।

ছবি এঁকেছেন

শ্রীসমর দে; শ্রীশৈল চক্রবর্তী; শ্রীসুধীন ভট্টাচার্য; শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ; শ্রীবিমল দাস; শ্রীঅহিভূষণ মালিক ও শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত।

ফটো তুলেছেন

শ্রীরেবন্ত ঘোষ

শুভেচ্ছা

আমার ছোট্ট ও তরুণ বন্ধুরা,

ভাদরের শেষে, বৃষ্টি-ধারায় দেশ যে গিয়েছে ভেসে,
খুশির আমেজে শরৎ-আকাশ তাইতো ওঠেনি হেসে।
অকাল-বরষা সারা দেশ জুড়ে মেলেছে দুঃখ-ছায়া
দুঃখ ঘোচাতে দুঃখ-নাশিনী আসে ওই মহামায়া।
তাঁর আগমনে সকলের মুখে ফিরিবে আবার হাসি
সেই-সে আশায়, এসো সবে ভাই বাজাই শঙ্খ-বাঁশি।
সরায়ে শঙ্কা, দুঃখ-দীনতা; চিত্তে ভরিয়া আশা,
উন্মুখ হই অন্যেরে দিতে প্রাণভরা ভালবাসা।
ছোট এ-কামনা, হাসি-খুশি সাথে জাগাতে তোদের মনে
খুশির পসরা প্রীতিতে রাঙায়ে দিলাম শারদ-ক্ষণে।

ইতি—

—মৌমাছি

এক

ঘুটঘুটে রাত্তির—নিঃসাড় পাড়া:
ঘুমে ঢোলে আকাশের নীল কটা তারা।
ছমছম ছায়া দোলে বুড়ো বটগাছে।
হাওয়া করে ফিসফিস—দূরে আর কাছে।
উঁকিঝুঁকি দেয় যত প্রেতের পাইক,
পাহারায় মোতায়েন জানলার শিক।
এপাশে নিঝুম ঘর, কেউ নেই জেগে:
একফালি আঁধারের মিশকালি লেগে।
টিকটিকি হাই তোলে দেয়ালে দেয়ালে;
একটিও পোকা নেই মাকড়ের জালে।
এককোণে আরশোলা করে ঘুরঘুর;

দুম করে ঘুমখানা ভাঙলো বিনুর॥

কে ঘুম ভাঙালি ওরে! এদিকে ওদিকে
শুধু দেখা গেল সেই আরশোলাটিকে।
ঘুরে ঘুরে বারে বারে মারে এসে গুঁতো,
ছলা নেই কলা নেই নেই কোন ছুতো।

ছোলা নেই কলা নেই ছাতু নেই, কেরে?
কড়িকাঠ তাকালেন একঘুম সেরে।
কিছু নেই কিছু নেই খাওয়ার সুবিধে,
তা বলে কী নেই নাকি পেটজোড়া খিদে?
হাসছিল মিটিমিটি কুনো হ্যারিকেন,
এক ফুঁয়ে সেটা তিনি নিবিয়ে দিলেন।

ছমছম ছমছম গা কাঁপে গা কাঁপে।
কে যেন হঠাৎ ঘরে ঢোকে একলাফে!
বিনুবাবু জড়সড় ভয়ে গুঁড়িসুঁড়ি,
ঝুলকালি হাওয়া এসে দেয় সুড়সুড়ি;
ভীষণ আওয়াজ তুলে হাঁচে টিকটিকি,
জানলার ওইধারে তারা ঝিকিমিকি।
এপাশে গভীর ঘুমে মামণি অঘোর;
হঠাৎ কে খুলে দিল সামনের দোর!

কে খুললে? হাওয়া?
—দূর থেকে কে উঠলো হেসে হা হা!
কে তুমি গো, নাম বলো না আহা।
চকড়মকড় সাহা।

হঠাৎ যেন আলোয় আলো, চারদিক সব ফরসা;
মিটির মিটির চোখ ঘুরিয়ে হাসছেন মাকড়সা:
বিনুবাবু, ওঠো এবার, বিনু,
এই যে আমি পিদীম জেলে দিনু!

এইবারে গান গাইবো আমি, গানে—
দেখবে হঠাৎ কটাৎ করে লাগবে তালা কানে।

(মাকড়সার গান)
গুন গুন গুন গুন
খুন চাই চাই খুন
চুপ চাপ চাপ চুপ
চলে এস টাপটুপ।
এই জাল এই জাল
হাসিয়াল হাসিয়াল,
এস এস এস এই
দেখ দিক কেউ নেই,
একটিও পোকা নেই একটিও পোকা নেই,
চলে এস এইদিকে বসে আছি সামনেই;
সোজাসুজি খোঁজাখুঁজি না করেই না করেই
মশা মাছি আরশোলা টিকটিকি হও যেই,
চলে এস চলে এস একদম ভয় নেই॥

(গান শুনে সেই টিকটিকি আর সেই আরশোলা কেমন যেন হঠাৎ গম্ভীর মুখ আরও কাদাগোলা করে চুপ করে বসলো।)

মাকড়সা কথা বললো

শুনতে পেলে?
—নাতো!
কান খাড়া তো করেই ছিলাম!
কান কী ছিল খাটো?
—নাগো না, তাও না!
আচ্ছা, থামো।
—না হয় তুমি আর একখানাই গাও না!

ঝনঝন—কে কী ভাঙে? এও কী স্বপন?
তারই ঘুম ভেঙে দিতে এত কার পণ!
ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে গেল সব ঘুম সব—
এইবার চারদিক নীরব নী-রব!
কেউ নেই কেউ নেই এদিকে ওদিকে,
একটি জোনাকি শুধু সামনের শিকে!
চুপ চাপ চুপ চাপ চুপ চাপ চুপ,
একটি জোনাকি শুধু লাফ দিল ঝুপ!
তারই দিকে গুটি গুটি পা ফেলে...পা ফেলে...

ওমা এযে পাশে বসে তারই মত ছেলে!

কে ঘুম ভাঙালি ওরে!...

একেবারে তারই মত, কিন্তু
ভুল নামে ডাক দিল—বিন্তু!
বিনু সাড়া দিল না, না দিয়ে
আরও মা-র কাছেতে এগিয়ে
ফিসফিস ডাক দিল—মা!

ভয় করে, না?

ওমা কই ছেলে কই, এযে দেখি বুড়ো!
দাড়িয়াল হাসি গাল ভারী থুত্থুড়ো।
বললো আমার নাম—শ্রীবিষণখুড়ো।
—ভয় করে? ভয় কী! আমি যে
বেড়াতে নেবার জন্যে এসে গেছি নিজে!

কী আশ্চর্য্য, বিনুর যত ভয়
কোন্ দেশে যে পালিয়ে গেল ঠিক এই সময়।
বাইরে এসেও চোখ ধাঁধানো আঁধার।
ভেঙে ফেললো পাঁচিল খানা—বাধার।

বিষণখুড়ো বললো হেসে, ভয় কি!
আমার দাড়ির বহর এসব ভূতপ্রেতেদের সয় কি?

বিনুর তবু পা আড়ষ্ট, বললে,
কিন্তু আমায় কোথায় নিয়ে চললে?
রাতদুপুরে জনমানুষ চলে না পথ দিয়ে,
এমন সময় কোথায় যাবে একলা আমায় নিয়ে!

বিষণখুড়ো হেসে উঠলো—হো হো,
একেবারে আসল কথাই ওহো
হয়নি তোমায় বলা,—
কিন্তু তোমার ভুল বা কি কম, কাল যে ফিরিঅলা
দুপুরবেলা বেচতে এল সিঙ্গাপুরী কলা,
সেও কি তোমায় কিছু খবর দেয়নি? তুমি তবে
রাতদুপুরে হঠাৎ জেগে রবে
শুধু শুধুই একেবারে—তাই বা বলো কেমন করে হবে!
আচ্ছা না হয় আবার বলি, সেবার
কত কথা হল তোমায় পথ দেখিয়ে একটু পেঁাছে দেবার
আকাশ পারের পরীর দেশে!

বিনুর হঠাৎ পড়লো মনে। আলতো হেসে
জবাব দিল, তাই তো।
কাল দুপুরেই ভাবছিলাম যে পরীর দেশের
কোন হদিশ পাই তো
এখখুনি যাই চলে।
হাজার গণ্ডগোলে
একেবারেই ভুলেছিলাম সেই কথা। এখখুনি
কী আনন্দের খবর কানে শুনি!
সত্যি বিষণখুড়ো তুমি ঠিক
চিনবে তো সেই পরীস্থানের দিক?

বিষণখুড়ো ফিসফিসিয়ে বললো, চুপ চুপ,
আস্তে বলো। রাস্তাখানা শক্ত নয় তো খুব!
যদি থাকে সাতরঙা সেই কাঁচ,
সেটা থাকলে ভাবনার সাতপাঁচ
একেবারেই দরকার নেই। আর
রাতবিরেতে একলা যেতে চাই হাতে সেই কাঠের তলোয়ার।
এসব ছাড়া চারদিকে যা ভয়
কবচমালা সাথে সাথে না থাকলেই নয়...

ভয় করে? ভয় কী।...

বিনু বললো, তবে
কেমন করে হাররে যাওয়া হবে!

বিষণখুড়ো বললো হেসে, ভয় কি,
আমার দাড়ির বহর দেখেও শঙ্কা তোমার হয় কি?

বিনুর তবু আড়ষ্ট পা, বললে,
কেই বা বলো দেবে এসব কোনখানে কি করলে
ফিরেই চলো নয়।

বিষণখুড়ো হেসে উঠলো: তোমায় দেখছি সবকিছুতেই ভয়!
শক্ত করো শক্ত করো মন,
অমনি দেখবে কোথাথেকে মিটছে তোমার সকল প্রয়োজন।

দুই

দুমদাম দুমদাম শব্দ:
দশদিক দশদেশ জব্দ।
বটগাছ জমজম জটলা,
আহা তুমি কেন পিছু হটলা।
ফিসফিস ফিসফিস গল্প—
ওধারে কিসের সঙ্কল্প:
ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী ওই যে
দুজনায় কত কথা কইছে!

ও ব্যাঙ্গমা নিশুত রাতে
যাচ্ছে কারা শূন্য হাতে,
ভয় মানে না অন্ধকারে
কোন্ বনে বা কোন্ পাহাড়ে
পথ হারাবে সুনিশ্চিত,
ডাইনী রাতের পাষাণ রীত
কেমন করে সইবে!
ও ব্যাঙ্গমা, ওদের ডেকে কইবে?
কী কইবো, কও দিকিনি,
এমন বোকাও দেখিনি!
পুবমুখো ওই জংলাটায়
তিন গণ্ডুষ বালি
ফেলতে হবে খালি,
অমনি মিলবে পথের দিশে,
রামধনু কাঁচ মিলবে কিসে

সেটাও হবে জানা—
এইটুকু নেই বুদ্ধি যাদের
ঠিক তারা তালকানা!

ঘুটঘুটে রাত্তির, কন্দরে তারা।
ঝোপে ঝোপে ঢাকা আছে পথের চেহারা।
ওদিকে ও কারা আসে কাতারে কাতারে—
জোনাকির লণ্ঠন নিয়ে সারে সারে!
চুপ, চুপ, ওই দেখ, কোন্‌দিকে যায়,
চুপ করে ধরে থাকো জোরসে আমায়!
পুবমুখো জংলাটা ওই গেল দেখা—
চুপ, চুপ, এইবার যত কিছু ঠ্যাকা!

ও কারা বিষণখুড়ো, এদিকেই আসে—
জোনাকির কুপিগুলো দুলিয়ে বাতাসে?
জংলা তো এসে গেল, বালি?
খোঁজ খোঁজ আথালি পাথালি!
শিগগিরি শিগগিরি ওই...
এসে গেল সমস্ত আলোই...

কে রে তোরা? বিষণখুড়ো চেঁচিয়ে উঠলো ভীষণ।
জানিস তো এই আমার নামই বিষণ!

আমরা হলাম ডাইনী রানীর সাতশো অনুচর।
সাতশো কোথায়? সাতশো সাতাত্তর ঃ
বললো পাশের জন।

যাই হও সে, বললো খুড়ো, আমার প্রয়োজন
মেটাও দিকি খালি—
তিন গণ্ডূষ বালি?
না পারো তো, এই দেখছ দাড়ি—
এক একজনকে সাতশো করে বাড়ি।

তাই নাকি গো? ইস!
ওরে তোরা রানীমাকে একটু খবর দিস,
দেখবে বুড়ো শাস্তি কারে কয়!

খুড়ো বললো, আচ্ছা দাঁড়াও, ঘুচোচ্ছি সংশয়।
জানো না তো, এ হল সেই পাতালরাজার দাড়ি,
জানবে যখন এক এক করে যাবে যমের বাড়ি!

ও কারা বিষণখুড়ো...

পিছন থেকে এগিয়ে তাড়াতাড়ি
হঠাৎ একজন বললো হেসে, পেন্নাম হই খুড়ো।
ওদের কথায় কান দিও না, এনেছি এই তোমার বালির গুঁড়ো।
(যা না তোরা সরে!)
আচ্ছা খুড়ো, বলেন টিপ করে,—
নামটি শুধু মনে রেখো—বঙ্কু আমি, বাংলাদেশে বাড়ি
ছিল একসময়,
ডাকলে পরেই হাজির হব যে-কোন ঠাঁই, যখন মনে হয়।

তিন

সংক্ষেপেতেই সেরে রাখি কিছুটা এর পরে।
রামধনু কাঁচ পেয়ে ওরা কেমন করে কমল সরোবরে
পোঁছেছিল, কেমন করে একটি পদ্ম তুলতে—
লক্ষ রক্ষ জেগে উঠে দৌড়েছিল অস্ত্র খুলতে খুলতে,
কী করেই বা শেষে
সিজল ঋষির পায়ের তলায় এসে
সাতরাত্তির বসে বসে মন্ত্র পড়ে শিখলো প্রাণবাঁচানো ঃ
সে-সব কথা তোমরাও তো জানো!
জিরুল দেশের পথ দেখালো অজানা একটা লোক।
বকুলবনের পিটুল পাখির পালক,
আকালমাঠের বাদ্যবুড়ীর কড়ি খেলার ঘুঁটি,
পথ চলবার সব আয়োজন জোগাড় করা হল মোটামুটি।
বাকী রইল টুল-ভোমরার কালো হুল দু'খানা,
এটুক হলেই পরীর দেশের দোরটি যাবে জানা!

সঙ্গে ছিল বিষণখুড়ো
মিললো সেটাও শেষে—
অনেক চেষ্টা অনেক কায়ক্লেশে।
বিনু শুধুই দুঃখু কি আনন্দে
কাটাচ্ছিল সকাল থেকে সন্ধে।
পথে তার আর কী বা করার ছিল?
আস্তে ধীরে চলছিল চলছিল।
বিষণখুড়ো একাই
বহুত তফাৎ পাঠাচ্ছিল
আসছিল যে ঠ্যাকাই!
একেবারে শেষটায়
বিপদ ভীষণ ঘনিয়ে এল মায়াবী সব বাটুল বাঘের চেষ্টায়।
ওরা ছিল মায়ারাজার চেলা,
আঁধার রাতের নিকষকালি গোলার মত ছুঁড়লো দুটি বেলা।
সে কী ভীষণ মিশকালি যে, আকাশ-মাটি
লুকিয়ে পড়লো ভয়ে!
শুধু ওদের চোখগুলো সব ধকধকিয়ে উঠলো জ্বলে জ্বলে!
নেহাৎ সময়মতো
সেই যে বঙ্কু, সে যদি না হঠাৎ হাজির হত,...
মন্ত্র কিছুই বিষণখুড়োর পড়ছিল না মনে,...
বঙ্কু এসে হাজির হল হঠাৎ শুভক্ষণে।
বিড়বিড়িয়ে বললো কী যে, হাত উঁচাতেই
ফিনিক দেওয়া আলো
চাঁদের দেশের থেকে নেমে আহা মাঠের দশদিকে ছড়ালো॥
আরও খানিক এগিয়ে দিয়ে বঙ্কু শেষে
বিনুর গায়ে হাত বুলিয়ে, আলতো হেসে
বললো, তবে পেন্নাম হই খুড়ো,
আর একটু পথ এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবে
চিক পাহাড়ের চূড়ো,
তার ওপারেই পরীর দেশের সীমা!

সেদিন বোধহয় জ্যোচ্ছনা পূর্ণিমা।
আকাশভরা মোমবাতি কে জ্বালিয়ে গেছে। ওইগুলোকেই তারা
ভাবতো নাকি! এখন বিনু হেসেই হল সারা।
মাঝখানটা আলোয় আলো। হীরেমুক্তোর জমকালো ঘেরাটোপ,
চোখ ধাঁধানো রেশমী সাদায় বানানো মণ্ডপ।
মধ্যে কে যে বসে আছেন, এখান থেকে যায় না ভালো দেখা
নিজের আলোয় মুড়ি দিয়ে একেবারে একা—
ওর ভেতরের লোকটি হলেন আর কেউ নন—চাঁদ ঃ
কে যেন তার কানে কানে শোনালো সংবাদ।
ভালো করে দেখল বিনু, ঠিক যেন ফানুসটি—
নিজের মধ্যে আছেন নিজে, অন্য কিছুর জন্যেই নেই হুঁশটি

নীচেও রঙের খেলায়
গাছে গাছে চুণীপান্না ঝিলমিলিয়ে হাসছে অবহেলায়।
কোন্ দিকে যে দেখবে বিনু, কোন্ দিকে যে—
পরীরাই কী এখানে সব পাখি সেজে
ডাকছে, কাকে ডাকছে!
কী যে ভালো লাগছে বিনুর, কী যে ভালো লাগছে!
সামনে বিরাট পাঁচিল, মধ্যে সিংদরোজা,
ওইটি খুলে গেলেই বিনু ঢুকবে সোজা,
তারপরে...তারপরে...
মা থাকলে কী ভালোই হত, কেন যে মন হঠাৎ কেমন করে!

চার

কে দোর খুলবে খোল! বন্ধ দরোজা।
ইতিউতি চেয়ে শুধু বৃথা হল খোঁজা!
আশমানে সাদা সেই চাঁদের ফানুস,
নীচে হায় নেই নেই একটি মানুষ!
কে দোর খুলবে খোল! ধীরে ধীরে বাতি
টুপ টুপ নিবে গেল। রঙের বেসাতি
চট করে উবে গেল। দূরের শেফালি
মার মুখখানা মনে এনে দিল খালি!
দোর খোল, ওই দেখ রাত যায় কেটে,
রবিমামা চাঁদখানা লুকোন পকেটে।
চারদিকে ফিকফিকে আলো আলো আলো...

এইরে! বিষণখুড়ো কোথায় পালালো?
সে আবার কোনদিকে? কই, কেউ নেই!
এদিকে ওদিকে। আরে! তার সামনেই
কোন দেশ থেকে সেই অচেনা পাখিটি
তারই নামে রেখে গেছে একখানা চিঠি।
তারই নামে? কে আবার এই ভিনদেশে
চিঠি লিখে খোঁজ নিতে এল অবশেষে!

বিনু গেল চিঠির কাগজ তুলে নিতে...

কী লেখা চিঠিতে

স্নেহের বিনু,
শুনতে পেলাম অনেক কষ্ট করে
হাজির তুমি হয়েছে আজ পরীর দেশের দোরে।
রাগ হচ্ছে তোমার ওপর, একটুখানি লিখে
দিতে পারতে বাড়ির কোণের বাদামগাছের শালিকপাখিটিকে।
আরে বোকা, সেই পাখি যে এই দেশেরই পরী!
তোমার খবর পাবার জন্যে মাঝে মাঝেই একলা দেশান্তরী
হয় ওদিকে। আর
বিষণকে তো চিনেছিলে? সে যে মাঠের অশ্বত্থগাছটার

সামনে বিরাট পাঁচিল...

রুমি কাঠবেরালী!
ওরই ঠাকুরদাদা ছিল একসময়ে পরীর দেশের মালী।
কী এক অপরাধে ওদের মাটির দেশে হল যে নির্বাসন,
সেদিন থেকেই পরীর দেশে ঢোকা ওদের বারণ।
আমায় দেখেই, দেখেছ তো, অমনি কোথায়
পালিয়ে গেছে রুমি?

যা হোক, যেন ভয় পেয়ো না তুমি:

দুঃখু লাগে, আহা, যখন ভাবি,
কতদূরের থেকে এলে, পরীর দেশের সিংদরোজার চাবি
তোমায় দিতে পারলাম না। হায়রে,
মনটা আমার ব্যথায় ভরে যায়রে!
কী করবো আর, আসল কথাই কই:

এদিকে যে ভীষণ কাণ্ড! পরীরানীর বকুলতলার সই
সাতশো প্রজাপতির পিঠে রামধনু কাচ পাঠিয়েছিল ভেট।
পরীরানীর মাথাখানা একেবারেই হেঁট!
রামলা বনের পাতাবাহার,
রঙনপুরের রঙমহলার
নতুন রানীর সাতনলী হার;
জুটলো না কিচ্ছুই!
আহা লজ্জায় রানী আমাদের ধুলোমাটির ভুঁই
শয্যা করে শুয়ে আছেন। চারদিক সব বন্ধ,
অন্য দেশের লোকের সঙ্গে নেই কোন সম্বন্ধ।
রানীর হুকুম না হলে কী করে,
তুমিই বলো......

......এতক্ষণে বিনুর আবার চোখ পড়লো দোরে।
দোর বন্ধ। কমলপরীর চিঠির আখর ক্রমে
ঝাপসা হয়ে এল যেন চোখের কোণে একফোঁটা জল জমে।
হায়রে যদি জানতো আগেই পষ্ট,
বৃথাই এত ছুটোছুটি, মিথ্যে এতদিনের এমন কষ্ট,
কখখনও বের হত না একলাটি।
মার কথা তার মনে পড়লো খাঁটি,—
না বলে না কয়ে আসার ফলে
মিললো এমন কঠিন শাস্তি—হাপুস চোখের জলে!
কিন্তু বিষণখুড়ো, সেই বা কেমন!
একলা তাকে ফেলেই কোথায় লুকিয়ে পড়লো এমন?

একলা তাকে ফেলেই?

একলা তাকে ফেলেই......?

তাইতো চারিদিকেই
জনমানিষ্যি নেই—
ধ্‌ ধ্‌ করছে ফাঁকা
তাকাও যেদিক পানেই।
যায় না কোনখানেই
চেঁচিয়ে কাকেও ডাকা।
মাঠের ওপর
রোদের টোপর
কেউ নেই কোথাও,
আলো দুলিয়ে
আকাশ দিয়ে
যে ছোটে, ডাক দাও।
আকাশ পানে তাকিও—
মিলবে না আর পাখিও।
যে আসছিল—সেও উধাও—
পেছন পেছন যতই ধাও!

চোখ ফেটে জল আসে, হায়
চোখ ফেটে জল আসে.
আকাশনীলের রোদ ছাড়া আর
কেউ না বিনুর পাশে!

একলা বিনু কাঁদছে ওই.
তা-ই কে দেখে—হাঁসটা বৈ
ওমা একটা হাঁস!
প্যাঁকপেঁকিয়ে বললে, বিনু
এবার একটু হাস!
এবার না হয় বন্ধ দোর,
পরের বারে খুলবে।
এই. হাঁসই শোন্ তখন তোকে
হেথায় এনে তুলবে!
এখন বরং ঘরে চল,
ফেলিসনে আর চোখের জল,
আমার পিঠে ওঠ!
পরের বারে আনিয়ে দেব
পরীর দেশের আনকোরা পাশপোর্ট!

উড়তে ভালোই লাগলো বিনুর মেঘের মধ্যে দিয়ে।
আরও পাখিরা পাখা ঝটপটিয়ে
ওদের পাশে পাশেই চললো উড়ে।
কত সাগর পার হয়ে আর কত আকাশ ফুঁড়ে,
দিনের পরে দিন
অবিশ্রান্ত চললো ওরা বিরাম-বাধাহীন!

ঝটপট ঝটপট পাখা
বিনুকে চলেছে নিয়ে একরাশ আকাশ-বলাকা।
শরীর এলিয়ে আসে, ঘুমে চোখ ঢোলে;
হেসে হেসে ছোঁয় তাকে মেঘেরা সকলে।
কতদূরে? আরও কতদূর?
দিন যায়, রাত যায়, আবারও ঝিমোয় রোদ্দুর!
কী আঁধার কী আঁধার—চোখ যেন এলায় আবেশে—
স্বপনে দেখায় ঠিক সে যেন এসেছে ফিরে দেশে—
সেই বিছানার পাশে তেমনি বালিশ

নিজেরা আপনমনে করে ফিসফিস—

আহা স্বপন কত মধুর
এসেছে ফিরে যা ছিল দূর
এক মিনিটেই পুরোনো সুর

কতদূরে থেকে যেন মার গলা ওই
শোনা যায় আগের মতই।
রান্নাঘরে কাপ ডিস টুঙ্ টাঙ্; ভোরের দুধের
গন্ধ যেন ভেসে আসে ফের।
ক্ষেন্তি ঝি বাসন মাজে, তারও গলাখানা
থাকে না অজানা।

আহা স্বপন কত মধুর
এসেছে ফিরে যা ছিল দূর।

আরে, সামনে এই তো সাদা দেয়াল!
বিনুর হল খেয়াল।
তাই তো, কখন পৌঁছেছে সে নিজের ঘরে এসে!
নিজের মনেই উঠলো বিনু হেসে।
সেই হাঁসটার নাম কী যেন? উচিৎ ছিল জানা,
অন্তত ঠিকানা।
উঠে দাঁড়াতেই ভোরবেলাকার রোদ
ঠাট্টাহাসি হেসেই নিল সকল ভুলের শোধ!

পাঁচ

গল্প কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। পরেরটুকু
আমায় পরে শুনিয়েছিল পাশের বাড়ির খুকু:

জানো, কিচ্ছুই বলেনি ও মা-কে।
দুপুরবেলা গিয়েছিল অশত্থগাছের কাঠবেরালীটাকে
ধরে আনবে বলে,
রোজ তাকে আমরাও তো দেখি, সেদিন যেন কিসের ডামাডোলে
দেখা গেল, সেটাও যেন কোথায় গেছে চলে!
ফিরে এসে ছলছলিয়ে চোখ
হঠাৎ কেঁদে ফেললো বিনু ঝরঝরিয়ে। সেদিনের সেই শোক
আজও, জানো, ভুলতে পারেনি ও।
সত্যি, দেখে নিও,

ও একদিন একা একাই বেরিয়ে পড়বে পরীর দেশের দিকে।
দেখি তো রোজ সকাল হলেই
ফিসফিসিয়ে কী সব বলে
বাদামগাছের শালিকপাখিটিকে।

উড়তে ভালোই লাগলো বিনুর...

সপ্তদুর্গা অর্থাৎ সাতটি দুর্গ—তারই কাহিনী। ইতিহাসের কাহিনী শুনতে অনেক সময় ভাল না লাগলেও শোনা দরকার। কারণ বাংলার এখন এই দুঃখকষ্টের সময়, প্রাচীনকালের সুখ-সম্পদের কথা, ধন-ঐশ্বর্যের কথা শুনতে ভাল লাগবে এবং বাংলার বীর পুরুষদের বীরত্বের কাহিনী এখনকার বাঙালীর মনে গৌরব জাগাবে। তাই আজ শোনাচ্ছি প্রাচীনকালের এক কাহিনী, সংক্ষেপ করে। কিন্তু যে-জায়গার কথা বলা হচ্ছে, সে-জায়গার চিহ্ন পর্যন্ত নেই এখন। সব একেবারে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তার শুধু স্মৃতিটুকুই আছে।

বাংলাদেশ মুসলমানদের অধিকারে আসবার পর প্রায় দেড়শ' বছর ধরে দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল। পরে সম্রাট মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে বাংলাদেশ হয়ে যায় স্বাধীন। এই স্বাধীন হওয়ায় কাজে গৌড়ের নবাব সমসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ছিলেন প্রথম পথ প্রদর্শক। তখন সমস্ত বাংলা ও বিহারে চৌত্রিশ হাজারের বেশী মুসলমান ছিল না। নবাব সমসুদ্দীন বুঝলেন, এই অল্প সংখ্যক মুসলমান নিয়ে দিল্লীর সম্রাটের বিপক্ষে যাওয়া চলবে না। এজন্য তিনি হিন্দু-সেনা সংগ্রহ করতে মনস্থ করলেন। তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন; হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন দামনাশের সান্যাল এবং ভাজনীর ভাদুড়ী। তিনি এ'দের ডেকে পাঠালেন। দামনাশ থেকে এলেন শিখিবাহন সান্যাল এবং ভাজনী থেকে এলেন তিন ভাই—সুবুদ্ধিরাম ভাদুড়ী, কেশবরাম ভাদুড়ী ও জগদানন্দ ভাদুড়ী। নবাব এ'দের পরম সম্মানে গ্রহণ করলেন এবং সকলকে নিজের কাজে লাগাবার মতলব করলেন।

জগদানন্দ ভাদুড়ী পারসী ভাষা জানতেন। তাঁকে "রায়" উপাধি দিয়ে করলেন "রায়রাইয়াঁ" অর্থাৎ রাজ্যের দেওয়ান। আর শিখিবাহন সুবুদ্ধিরাম কেশবরামকে দিলেন সেনাপতির পদ। সেনাপতিরা সেনাসংগ্রহের কাজে লাগলেন। অল্পদিনের ভিতর এ'দের চেষ্টায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-সেনা সংগ্রহ হলো। আর রায়রাইয়াঁ অর্থাৎ দেওয়ানজীর চেষ্টায় নবাবের রাজভাণ্ডারে বহু অর্থ ও বহু রসদ সঞ্চিত হলো। নবাব সমসুদ্দীন এখন মহাখুশী। আটঘাট বেঁধে তিনি "শাহ" অর্থাৎ স্বাধীন রাজা এই উপাধি গ্রহণ করলেন। তিনি হলেন বাংলা ও বিহারের স্বাধীন সম্রাট অর্থাৎ "গৌড় বাদশাহ"। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ তোগলক এবং তারপরে ফিরোজ তোগলক বাংলা-বিহারের সমসুদ্দীনকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে না পেরে তাঁর স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন।

সান্যাল এবং ভাদুড়ীরাই নবাবের উন্নতির ছিলেন প্রধান সহায়। এজন্য নবাব এ'দের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দুটি জায়গীর দিলেন। তখন বরেন্দ্রভূমিতে চলনবিল নামে এক অতি বিস্তীর্ণ হ্রদ ছিল। এই হ্রদের দক্ষিণদিকে শিখিবাহন সান্যালকে জায়গীর দেওয়া হলো, আর হ্রদের উত্তর দিকে জায়গীর পেলেন ভাদুড়ীরা তিন ভাই। জায়গীর পেয়ে এ'রা মহা প্রভাবশালী হলেন। এই চলনবিলটাও এলো এই দুই জায়গীর-দারের অধিকারের মধ্যে। ভাদুড়ীদের কথায় অনেক কথা আসবে, তাই এ'দের কথাই শোনাই।

সান্যাল এবং ভাদুড়ীরা নবাবের কাছে "খাঁ" উপাধি পেলেন। "খাঁ" খুব সম্মান-জনক উপাধি। ভাদুড়ীদের সুবুদ্ধি খাঁ জায়গীর পেয়ে তো রাজা হয়েই বসলেন। রাজার মতোই তিনি রাজ্য শাসন করতেন, রাজত্ব করতেন। তিনি নিজের রাজ্যে মুদ্রাও তৈরি করতে লাগলেন। নামে মাত্র তিনি গৌড়ের অধীন, আসলে স্বাধীন-ভাবেই চলতে লাগলেন। গৌড়-বাদশাকে তিনি বছরে কেবলমাত্র একটি করে টাকা নজর দিতেন। এই থেকে এ'দের নাম হলো 'একটাকিয়া রাজা'। আর এ'দের ছেলেদের নাম হলো একটাকিয়া ভাদুড়ী। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত করে বলতেন "ভাদুড়ী চক্র"।

চলনবিলের উল্লেখ করেছি। এই চলন-বিলটির অপার মহিমা। বিস্তর নদ-নদী শাখানদী এই হ্রদে এসে পড়েছে, আর কয়েকটা নদীও এ থেকে বেরিয়েছে। এত বড় বিরাট ব্যাপার ছিল এই হ্রদটির। এখন এর কিছুই নেই, সব শুকনো। এই হ্রদের অর্থাৎ চলনবিলের মাঝখানে বর্ষাকালে তখন দাঁড়িয়ে দেখলে কুলকিনারা নজরে পড়তো না। গ্রীষ্মকালে অনেক জায়গায় আবার জল যেতো শুকিয়ে। প্রতি বছর পলি পড়তে পড়তে এই শুকনো জায়গাটা হতো খুব বেশী উর্বরা আর এতে শস্য হতো প্রচুর। নগরে প্রচুর দ্রব্য আমদানী হতো। এই রাজ্যে কারও কোন অভাব বা দুঃখ ছিল না। তখন এক টাকায় আট-দশমন চাল পাওয়া যেতো। অতএব কল্পনা করে দেখ, কী সুখের সময় তখন ছিল।

ভাদুড়ীদের রাজ্য অনেক জায়গায় যেমন হ্রদ দিয়ে ঘেরা ছিল, তেমনি আবার রাজধানীটি সুরক্ষিত ছিল সুদৃঢ় প্রাচীর দিয়ে। তা ছাড়া এখানে দুর্গও ছিল। দুর্গ ছিল দু-একটি নয়, একেবারে সাত-সাতটি। নগরের উত্তর দিকে একটি, পূর্বে একটি, দক্ষিণে দুটি এবং পশ্চিমে ছিল তিনটি। সেই জন্য এই রাজধানীর নাম 'সাতগড়া'। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত করে বলতেন 'সপ্তদুর্গা'।

নগরের মধ্যে হিন্দুও বাস করতো, মুসলমানও থাকতো। হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব ছিল খুব বেশী। এখানে কোন কারণেই হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। যে-সময় হিন্দু-মুসলমানে ও মুসলমানে-মুসলমানে সদাসর্বদা কাটাকাটি মারামারি হতো অন্য জায়গায়, সেই সময় সাতগড়া রাজ্যে মুসলমানেরা একটাকিয়া রাজবংশের চাকরি করতো নির্বিবাদে। মুসলমানেরা কখনো কোন কারণেই একটাকিয়া রাজাদের সঙ্গে বিবাদ করেনি। হিন্দুদের সঙ্গেও বিবাদ করেনি, আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি তো ছিলই না।

সপ্তদুর্গা সম্বন্ধে বহু কাহিনী আছে, বহু গল্প আছে। এই ভাদুড়ী বংশেরই এক রাজা—রাজা গণেশনারায়ণ খাঁ গৌড়ের বাদশাহ হয়ে সমস্ত বাংলাদেশে এককালে রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু সে কাহিনী অনেক পরের ও সে হলো স্বতন্ত্র কাহিনী।

অগ্নি-পরীক্ষা

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর দৈত্যদের রাজা হলেন তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ। দৈত্যদের সঙ্গে দেবতাদের শত্রুতা চিরদিনের। তাই তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। প্রহ্লাদের আমলেও সে-যুদ্ধ থামল না। কিন্তু দেবতারা লড়াই করে দৈত্যদের হারাতে পারলেন না, বরং নিজেদেরই স্বর্গ ছেড়ে পালাতে হ'লো।

সিংহাসন হারিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির কাছে গিয়ে উপদেশ চাইলেন, কীভাবে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করা যায়।

বৃহস্পতি বললেন, "রাজারাজড়ার এ-সব ব্যাপারে কূটবুদ্ধিরই দরকার বেশী। সে-রকম বুদ্ধি আছে শুক্রাচার্যের। তাঁকে ধরতে পারলেই কাজ হবে।"

বৃহস্পতির কথামত ইন্দ্রদেব শুক্রাচার্যের কাছে গেলেন।

ইন্দ্রের কথা শুনে শুক্রাচার্য বললেন, "দৈত্যরা আমার শিষ্য। তাদের ক্ষতি হয় এমন পরামর্শ দেওয়া আমার উচিত নয়। কিন্তু দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়ে দৈত্যরা স্বর্গের রাজ্য অধিকার করে থাকবে, সেটাও আমি পছন্দ করি না। তবে আশার কথা, দৈত্যদের রাজা এখন প্রহ্লাদ। তিনি মহা ধার্মিক। স্বর্গের রাজত্ব পেয়েও তিনি অধর্মের কিছু করবেন না।"

ইন্দ্রদেব মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "তা হলে কি আমাদের রাজ্যহারা হয়েই থাকতে হবে চিরদিন, আচার্যদেব?"

শুক্রাচার্য বললেন, "সমস্যার কথাই বটে। এর মীমাংসার উপায় হতে পারে যদি প্রহ্লাদের আচার-ব্যবহারে, তাঁর চরিত্রে কোনো দোষ ধরিয়ে দেওয়া যায়। তা হলেই স্বর্গরাজ্য থেকে তাঁর পতন ঘটবে, আর তখন দেবতাদেরও রাজ্য উদ্ধার করার সুযোগ হবে। সে-ভার দেবতাদেরই নেওয়া উচিত।"

শুক্রাচার্যের ইঙ্গিত বুঝে দেবরাজ ইন্দ্র নিজেই ব্রাহ্মণের বেশে প্রহ্লাদের সভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

*

রাজসভায় সারাক্ষণ লোকজনের সমারোহ। দানধ্যানও তাঁর যথেষ্ট। তাঁর কাছে কেউ কিছু চাইলে তাকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয় না।

ইন্দ্র ব্রাহ্মণ সেজে গিয়েছেন। আসলে কে তিনি, প্রহ্লাদ চিনতে পারলেন না। তাঁকে দেখে আদর-যত্ন করে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী চান?"

ব্রাহ্মণ বললেন, "মহারাজ, আমার প্রার্থনা অতি সামান্য। অভয় দেন তো বলি। কিন্তু আগেই জানা দরকার, আমাকে নিরাশ হতে হবে না তো?"

প্রহ্লাদ হেসে বললেন, "না না, নিরাশ হবেন কেন? আমি কথা দিচ্ছি, আপনি যা চাইবেন তা-ই পাবেন।"

ব্রাহ্মণ বললেন, "এক সময়ে আমার ধনসম্পদের অভাব ছিল না। এখন কিছুই তার নেই। তা ফিরে পাওয়ার জন্য আমার যা দরকার তা আপনি ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না।"

প্রহ্লাদ ভাবলেন, ব্রাহ্মণ বুঝি ধনরত্ন চান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ধনসম্পদ খুইয়েছেন বললেন, সেই রকম ধনসম্পদ পেলেই কি খুশী হন?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করলেন, "না।"

"তবে কি আপনি বিত্তসম্পত্তি চান?"

এবারও ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন, "না।"

"তবে কী চান আপনি?" প্রহ্লাদ একে একে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—তাঁর গৃহের অভাব, না বস্ত্রের অভাব, না গোধনের অভাব?

ব্রাহ্মণ প্রত্যেকবারেই জবাব দিলেন, "ওসব তুচ্ছ জিনিসের উপর আমার লোভ নেই।"

তা হ'লে কী চান তিনি? ব্রাহ্মণ তখন স্পষ্ট ক'রেই বললেন, "আমি চাই আপনার চরিত্রটি—যে-চরিত্রের গুণে আপনি স্বর্গের রাজা। আপনি কথা দিয়েছেন, আমি যাচ্ঞা করে নিরাশ হব না। সেই কথা রক্ষা করুন, মহারাজ,—আপনার চরিত্রটি আমাকে দান করুন।"

একি অদ্ভুত বাঞ্ছা! কারও চরিত্র কি দান করার জিনিস! প্রহ্লাদ বললেন, "এ যে অসম্ভব কথা বলছেন আপনি! লোকের চরিত্র তো মণিমাণিক্যের মত সিন্দুকে রাখা চলে না যে, হাতে ধরে দেওয়া যায়! আমি কথা দিয়েছি সত্য—আপনি নিরাশ হবেন না, কিন্তু আপনার আদেশ রক্ষা করতে পারি এমন শক্তি তো আমার নেই।"

ব্রাহ্মণ বললেন, "আমার প্রার্থনা আমি জানালাম। আপনার কথা রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার নিজের।"

ব্রাহ্মণের এ দাবী কিসে মিটতে পারে, ঠিক করতে না পেরে প্রহ্লাদ মাথা হেঁট করে রইলেন।

ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র রাগের ভান করে বললেন, "কথা দিয়ে আপনি কথা রাখতে পারলেন না। আপনার ধর্ম রইলো কোথায়? আপনি তো পাপী।"—এই বলেই তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। রাগে গর গর

রাগে গরগর করতে করতে রাজসভা হতে চলে গেলেন

করতে করতে রাজসভা থেকে চ'লে গেলেন

•

ইন্দ্রদেবের কৌশলে প্রহ্লাদের চরিত্রে পাপের ছায়া পড়ল। তাঁর দুঃখও হতে লাগল—এই পাপেই হয়তো তাঁর সর্বস্ব খোয়াতে হবে!

প্রহ্লাদ যে-ভয় করছিলেন, একে একে ঘটতেও লাগল তাই।

তিনি দেখলেন—তাঁর শরীর থেকে একটা আলো বেরিয়ে এলো, আর তা জ্যোতির মূর্তি ধরে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি চললুম।"

প্রহ্লাদ জিজ্ঞেস করলেন, "কে আপনি?"

উত্তর হ'লো, "আমি ধর্ম। চরিত্রের সঙ্গে আমি থাকি। তোমার মনে পাপের ভয় ঢুকেছে, তোমার চরিত্র আর তোমার নেই; আমারও তাই তার সঙ্গে তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে।" এই বলে জ্যোতির মূর্তি মিলিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রহ্লাদও যেন মনমরা হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রহ্লাদের শরীর থেকে আর-একটা আলো বার হলো। সে-আলোও জ্যোতির মূর্তি ধরে তাঁর সামনে এসে বললেন, "আমি চললুম।"

প্রহ্লাদ জিজ্ঞেস করলেন, "কে আপনি?"

উত্তর শোনা গেল, "আমি সত্য। ধর্ম যেখানে থাকে, আমিও সেখানে থাকি। ধর্ম তোমাকে ছেড়ে গিয়েছে, আমাকেও তার সঙ্গে যেতে হচ্ছে।"

জ্যোতির মূর্তি মিলিয়ে যেতেই প্রহ্লাদ যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন।

এরপর তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এলো জ্যোতির ভীষণ এক মূর্তি। তিনি বললেন, "আমি শক্তি। সত্যের সঙ্গী আমি। সত্য তোমাকে ছেড়ে গিয়েছে, আমিও চললুম।"

শক্তি চলে যেতেই প্রহ্লাদ হয়ে পড়লেন যেন অবশ—অবসন্ন। উদাস দৃষ্টিতে তিনি শুধু তাকাতে লাগলেন।

দেখতে না-দেখতে তাঁর চোখের সামনে প্রকাশ পেলেন এক জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তি। প্রহ্লাদ শুনতে পেলেন সেই মূর্তির স্বর, "আমি মহালক্ষ্মী। শক্তি ছাড়া আমি থাকতে পারি না। তোমার সে-শক্তি আর কই? আমিও তাই তোমাকে ছেড়ে চললুম।"

মহালক্ষ্মীর সেই মূর্তি আকাশের পথে স্বর্গের দিকে চললেন। ইন্দ্রদেব সেই পথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তাঁকে বরণ করে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রহ্লাদেরও হারাতে হলো স্বর্গের সিংহাসন।

বক-বকমনি

॥ নরেন্দ্র দেব ॥

রাজকুমারীর শখের পাখি
সোনার খাঁচায় একলা থাকে।
ভোরের আলোয় সকাল বেলা
আকুল হয়ে সঙ্গী ডাকে।

ছোট্ট একটি বনের পাখি
আসতো উড়ে খাঁচার ধারে
খোঁচায় ঢোকার পথ না পেয়ে
ফিরতো আবার আকাশ পারে।

খাঁচার পাখির মনটি তাতে
উঠতো রোজই দুঃখে ভ'রে;
রানীর যত্ন আদর পেয়েও
পড়তো চোখে অশ্রু ঝরে।

বনের পাখি শুধায় তারে,
কিসের তরে দুঃখী তুমি?
খাঁচার পাখি বলতো কেঁদে—
চাই ফিরে বন, আকাশ, ভূমি!

মেলিয়ে আমার চপল ডানা
উড়বো উদার হাওয়ার বুকে,
তবেই যাবে দুঃখ আমার
থাকবো আমি মনের সুখে।

ঝড় আছে ভাই, বৃষ্টি আছেই,
শীতের রাতে কাঁপতে হয়,
বাজপাখিতে কখন ধরে
উদ্‌বিড়ালের ভীষণ ভয়!

সদাই রবে সশংকিত
করবে গুলী কোন শিকারী,
পড়বে কবে ব্যাধের ফাঁদে
পদে পদেই বিপদ ভারী।

বনের মধ্যে জুটবে কি না
খাদ্য কিছু নেই ঠিকানা,
এখন দেখ রাজার দাসী
যোগায় তোমার খানাপিনা!

ঝড় বাদলে রোদের তাতে
নে-যায় খাঁচা রানীর ঘরে,
শীতের রাতে দেয় ঘেরাটোপ;
জঙ্গলে কেউ যত্ন করে?

আমায় যদি সোনার খাঁচায়
তোমার মতো যত্নে রাখে,
গাছের ডগায় পল্‌কা ডালে
প্রাণ ভয়ে ভাই, কে আর থাকে?

বনের পাখি বললে হেসে,
আকাশ পারে মুক্তি পেলে—
ভাবছো তুমি থাকবে ভালো
সোনার খাঁচার বাইরে এলে?

থাকতে হবে গাছের ডালে
ঘুচবে রাতে ঘুমের আশা
খড়কুটো সব কুড়িয়ে এনে
বাঁধতে হবে নিজের বাসা।

শুনতে পেয়ে তাদের কথা
বাড়িয়ে গলা বললে বক,
যার যেটা নেই, সে চায় সেটা
বনের পাখির ঘরের শখ!

বন্দী জীবন হয় না সুখের
যতই যত্ন আদর ঢালো,
দুঃখ কষ্ট থাক্ তবু তোর—
আকাশ আলোয় মুক্তি ভালো।

পরের সোনা দিসনে কানে

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

কাক আর কাক-বৌ।

এখানে-ওখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। মনের মত একটি জায়গা খুঁজে পায় না—যেখানে ওরা একটি বাসা বেঁধে বাস করবে।

কাক একটু নিরিবিলি পছন্দ করে। সে বললে,—চলো, মানুষের বসতি ছেড়ে একটু বনের ধারে গিয়ে থাকি—কেউ বিরক্ত করতে আসবে না।

উঁচু ডালে বাঁধবো বাসা—
থাকবো মনের সুখে—
কারো কোনো ধারবো না ধার
শান্তি রবে বুকে॥

কাক-বৌয়ের কিন্তু তা পছন্দ নয়। সে একটু লোভী কিনা,—তাই বড়লোকের বাড়ির আশে-পাশে থাকতে চায়।

প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি—চারদিকের বাগানে

"ওখানে একটা বড় গাছে বাসা বাঁধি।"

ছোট-বড় নানা জাতের গাছ—সেইটে দেখিয়ে বললে,—চলো আমরা ওখানের একটি বড় গাছে বাসা বাঁধি। ও-বাড়িতে একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। সে রোজ সকালে উঠে পিয়ানো বাজায়। ভারী মিষ্টি শব্দ। আর ওরা রোজ যা খাবার ফেলে দেবে তাই খেয়ে আমাদের দুটি প্রাণীর দিব্যি চলে যাবে। কে আর মিছিমিছি বন্দুরে-বন্দুরে ঘুরে বেড়ায় বলো? একটু আরাম ত' চাই।

কাক জবাব দেয়,—তোর বড় আলস্যি কাক-বৌ। আমাদের এত লোভ ভালো নয়। মানুষদের বসতি থেকে দূরে থাকলে ঝামেলা কম। এখানে-ওখানে উড়ে কি আর রোজকার খাবার জোগাড় করা যেত না? কথায় বলে, লোভে পাপ, আর পাপে মৃত্যু!

কাক-বৌ কিন্তু ওর কথা কানে তোলে না! বলে,—ওরে কাক, তুই বুঝিস নে! বড় গাছে নাও বাঁধতে হয়। বড়লোকের বাড়িতে বাসা বাঁধলে কোনোদিন খাবারের অভাব হয় না!

ঠোঁট নেড়ে কাক বলে,—তোর যেমন ইচ্ছে! কিন্তু আমি বলে রাখছি—

বড়র পিরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে-দড়ি—ক্ষণেকে চাঁদ॥

যাই হোক শেষ পর্যন্ত কাক-বৌয়ের কথাই থাকলো। সেই বড়লোকের বাড়ির সামনে একটি প্রকাণ্ড দেবদারু গাছের ডালে ওরা সুন্দর একটি বাসা তৈরি করে ফেলল। বড়লোকের মেয়েটি রোজ রোজ মাথা থেকে চুলের কাঁটা ফেলে দিয়ে নতুন কাঁটা ব্যবহার করে। কাক আর কাক-বৌ সেই চুলের কাঁটা কুড়িয়ে এনে সুন্দর একটি বাসা তৈরি করে নিলে।

বাসা দেখে কাক-বৌ ভারী খুশী। বললে,—দেখলি কাক, ভাগ্যিস বড়লোকের আওতায় আছি। তাই ত রোজ চুলের কাঁটা পাওয়া গেল! আর সেইজন্যেই এমন সুন্দর বাসা আমাদের হল! এ বাসা আমাদের কোনোদিন ভাঙবে না, আর ঝড়ে উড়ে যাবে না!

কাক ফোঁড়ন কাটলে,—কী যে বলিস তুই! পাখির বাসা হাওয়ায় নড়ে! আজ আছে, কাল নেই! সেই বাসা নিয়ে গর্ব করিস তুই? বনের ধারে থাকলে আমরা সত্যি মনের সুখে থাকতুম! কেউ আমাদের জ্বালাতন করত না।

কাক-বৌ ফোঁস করে উঠে বলল,—তোর যেমন বুদ্ধি! তোকে এত করে বুঝিয়ে বলি, কথা তুই কানে তুলিস না! এই যে রোজ বড়লোকের মেয়ের পিয়োনোর সঙ্গে মিষ্টি গান শুনছি,—এই শুনতে শুনতে আমাদেরও গান গাইবার ইচ্ছে মনে জাগবে। আর পিয়োনোর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমাদেরও কণ্ঠ মিষ্টি হবে। আমরা গান গাইতে পারি না বলে, কোকিলরা আমাদের কত ঠাট্টা করে! অথচ মজা দেখ, ওদের ডিম ফোটাবার জন্যে কাকের বাসায় চুপি চুপি রেখে দিয়ে যায়! ঘেন্নায় মরি!

একটু দম নিয়ে কাক-বৌ আবার বলে,—এইবার আমি ঠিক করেছি, যে করেই হোক, গানের গলা আমার মিষ্টি করতেই হবে! রোজ পিয়োনোর সঙ্গে গান গাইলে গলা ভালো না হয়ে যায়! তুইও আমার সঙ্গে গাইবি রোজ, বুঝলি?

কাক-বৌয়ের কথা শুনে কাক বেচারী হি হি করে হাসতে লাগলো। বলল,—তোর যেমন কথা কাক-বৌ! কাকের গলায় কখনো গান জাগে? বিধাতা যে আমাদের মেরে রেখেছে! আমাদের যা আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা ভালো।

টিপ্পনী কেটে কাক-বৌ বললে,—তোর ও-সব হতাশার কথা আমি ভালো বুঝিনে! বনের ধারে থাকলে গানের গলাও ভালো হবে না, আর বড়লোকের বাড়ির ভালো-মন্দ খাবারও খাওয়া যাবে না! এখানে আছি—বেশ আছি।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কাক উত্তর দিলে,—থাকতে চাচ্ছিস এখানে, থাক। আমি বাধা দেবো না। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখিস—আমাদের দেশের প্রবীণ মাতব্বরেরা বলে—

"পরের সোনা দিসনে কানে—
কেড়ে নেবে হ্যাঁচকা টানে॥"

আর দু'দিন পরে তোর বাচ্চা হবে। কখন, কোন্‌দিক থেকে কী বিপদ আসে কেউ বলতে পারে? বড়লোকের বাড়ির আওতা ছেড়ে—বনের ধারে গিয়ে থাকলে, প্রাণে ভয় নিয়ে বসবাস করতে হত না!

কাক-বৌ ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল,—কোনো ভয় নেই তোর। এত উঁচু গাছের ডালে আবার বিপদ কিসের? এক ঝড়ের

বাসা ভেঙে নীচে ফেলে দিল

ভয়! সে ভয় ত বনের ধারেও আছে।

কাক আর কাক-বৌ তখন সেই উঁচু গাছের ডালেই মনের আনন্দে বাসা বেঁধে বাস করতে লাগলো।

কয়েকদিন বাদেই ডিম ফুটে কাক-বৌয়ের বাচ্চা বেরুলে। কাক-বৌয়ের আনন্দ দেখে কে! ওরা খুব ছেলেবেলা থেকেই পিয়োনোর গান শুনতে পাবে, কোকিলের মতো ওদের মিষ্টি গলা হবে,—এই আনন্দেই সে একেবারে আত্মহারা!

আরো কিছুদিন যায়—কোনো অসুবিধে নেই এখানে। বড়লোকের মেয়ে যে-সব খাবার জানলা দিয়ে ছড়িয়ে ফেলে দেয়, তাই খেয়েই ওরা মনের আনন্দে আছে। কাক-বৌ বলে,—দেখলি মজা! আমি আগেই বলেছিলাম না? বড় গাছে নৌকো বাঁধতে হয়। তা হলে আর ঝড়-বাদলে কোনো বিপদের ভয় থাকে না!

কাক কোনো উত্তর করে না, শুধু মাথা নাড়ে!

এর কিছুদিন বাদে সেই বড়লোকের বাড়িতে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়!

দলে দলে লোকজন খাটছে, মালীরা বাগানের আগাছা সাফ করছে, মিস্ত্রীরা নতুন করে অট্টালিকায় রঙ লাগাচ্ছে। মুদি, স্যাকরা, গয়লা, বাসনওয়ালা, কাপড়ওয়ালা এদের আনাগোনা বেড়ে যেতে লাগলো।

কাক শঙ্কিত হয়ে বলল,—বাড়িতে কী যেন কাণ্ড হবে, আমরা এখান থেকে পালাই চল—

কাক-বৌ হেসে উত্তর দিলে,—তোর যেমন বুদ্ধি! আমাদের পালাবার কী হয়েছে! আমি খোঁজ নিয়েছি। বড়লোকের সেই সুন্দরী মেয়েটার বিয়ে হবে। চারদিকে সব লাল রঙের চিঠি পাঠানো হচ্ছে, দেখিসনি? আরো ত মজাই হল! মিঠাই-মণ্ডা, মাছ, মাংস প্রচুর খাওয়া যাবে। তুই চুপ করে বসে দেখ্ না কাণ্ডটা!

কাক আর প্রতিবাদ করে না, শুধু আপন মনে মাথা নেড়ে বলে, ক-ও-য়া—কা—কা—!

আস্তে আস্তে বড়লোকের বাড়ি নতুন রঙে সেজে ঝলমল করে ওঠে। রেলিংগুলো নতুন রূপ পায়। বাড়ির সামনে আকাশ ছোঁয়া তোরণ আর নহবৎ বসে।

লোকজনের আনাগোনা আরো বেড়ে যায়। নানা যায়গা থেকে আত্মীয়-স্বজন এসে সেই বিশাল অট্টালিকা ভর্তি করে ফেলে। ছেলে-মেয়েদের কত রকমের সাজ পোশাক। থরে থরে সব বাসন কোসন আসে। কত রকমের গয়না-গাঁটি পরে মেয়েরা বাগানে ঘুরে বেড়ায়। উদ্যানের ভাঙা-চোরা ফোয়ারাগুলি নতুন করে সারিয়ে তোলা হয়।

কাক বলে,—এখনো ভেবে দেখ্ কাক-বৌ।

কাক-বৌ জবাব দেয়,—তোর যেমন কথা! এত তুই ভীতু কেন আমায় বলতে পারিস? একটু থেমে সে আবার বলে,—তার চাইতে চল, আমাদের আত্মীয়-স্বজন যে-খানে আছে—সবাইকে নেমন্তন্ন করে আসি। আমরা এখানে কী সুখে আছি—সবাইকে দেখাতে হবে ত! জ্ঞাতি-কুটুম্বরা আমাদের বড়লোকি দেখলে হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরবে!

কাকের খুব ইচ্ছে ছিল না। তবু কাক-বৌয়ের তাগিদে কাককেও ওর সংগে বেরুতে হল—আত্মীয়-স্বজনদের নেমন্তন্ন করতে।

এদিকে বড়লোকের বাড়ির ম্যানেজারের হুকুমে একদল ইলেকট্রিক মিস্ত্রি উঠে পড়ল বাগানের লম্বা লম্বা সব গাছগুলির উপর। বাড়ির একমাত্র মেয়ের বিয়ে। গোটা বাগানটা ছোট ছোট লাল-নীল-সবুজ বেগুনী বালব দিয়ে সাজাতে হবে। প্রত্যেকটি গাছের ডালে-ডালে বিজলীর তার ঝুলিয়ে দিতে লাগল তারা।

যখন সেই সব মিস্ত্রীর দল দেবদারু গাছে উঠল—দেখলে, একটা কাকের বাসা। ছোট্ট ছোট্ট কাকের ছানাগুলি খিদের জ্বালায়—কা—কা করে চাঁচাচ্ছে।

আর একটি মিস্ত্রী থু-থু ফেলে বলল,—কী বিচ্ছিরি কাণ্ড! দে কাকের বাসাটাকে ভেঙে ফেলে!

আর একটি মিস্ত্রি তাকে সায় দিয়ে জবাব দিলে,—ঠিক কথা বলেছিস ভাই! এই রকম নোংরা কাকের বাসা থাকলে ইলেকট্রিকের তার গাছের ডালে জড়াবো কী করে?

ওরা একটা কাঠের টুকরো দিয়ে সেই কাক আর কাক-বৌয়ের বাসা ভেঙে, নীচে ফেলে দিলে! কাকের ক্ষুদে-ক্ষুদে ছানা-গুলি তলায় পড়ে যে চোট পেলে তাতেই মরে গেল!

তারপর মিস্ত্রির দল নিজেদের কাজ শেষ করে লম্বা বাঁশের মই বেয়ে নীচে নেমে গেল!

এর অনেকক্ষণ বাদে কাক আর কাক-বৌ যত রাজ্যের আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে ফিরে এসে দেখে, তাদের বাসা ধুলোয় লুটোচ্ছে, আর তাদের ছানাগুলি মরে পড়ে আছে—এধারে-ওধারে! রাশি রাশি লাল পিঁপড়ে ওদের ছেঁকে ধরেছে!

গুণধর

লেখা ও ছবি—শ্রীশৈল চক্রবর্তী

গুণধর গোরুর কথা জানো কি?
জান না। তবে বলি শোনো—
তার চারটি পা, মাথায় দুই শিং
কানও দুটি কিন্তু বেশ বড় বড়।
বড় মানে কী? বেশী শোনে।
বেশী শোনে মানে কী?
বেশী বোঝে,
এমন কি আমাদের কথাও বোঝে সে।

আমার সঙ্গে কী ভাব!
ভাব ত ভাব, কিন্তু কেন ভাব?
তা বলবো না।
কিছুতেই বলবো না—
শুধু একটু বলছি—
আমি ত বই পড়ি, নামতা পড়ি
কত কিছু পড়ি।
পড়ার ঘরের পাশেই থাকে গুণধর।
আমার পড়া শোনে আর জাবর কাটে
আর মাঝে মাঝে বলে,
বি এল্ এ ব্লা—আ—আ—আ—
কিন্তু তাও নয়—
একদিন কাকা বললে
তিন পাঁচে কত রে?
আমি বললুম, তেষট্টি।
কাকা বললে, তুই একটা আস্ত গোরু।
পাশের ঘরে গুণধরের কী হাসি!
তারপরে সে আমায় বললে কি জানো?
বললে, তুমিও গোরু, আমিও গোরু—
কী মজা, হাঃ হাঃ হাঃ
বি-এল-এ ব্লা—আ—আ,
তোমার সাথে বেশী ভাব, হাঃ হাঃ
বি এল এ ব্লা—ব্লা—ব্লা—
তাই ত সে আমার হাত চেটে দেয়,
পিঠ চুলকে দেয়,
আর, আমার ধারাপাতখানা
আস্ত চিবিয়ে খেয়েছে।
যা থাক, নামতা ত আমার মুখস্ত।

একাগ্রতা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মহাভারতে আছে—কৌরবদের শস্ত্র-পরীক্ষার সময় দ্রোণাচার্য এক গাছের ডালে পাতার ফাঁকে একটা মাটির পাখি রেখে ডালে পতার ফাঁকে একটা মাটির পাখ রেখে বার বার পরীক্ষার্থীদের শুধু এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কী দেখছ তোমরা?" তাতে যারা জবাব দিয়েছিল,—"গাছ দেখছি, ডালপালা দেখছি, আপনাদের দেখছি"—তাদের আর পরীক্ষা দিতেই দেননি। এই রকম পরীক্ষার্থীই ছিল বেশির ভাগ। কেবল অর্জুন বলেছিলেন, "শুধু পাখিটা দেখছি।" দ্রোণাচার্য প্রশ্ন করেছিলেন, "গোটা পাখিটা দেখছ?" অর্জুন উত্তর দিয়েছিলেন, "না প্রভু, শুধু ওর চোখটা দেখছি।" খুশী হয়েছিলেন দ্রোণাচার্য। বলেছিলেন, "এইবার তীর ছোড়।" অর্জুনের তীর পাখির সেই বিন্দুর মত চোখটিই বিদ্ধ করেছিল। দ্রোণাচার্য বলেছিলেন—তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অর্জুনই সর্বশ্রেষ্ঠ—ওঁর তুলনা নেই।

কিন্তু শুধু শস্ত্রবিদ্যা নয়—মানুষের জীবনে যে-কোন বিদ্যায় পারদর্শী হতে গেলে, যে-কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে গেলেই চাই এই একাগ্রতা, তন্ময়তা।

আধুনিক যুগের একজনের কথাই বলছি।

তোমরা পেনিসিলিনের নাম শুনেছ সকলেই। সে এক আশ্চর্য ওষুধ—এতকাল যে-সব রোগ ছিল চিকিৎসার অসাধ্য বা দুঃসাধ্য—যা ছিল কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক—তা অতি সামান্য সময়ের মধ্যে সেরে যাচ্ছে এই ওষুধের কল্যাণে।

বহু রোগের বীজাণু ধ্বংস করতে পারে এই ওষুধটি। অবশ্য বেশী বার প্রয়োগ করলে অনিষ্টও হয় মানুষের। চট করে সেরে যায় বলে চিকিৎকরা যেখানে সেখানে পেনিসিলিন প্রয়োগ করেন—তার ফলে রোগীর এক এক সময় প্রাণান্ত হবার যোগাড় হয়। এঁর আবিষ্কারক স্বয়ং আলেকজান্দার ফ্লেমিং—আমাদের দেশে এসেই বলে গেছেন, "দোহাই তোমাদের, তোমরা পেনিসিলিনের এত ব্যবহার বন্ধ কর!"

কিন্তু মহাশক্তিশালী জিনিস বলেই এত সতর্কতা তাঁর। পাশুপত অস্ত্র দেবার সময় মহাদেব অর্জুনকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, "খুব সাবধান! এ অস্ত্রের হাত থেকে দেব অসুর যক্ষ রক্ষ কারও নিস্তার নেই বটে—কিন্তু সামান্য মানুষের ওপর কখনও প্রয়োগ করতে যেও না—তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, বিশ্বে প্রলয় দেখা দেবে।"

এহেন ওষুধ আমরা বার করতে পারি না কেন?

কেন পারি না—তার জবাব পাওয়া যাবে এই আশ্চর্য ওষুধ পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা স্যার আলেকজান্দার ফ্লেমিং-এর জীবনের একটি ঘটনা থেকে।

গল্পটি বলেছেন তাঁরই কর্মসচিব বা সেক্রেটারি। ঘটনার মধ্যে তিনিও জড়িত ছিলেন।

১৯৪৪ সাল। বিলেতে নিত্য বোমা পড়ছে। এক আধটা নয়—অসংখ্য, অজস্র। গোটা দেশটাই ধ্বংস হতে বসেছে প্রায়।

স্যার আলেকজান্দার তখন তাঁর ঘরে বসে কাজ করছেন, কী সব জরুরী 'নোট' দিচ্ছেন, সেক্রেটারি বসে লিখে নিচ্ছেন সেগুলো। বলতে বলতেই তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন তিনি—কোন সুদূরে মন চলে যাচ্ছে। চিন্তায় ডুবে যাচ্ছেন মধ্যে মধ্যে।

এমনি একটি তন্ময়-মুহূর্ত যাচ্ছে তাঁর। এমন সময় বোমা পড়বার বিপদ আসন্ন জানিয়ে সাইরেন বেজে উঠল।

এরোপ্লেন নয়—বোমারা স্বয়ং উড়ে আসছে। উড়ুক্ক বোমা যাকে বলে—তাই। সাধারণ বোমার চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী।

মুখ শুকিয়ে উঠল সেক্রেটারির। তিনি অসহায় বিপন্নভাবে চাইলেন স্যার আলেকজান্দারের মুখের দিকে।

কিন্তু সেই জ্ঞানতপস্বী নির্বিকার। তিনি নিজের সাধনায় ডুবে গেছেন তখন। তেমনি স্থির নিশ্চলভাবে বসে রইলেন তিনি।

আর একটু পরে দ্বিতীয় বার বাজল সাইরেন। অর্থাৎ এসে পড়েছে।

আর সে ত খোলা জানলা দিয়ে নিজের চোখেই দেখছেন সেক্রেটারি। কানেই শুনতে পাচ্ছেন তার আগমনের বিকট ঘর্ঘর রব।

অমোঘ অব্যর্থ গতিতে এগিয়ে আসছে, তাঁদেরই লক্ষ্য করে।

সেক্রেটারি ঘেমে নেয়ে উঠলেন ভয়ে, হাত এত কাঁপছে যে পেন্সিলটা ধরে রাখা যাচ্ছে না। আবারও অসহায় করুণভাবে চাইলেন স্যার আলেকজান্দারের দিকে। তিনিও চেয়ে আছেন জানলার দিকেই—কিন্তু নির্বিকার প্রশান্ত তাঁর মুখভাব, ললাটের একটি রেখাও চঞ্চল হচ্ছে না এই আসন্ন মৃত্যুর সামনে।

ক্রমে সে বস্তুটি মাথার উপরে এল।

না,—এ বাড়িতে পড়েনি। একটুর জন্যে বেঁচে গেছে। একেবারে কান-ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়া যাকে বলে।

কিন্তু গেছে একেবারে বাড়িটার উপর দিয়েই। তার ফলে গোটা বাড়িটা ঝন্ ঝন্ শব্দে কেঁপে উঠল। দূরে গিয়ে যেখানে পড়ল—সেখানকার সে ধ্বংসের শব্দও কম নয়। কানে যেন তালা লেগে গেল সে শব্দে। তবু এতটুকু বিচলিত হলেন না ফ্লেমিং। তেমনি স্বপ্নালু দূর-নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি।

একটু পরেই আবারও সাইরেন বাজল,—'অল্ ক্লিয়ার' সাইরেন। বিপদ কেটে গেছে—এবার অন্তত কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এই সাইরেন বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই কাণ্ড ঘটে গেল। স্যার আলেকজান্দার হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, "লুকোও, লুকোও! করছ কি—শুনতে পাচ্ছ না—এখনি বোমা পড়বে যে!"

বলতে বলতে নিজেও গিয়ে গুঁড়ি মেরে একটা টেবিলের নীচে ঢুকলেন!

আগের সাইরেন বা বোমার শব্দ কোনটাই কানে যায়নি তাঁর। এইটেকেই তিনি বিপদসূচক সাইরেন ভেবেছেন। এমনি তন্ময়তা ও একাগ্রতা না থাকলে পৃথিবীতে কোন বড় কাজই করা যায় না—কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না।

স্বপ্নালু দূর-নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি

১নং

ভাই

কাল যখন গ্প্তস্থানে তোমার চিঠি পেলুম না, তখন আমার মনের অবস্থা যে কী হয়েছিল, সে আর কী বলব! তবে কি তুমি এত সহজেই ভয় খেয়ে গেলে? চিরকাল তো দেখে এসেছি যে, স্বয়ং হেডসার পেছন ফিরে বোর্ডে কিছু লিখতে গেলেই, তুমি ভেংচি কাটতে, বগ দেখাতে, সে-সময় তো তোমার অন্য মূর্তি দেখতুম।

এমনও নয় যে, তোমার অসুখ করেছে! তা হলে আমার চিঠিটা নিলে কী করে? তাছাড়া মামার সঙ্গে বুক ফুলিয়ে খেলার মাঠে যাওয়া হচ্ছিল, সে কি আমার চোখে পড়েনি ভেবেছ?

তোমাদের বাড়ির লোকদের ধারণা, আমার সঙ্গে মিশলে তুমি গোল্লায় যাবে। তাই তোমার মন ভোলাবার জন্যেই ওদের এসব চেষ্টা, সে কি তুমি বোঝ না?

তাহলে তোমার এও জানা উচিত যে, আমাদের বাড়ির লোকদের বিশ্বাস, তুমি একটা পাজি বদমায়েস, তাই আমাকে ও-স্কুল থেকে ছাড়িয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে।

তোমার সঙ্গে মিশলে আমি খারাপ হয়ে যাব, একথা জেনেও আমি তোমাকে ছাড়িনি; আর তুমি কি শেষ মুহূর্তে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছ নাকি? আমাদের বাড়ির লোকরা বলে, তোমার টেরি বাগানো দেখেই তোমাকে হাড়ে হাড়ে চেনা যায়। সে কথা কি তবে সত্যি?

অবিশ্যি এক হতে পারে যে, অন্য কোনো দুষ্টু লোকে আমার চিঠিখানা সরিয়েছে, তুমি সেটা পাওইনি। কিন্তু তুমি তাদের বলে না দিলে গুপ্তস্থান খুঁজে বের করা কারো পক্ষে তো সম্ভব নয়।

তোমাদের বাড়ির লোকদের চিনতে আমার বাকি নেই। ওরা যদি তোমার ওপর কোনো রকম জোর-জবরদস্তি করে তো আমাকে একটু জানালেই হয়। ওদের আমি একবার দেখে নিই! যাই হক, আমাদের বাড়ির লোকদের চেয়ে খারাপ তো আর ওরা হতে পারে না।

এ চিঠির উত্তর তোমার দেওয়া চাই-ই। কারণ সেই তাদের ও-রকম বন্দী অবস্থায় আর বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমার অবস্থা তো সবই জানো, ওদের খাবার জোগানো আমার বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠছে না। অথচ কাজ হাসিল হবার আগে মরে গেলেও তো আগাগোড়া লোকসান। ভালো চাও তো চিঠি পেয়েই গুপ্তস্থানে উত্তর রেখে দেবে।

ইতি

২নং

ভাই

তা বললে তো চলবে না, এই সময় ওরা মরে গেলে হবে না। আমি আর ধরে আনতে পারব না বলে রাখলাম। প্রাণ হাতে নিয়ে ও-কাজ করতে হয়েছিল। আম বাগানের ও-দিকটাতে কি ঘন কচুবন, তোমার কোনো ধারণাই নেই। আমি বলেই পেরেছিলাম। বড় জোর আজ বাদে কাল। তারপর তো আর খাবারের দরকার হবে না, এখন আর অত বাছবিচার কিসের? তবে আশা করি ওদের এক সঙ্গে রাখনি? তা হলে হিংস্র হয়ে উঠে আবার পরস্পরকে না আক্রমণ করে!

আমাদের বাড়ির লোকরা শনিবারের তিনটের শোর জন্যে বাড়িসুদ্দু সকলের টিকিট কিনেছে আর রবিবার ভোরে দল বেঁধে সোনারপুর যাওয়া হচ্ছে, সেখানে লুচি পাঁঠা রান্না হবে। আমাকে হিংসে করে আমার বাড়ির লোকদের সম্বন্ধে তুমি যা ইচ্ছে বলতে পারো, তাতে আমার কাঁচকলাও এসে যাবে না। তাছাড়া ওরা যে লোক ভালো নয় সে তো আমি বরাবর জানি। গত বছর যাত্রা দেখতে যাওয়া নিয়ে কী কাণ্ড করেছিল, সে আমি আজও ভুলিনি। না বলে যাব না তো কী করে যেতাম? বললে কি ওরা মত দিত বলতে চাও? সে যাক গে, এখন একটু চুপচাপ থাকো, এদের মনের সন্দেহ ঠাণ্ডা হক, তারপর আর কোনো ভাবনাই থাকবে না। ওদিকে আমিও বিষম ফ্যাসাদে পড়েছি, টাকাকড়ি না হলে তো কোনো ব্যবস্থাই করা যাচ্ছে না। তোমার জন্মদিনে পাওয়া টাকাগুলো এরই মধ্যে কী করে খরচ হয়ে গেল, ভেবে পেলাম না। সব টাকা আমি জোগাব, আমি কি একটা ব্যাঙ্ক নাকি? ঐ যে কি নাম, ভুলে যাচ্ছি যা নিয়ে দেবতারা ঝগড়া করতেন, ইচ্ছে-গাই না কী যেন?

ইতি

পুঃ—কালকের চিঠির উত্তর দিইনি, কারণ ফুল্লরা কেবিনে মামার সঙ্গে কাটলেট খেতে যাবার দরুন সময় পাইনি।

৩নং

ভাই

তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে বাকি রইল না, তোমার কতদূর অধঃপতন হয়েছে। জন্মদিনের টাকা দিয়ে তো কবে সেই টিকিটের অ্যালবাম কিনেছিলুম, কোন্ কালে সে হারিয়েও গেছে।

আর টাকার অভাব আবার একটা কথা নাকি? আমার অনেক হাতের লেখা লিখতে হয়, নইলে টাকা রোজগার করা কি এমন শক্ত বুঝলুম না। যাই হক, কয়েকটা উপায় বাতলে দিচ্ছি, তাতে কিছু টাকার উপায় হবেই। যেমন (১) তেলেভাজার দোকান—কোনো মূলধন লাগে না। তোদের রান্নাঘরে ও ভাঁড়ারঘরে সব পাবি। (২) ধারের ব্যবসা। মামার কাছ থেকে দুটো টাকা চেয়ে দু-টাকার জায়গায় তিনটাকা দেবে। আবার খাটাবি, হবে সাড়ে চারটাকা—তা হলেই হবে। (৩) লটারি করা। তোদের পুরোনো রেডিওটা লটারি করে দে, একটাকা টিকিট। তিন দিনে দুশো টিকিট বিক্রি হবে—তার দেড়শো দিয়ে একটা নতুন রেডিও কিনবি, বাকি টাকা আমাদের। এইগুলো করে দ্যাখ, নিশ্চয়ই যথেষ্ট হবে।

ইতি

পুঃ—আর দ্যাখ, দু একদিনের মধ্যে যা হয় করিস। ওদের মধ্যে তিনজন নড়ছে-চড়ছে না। ভাতটাত খায় না কেউ। রুটিও না।

৪নং

ভাই

তোর আহ্লাদ দেখে অবাক হই! আমি সব করব আর উনি শুধু বুদ্ধি জোগাবেন, এতো মজা মন্দ না। এদিকে চারদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। ওদের ভালো করে তোদের খালি গোয়ালে লুকিয়ে রেখেছিস? শব্দটব্দ করে না আশা করি?

কারণ আমার খুব মনে হয় না'—'আমাদের পাছু নিয়েছে। জানিস তো ওর কি রকম লোভ। আমাকে এক দণ্ড ছাড়ে না, ইস্কুলে সঙ্গে সঙ্গে যায় আসে। গোপনস্থানের পাশ দিয়ে যাই আসি তবু চিঠি নেওয়া একটা সমস্যা হয়ে পড়েছে। কেউ নিশ্চয় ওকে টাকা দিয়ে বশ করেছে। কারণ চিরকাল তো ওর টাঁক গড়ের মাঠ বলে জানি, অথচ কাল যখন সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল, পকেট থেকে ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল। ও চান করতে বাড়ি গেলে এ চিঠির ব্যবস্থা করব।

যাই হক, তুই কিছু ভাবিস না, কাল একটা হেস্তনেস্ত করবই। কিন্তু ভাই মনে থাকে যেন, এবার আমাকে রাজা করতেই হবে, আমি আর ঘৃণ্য হীন পদে থাকতে রাজী নই। এত করছি শুধু ঐ জন্যেই।

ইতি

৫নং

ভাই

গুপ্তস্থানের কথাটা ম—কে বলতে হয়েছে, কারণ ওরা আমাকে দুদিন উপরি উপরি জোলাপ খাওয়াল, চিঠিপত্র নেওয়া আনার আর কোনো ব্যবস্থা করা গেল না। তবে ও কাউকে বলবে না বলেছে। ওর নাকি ভয় ভয় করে, যদি ধরা পড়ে তাই। তাই ওকে কিন্তু সেনাপতি না করলে হয়তো সব ফাঁস করে দেবে। এদিকে ওদের তো প্রায় সবার দফা শেষ। গোয়ালে আর ঢুকতেও ইচ্ছে করে না। সেই অন্যদের দিয়েই কাজ চালাতে হবে। টাকার কিছু করতে পেরেছিস নাকি? বেশী কেনবার কী দরকার? গোটা পাঁচেক হলেই তো যথেষ্ট। আমি ছোড়দাদুর পাকাচুল তুলে একটাকা জমিয়েছি, বাকিটা কিন্তু তোকে তুলতেই হবে, নইলে সব মাটি, আর সময়ও নেই।

ইতি

৬নং

ভাই

শুনে খুশি হবি, সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। শ—ই আমার শাপে বর হল। ওকেও দলে টানতে হল। বলেছি মন্ত্রী করে দেব। ওর কাছ থেকে তিনটাকা ধার নিয়ে পাঁচটা কিনেছি। আর যা যা লাগবে তোর টাকাটা দিয়েই হয়ে যাবে। আজ রাত্রে শ— নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। তুই ম—কে দিয়ে সেই অন্যদের জোগাড় করে পাঠাস আর টাকাটাও দিস। তা হলে কাল ভোরের মধ্যে সব হয়ে যাবে। শুধু তাদের বাঁচিয়ে রাখা গেল না, এই এক দুঃখ থেকে গেল।

ইতি

৭নং

ভাই

আমার সত্যি সত্যি সর্দি জ্বর হয়েছে। জানতুম অত জোলাপ আমার সইবে না! তার ওপর সকাল থেকে মন খারাপ, কারণ কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না। ম—র দেখা নেই, সেই কাল সন্ধেবেলা টাকা নিয়ে আর অন্যগুলোকে নিয়ে গেছে তো গেছেই, কাজ হাসিল হয়েছে কিনা তা পর্যন্ত বুঝলুম না। সব জানাস ভাই, নইলে এই রোগশয্যা থেকে আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।

ইতি

ভাই গুপি,

আর গোপনতার কোনো দরকার নেই, যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। শম্ভু আর মণ্টু দুজনে মিলে রাতে নতুন খুড়োর পুকুরে পাঁচটা ছিপই কেঁচো গেঁথে ফেলে রেখেছিল। ভোরে গিয়ে দেখে পাঁচটা চার সেরি সাড়ে চার সেরি কাতলা পড়েছে। সেইগুলোকে তুলে নিয়ে চারটেকে ওরা পুজো কমিটির চারজনার বাড়িতে নিজেদের নামে দিয়ে এসেছে আর একটা দিয়েছে নতুন খুড়োকে। এতবড় মিথ্যাবাদী যে, বলেছে টালিগঞ্জে গিয়ে নাকি কোন বন্ধুর পুকুর থেকে ধরেছে। তাঁরা তো সব আহ্লাদে আটখানা! মাছের গায়ে তো আর টিকিট ঝোলানো নেই যে, নতুন খুড়োর পুকুর থেকে ধরা।

নতুন খুড়ো এইমাত্র জ্যাঠামশাইকে বলে গেলেন, শম্ভু আর মণ্টু নাকি পুজোর নাটকে রাজা আর শত্রু-রাজা হবে, আর তোকে আমাকে নাকি মন্ত্রী আর সেনাপতি করা হবে। সে পার্টগুলো কত ছোট তোর মনে আছে তো ভাই? আর শম্ভু মণ্টুর পেজোমি দেখলি। নতুন খুড়োর পুকুর থেকেই রাতারাতি মাছ চুরি করে—চুরি নয় তো কি ভাই?—ও'কে আর ও'র দলটিকে দিয়ে আমাদের পার্টগুলো বাগিয়ে নিলে। এই বয়সেই এই, আরো বড় হলে যে পাকা দাগী চোর হবে না, তাই বা কে বললে!

চাঁদের বুড়ী

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

চাঁদের বুড়ী চরকা কাটে সারাটা রাত ধরে,
জ্যোৎস্না মেখে কালপেঁচারা আকাশ দিয়ে ওড়ে...
ঝিঁঝি ডাকে,
বনের ফাঁকে
জোনাকিরা জ্বলে,
মটমটিয়ে বাঁশের ঝাড়ে বাতাস কথা বলে......
ঘুড়ি ওড়াও, সুতো ছাড়ো,
খবর পাঠাও তাতে,
মনে মনে ডাক দিয়ে যাও
নিশুতি এই রাতে:
চাঁদের বুড়ী মুক্তো ঝরাও উদার হাসি হেসে
রূপকথাদের রুপোর কাঠি ছোঁয়াও কাছে এসে...
ডাকতে ডাকতে ভোর হবে ত, পথটা অনেক দূর,
আসতে যদি না পারে সে
দেখবে ওপাশ ঘেঁষে
দাঁড়িয়ে আছে ওর বদলে সোনালী রোদ্দুর॥

অথচ বুদ্ধিটা হল তোর আমার! কচুবন থেকে ফড়িং ধরে এনেছিলাম আমি, নেহাত তুই বাঁচাতে পারলি না বলে কেঁচো দিয়ে ধরতে হল। কিন্তু সমস্তটা আমাদের মাথা থেকেই বেরুল, অথচ ফল ভোগ করছে ওরা দুটোতে। তোর বাবাও আমাদের বাইরের ঘরে বসেছিলেন, নতুন খুড়ো তাঁকে কি বললেন জানিস? বললেন, ঐ জগু গুপি দুটি গুণধরকে আলাদা করে দিয়ে খুব বুদ্ধির কাজ করেছেন, দাদা। শম্ভু মণ্টুর মতো ভালো ছেলেদের সঙ্গে মিশলে এখনো ওদের সুমতি হতে পারে। নিজের পুকুরের মাছ উপহার পেয়েই একেবারে গলে জল। ঐ বুড়োকে কী করে জব্দ করা যায় এখন তাই ভাবছি। সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছে, গুপ্তস্থানটা ওরা জেনে গেল বলে। নইলে কচুবনের পেছনের ভাঙা দেয়ালের আল্গা ইঁট সরিয়ে তার পেছনে চিঠি রেখে, আবার ইঁট বন্ধ করার কথা তোর ছাড়া আর কার মাথা থেকে বেরুতে ভাই?

ঠিক করেছি, তোর জ্বর হয়েছে বলে বাবা জ্যাঠামশাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে একবার তোকে দেখতে যাব। তখন বাকি কথা হবে। ইতি—তোর প্রাণের বন্ধু

জগু।

শেষে ঘেনুর কপালে সেটা উঠলো। বেশ বড়সড় হয়েই উঠলো। কী জ্বালা! উঠবি তো ওঠ না কেন অন্য কোথাও; তা নয়, উঠলো কিনা ঘেনুর তেল-চুকচুকে ওপর-কপালের ঠিক মাঝখানে! পোকা নয় যে, ঘেনু টুস্কি মেরে সেটা ফেলে দেবে। কুটো নয় যে, সট্ করে ঝেড়ে ফেলবে। কাক-চড়ুই নয় যে, হুস্ করে তাড়িয়ে দেবে। তা হলে ঘেনু করে কি এখন কপালের এই লিচুর বোঁটার মতন আঁচিলটাকে নিয়ে?

নাইতে, খেতে বা খেলতে কিছুতেই ঘেনুর সোয়াস্তি নেই। খালি চুকচুক করে আঁচিলটাকে তার টানতে ইচ্ছে করে। তা ছাড়া সবাই যখন অসভ্যর মতন প্যাটপ্যাট করে চেয়ে দেখে তার কপালের দিকে, তখন কী বিশ্রীই যে লাগে ঘেনুর, সে আর বলে বোঝানো যায় না। আরে, অমন করে দেখার কী আছে? ঘেনু কি আঁচিল সারাবার কম চেষ্টা করেছে? চুন দিয়েছে, চুল জড়িয়েছে, সোডা-সাজিমাটি ল্যাগিয়েছে, কিন্তু কিছুতেই কিচ্ছু হয়নি। বরং পাঁচিল সারানো সোজা, কিন্তু আঁচিল সারানো ভীমেরও অসাধ্য!

ঘেনুর কষ্টটা আর কেউ না বুঝুক, পেনু কতকটা আন্দাজ করতে পারতো। ঘেনুর কষ্ট দেখে একদিন তাই সে নিজে থেকেই কথাটা পাড়লে। তা ছাড়া বন্ধুর আপদ-বিপদে সাহায্য করাও তো দরকার। সে সুযোগ যখন এসেছে তখন পেনুর নিজে থেকেই সেটা করা উচিত। তাই সে সেদিন ঘেনুকে বোঝাতে লাগলো। "দেখ ঘেনো, তুই তো অনেক কিছু করলি, তা চ'না কেন একবার বুধোদার কাছে, তোর আঁচিলটা দেখিয়ে আনি।"

"বুধো?" ঘেনু প্রশ্ন করলে, "সে উধো আবার কে?"

ঘেনুর মন্তব্যে পেনু একটু চটেই উঠলো, সে জবাব দিলে, "আজ্ঞে, বুধোদাকে আর উধো বলতে হয় না। বুধোদা, নিজে ডাক্তার না হলেও ডাক্তারের ছেলে। বাবার ডিস্-পেনসারীতে বসে বসেই ও অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। আরে, কতলোক স্রেফ ওর কাছ থেকেই ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে গেলো, তা তোর, তোর তো সামান্য একটা আঁচিল রোগ—হাঁ! বড় হলে দেখবি, বুধোদা কী নাম-করা ডাক্তার হয়!"

বুধোদার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পেনুর এত বড় ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়াতে ঘেনুর মনে কেমন একটু আশা হয়। সে ভাবে, হয়তো হলেও কিছু হতে পারে, তবু কিন্তু-কিন্তু করে জিগ্গেস করে, "হ্যাঁরে, তোর বুধোদা শেষে এমন ওষুধ দিয়ে দেবে না তো যে, আমার কপালসুদ্ধ পুড়ে যাবে?"

"আরে, তেমন তেমন বুঝলে বুধোদা তোকে তো তার বাবা-ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। তাতে ভালোই হবে তোর। বিনি-পয়সায় একটা বড় ডাক্তার দেখাতে পারবি।" পেনু বোঝাতে থাকে ঘেনুকে, "আগে থাকতেই ঘাবড়াস কেন? বুধোদার বাবা আমাকেও জানেন।"

ঘেনু ভেবে দেখলে, পেনুর কথাটা ঠিক। তেমন একটা কিছু হলে বুধো-ডাক্তারের

"জিব দেখি"

বাবা-ডাক্তার তো রয়েইছে হাতে। কুছ্-পরোয়া নেই, ঘেনু দেখাবে পেনুর বুধোদাকে তার আঁচিলটা।

দিন-ক্ষণ দেখে ঘেনুকে নিয়ে পেনু সত্যি হাজির হলো তার বুধোদার কাছে। বুধোদা তখন তার ঘরে বসে মোটা একটা ডাক্তারী বইয়ের ছবি দেখছিল। পেনুকে দেখে সে বেশ খুশি হয়ে উঠলো। চেয়ার-খানা দেখিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, "আরে, তোকেই খুঁজছিলাম পেনো। এই বইটা দেখছিস না? এর মধ্যে মানুষের চেরা হাত-পায়ের সব ছবি আছে, বুঝলি? এর গোটাকতক আমাকে এ'কে দিতে হবে।"

পেনু চালাক ছেলে। বেশী বাজে কথা না বলে সে কাজের কথা পাড়লে। "ছবি হবে'খন। তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে বুধোদা। ঘেনুকে নিয়ে এলুম তোমার কাছে। ওর বড় অসুখ।"

বুধোদার ঘরের দেয়ালে ঝোলানো কঙ্কালের ছবি, বইয়ের তাকে লাল, নীল ওষুধের শিশি ও আরও সব টুকিটাকি দেখে ঘেনুর মনে হলো, বুধোদা বয়সে তার চেয়ে তেমন বড় না হলেও ভবিষ্যতে বড় হবার উপযুক্ত বটে!

রোগীর কথা শুনে বুধোদা হাত গুটিয়ে ঘেনুকে বললে, "বোস এই চেয়ারে। কী অসুখ? পেটের মধ্যে হাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে, না পড়তে বসলে চোখ বুজে যায়?"

ঘেনুকে অসুখের বিবরণ নিজে কিছু বলতে হলো না। পেনুই গড়গড় করে সব বলে গেলো।

বুধোদা ঘেনুর আঁচিলটা দুবার টেনে টেনে দেখলে; তারপর কপালে দুবার টোকা মেরে বললে, "জিব দেখি।"

ঘেনু ভালোছেলের মতই জিব বের করলে। জিব দেখে বুধোদা গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলে, "এটা অসুখ নয়।"

ঘেনু এবং পেনু দুজনেই রুদ্ধনিঃশ্বাসে এতক্ষণ বুধোদার রোগ-পরীক্ষার পদ্ধতি দেখছিল। বুধোদার মন্তব্য শুনে তারা একসঙ্গে বলে উঠলো, "তা হলে?"

বুধোদা ওদের কথা নকল করে বলে উঠলো, "তাহলে? ডাক্তারির কী বুঝিস তোরা? যদি বলি ত্বক্-তন্তু বিবৃদ্ধি, বুঝবি কিছু? যাকগে, কী ওষুধ খাচ্ছিস?"

ঘেনু এত বড় একটা রোগের নাম শুনে কেমন ঘাবড়ে গেলো। সে সম্ভ্রমে উত্তর দিলে, "খাইনি কিছু। এই চুন-টুন লাগিয়েছিলুম।"

বুধোদা বললে, "এ চুনকামের কেস নয়। দেখছিস না, শিঙের মতন ঠেলে উঠছে। এ সারজারীর কেস"

দুর্ভাবনায় ঘেনু ঘেমে উঠলো। সে ভাবলে, তাহলে কি শিং-জাতীয় কিছু নাকি রে বাবা! সে আমতা আমতা করে প্রশ্ন করলো, "তার মানে?"

বুধোদা জবাব দিলে, "মানে, অস্তর করতে হবে। ঘাবড়াসনি, এক মিনিটে সারিয়ে দেবো। কিস্সু টের পাবিনি। কুচ্ করে এমন কেটে দেবো যে, আঁচিলের আঁচটুকুও আর থাকবে না তোর কপালে।"

"বাবারে মরে গেলুম, মরে গেলুম,"

শিং-টিঙের ব্যাপার নয় জেনে ঘেনু আশ্বস্ত হলো। আঁচিলটা কাটতে গেলে হয়তো একটু লাগবে, তা লাগুক। ওতে ঘেনু-মাণ্টার কিছু ভয় পায় না।

বন্ধুর বিপদে বন্ধু কত কাজে আসে, বোধ করি সেই কথা স্মরণ করে পেনু বলে উঠলো, "কি রে ঘেনো! বলেছিলুম কিনা যে, বুধোদার কাছে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কত বড় ডাক্তারের ছেলে বুধোদা! ভাগিস এলি আমার সঙ্গে।"

বুধোদা ইতিমধ্যে টেবিলের-ওপর তুলো, আইডিন এবং স্পিরিটের শিশি সাজিয়ে রেডি হয়ে গেছে। টানা থেকে একটা নখ-কাটা কল বের করে, স্পিরিট দিয়ে সেটা মুছতে মুছতে সে বলে উঠলো "এাই পেনা! বাজে বকিসনি। ধরদিকিনি ওর মাথাটা টাইট করে হেলিয়ে ওপর দিকে।"

বুধো-ডাক্তার একটা স্পিরিট-ভেজানো তুলো ঘেনুর আঁচিলের চারপাশে বুলোতে বুলোতে আদেশ করলে, "চোখ বোজ ঘেনু।"

ঘেনু সুবোধ বালকের মত চোখ বুজে ফেললো। চোখ বুজে সে বুধো-ডাক্তারের সারজারীর কায়দা দেখবার কিছু সুযোগ পাচ্ছিল না বটে, কিন্তু উপলব্ধি করতে পারছিল ঠিকই।

ঘেনু বেশ বুঝতে পারলে যে, একটা চিমটে যেন তার আঁচিলের গোড়াটা কষে চিমটি দিয়ে ধরেছে। মাথাটা তার কট্‌কট্‌ করে উঠলো। চোখ খুলে প্রতিবাদ করবে কি না সে, একথা ভাবতে ভাবতেই কুট করে একটা শব্দ হলো। তারপরে ঘেনুর গালের ওপর টপ্‌টপ্‌ করে কি একটা জলীয় পদার্থ গড়িয়ে পড়লো।

ঘেনু চোখ খুলে দেখে যে, তার কপাল থেকে টপ্‌টপ্‌ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বুধোদা চিন্তিত মুখে ঘনঘন তার কাটা জায়গাটা একবার মুছছে, আর একবার তুলো চেপে ধরছে। রক্ত কিছুতেই থামছে না। পেনুর মুখটাও কেমন হাঁ হয়ে উঠছে! বুধোদার হাতে রক্তমাখা তুলোর পুঁটলি-গুলো দেখে ঘেনু আতঙ্কিত হয়ে কাঁদ-কাঁদ গলায় বলে উঠলো, "অ্যাঁ, এত রক্ত!"

বুধোদা মুখটা কাঁচুমাচু করে জবাব দিলে, "এই একটু রক্তারক্তি হয়ে গেলো। একেবারে শেকড়সুদ্ধু দিলুম কিনা সাফ করে—এ্যাই পেনো!" বুধোদা হুংকার দিয়ে উঠলো, "ঢাল না আইডিনটা এখানে।"

বুধোদার হুংকারে, পেনো, ঘেনোর মাথাটা ছেড়ে দিয়ে আইডিনের শিশিটা নিয়ে এলো এবং কোথায় ঢালতে হবে বুঝতে না পেরে ঝটিতি ঘেনুর কাটা কপালে উপুড় করে দিলে।

ঘেনু সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে চিংড়ি মাছের মতন লাফিয়ে উঠলো এবং "উরে বাবারে মরে গেলুম, মরে গেলুম!" বলে ঘরের মধ্যে দাপাতে শুরু করে দিলে।

বুধোদা পেনুর কাণ্ড দেখে রাগে রক্ত-মাখা তুলোটা দিয়ে থপাস করে তার মুখে প্রকাণ্ড একটা থাবড়া কষিয়ে বলে উঠলো, "ক্যাবলাচণ্ডে! ঢালতে বললুম কোথায়, আর ঢাললি কোথায়? আর রোগী ধরে এনেছিস না পাগলাগাধা ধরে এনেছিস? চেঁচাচ্ছে দেখো না! এ্যাই পাগলা ইদিকে আয়।" বুধোদা ঘেনুর দিকে তুলো আর শিশি-হাতে ধাওয়া করলে।

বুধো-ডাক্তারের হাতে ঘেনুর আর মোটেই আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছে ছিল না। বুধোদাকে ধেয়ে আসতে দেখেই সে "ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু!" বলে বুধোদাদের অন্দরমহল-মুখো দৌড় দিলে।

বুধো-ডাক্তারের রক্তচাপড় খেয়ে এবং ঘেনুর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে পেনুও কেমন বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। সে-ও ঘেনুর পিছু পিছু বাড়ির মধ্যে গিয়ে চেঁচাতে শুরু করলে, "মেসোমশাই! শিগ্‌গির আসুন—বুধোদা সারজারী করে রক্তারক্তি কাণ্ড করে দিলে—শিগ্‌গির আসুন! সারজারী দেখে যান!"

বুধোদার বাবা মোটা মানুষ। রুগী দেখে

"ডাক্তারবাবু, রক্ত বন্ধ হচ্ছে না যে!"

অবেলায় বাড়ি ফিরে তিনি দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। ঘেনুদের চেঁচামেচিতে ঘুমন্ত চোখে "ক্কে র‍্যা—কে র‍্যা?" করে ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন এবং সামনে রক্তস্নাত ও টিনচার আইডিনলাঞ্ছিত ঘেনুকে দেখে থমকে গিয়েই তড়বড় করে শুরু করলেন, "এ্যাঁ, ষাঁড়ে গুঁতিয়েছে—এমনি করে?—দেখি কোথা? এ্যাঁ, মাথায়? তা মাথায় গুঁতুলে কেন? ষাঁড়ের সঙ্গে ঢুঁসোঢুঁসি করছিলি বুঝি? কী ষাঁড়?—পোষা না ক্ষ্যাপা?"

পেনু যত বোঝাতে চেষ্টা করে যে, ষাঁড় নয়—এটা সারজারী! ডাক্তারবাবু ততই বলে ওঠেন, "এ্যাঁ! ষাঁড়ের সঙ্গে জারিজুরি—তাই করেছে বুধো? তার গায়ে কি জোর আছে যে, সে গেছে ষাঁড়ের সঙ্গে গা-জুয়ারী ফলাতে?"

পেনু ফেল্‌ হয় দেখে, ঘেনু নিজেই এগিয়ে এলো। এবং ডাক্তারবাবুর গলার ওপর এক পর্দা গলা চড়িয়ে শুরু করলে। "ডাক্তারবাবু রক্ত বন্ধ হচ্ছে না যে!"

"রক্ত বন্ধ হবে কী করে?" ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, "ষাঁড়ের গুঁতোর জোর তো কম নয়! যেমন হয়েছো তোমরা!"

"আজ্ঞে, এটা গুঁতোবার কেস নয় ডাক্তারবাবু।" ঘেনু কপাল থেকে রক্ত মুছে বলতে থাকে, "আঁচিল-কাটা কেস। আমার আঁচিলটা বুধোদা অস্তর করে দিয়েছে।"

ডাক্তারবাবুর কাছে ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তিনি গর্জে ওঠেন, "এ্যাঁ, বুধো বুঝি ধরে তোমার আঁচিল কেটেছে? তোমার ওপর সার্জারী ফলিয়েছে? বাবু ডাক্তার বনেছেন! কোথায় গেলো সেই ষাঁড়টা? রসো, তোমার রক্তপড়া আগে বন্ধ করি, তারপর বের করছি আমি বুধো-ডাক্তারের ষাঁড়জারী! পেনু, খোল ডিসপেন-সারী ঘর। নিয়ে আয় চাবি।"

পুষি আর বাঘা

॥ গোবিন্দপ্রসাদ বসু ॥

পুষি : মিয়াও...ম্যাও...মাঁও...
দুধ-মাছ-ভাত আমায় খেতে দাও,
ছাই ভস্ম খাইনে—আমি পুষি।

বাঘা : ঘেউ...ঘেউ-উ...ঘেউ...
একমুঠো ভাত আমায় দিলে কেউ,
আমি বাঘা—তাতেই হবো খুশি!

পুষি : ইঁদুর, ছুঁচো, আরসোলা, টিকটিকি
একবারটি সামনে আসুক দিকি?
কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাব ঠিক!

বাঘা : চোর, কি ডাকাত আসুক আমার কাছে
বুকের পাটা দেখবো কত আছে!
হাঁক-ডাকেতে জাগাবো চারদিক!

পুষি : ছোট্ট রুমি আমায় কোলে করে
সারাটি দিন এখান-ওখান ঘোরে।

বাঘা : সকাল-বিকেল প্রত্যহ দুইবেলা
আমার সাথে রুনটু করে খেলা।

পুষি : বাজায় কে ঝুমঝুমি?
আরে,—আসছে দেখি রুমি!

বাঘা : বাজাচ্ছে কে বাঁশি
যাই—ছুটে দেখে আসি!

কে নেবে ভার?

অমিতা ঘোষাল

(বৃদ্ধ আশ্রমগুরু বসে বসে ভাবছেন, তাঁর মৃত্যুর পর কে নেবে আশ্রম পরিচালনার ভার। এমন সময় এক শিষ্য প্রবেশ করলো)

শিষ্য—ভাবছেন কী গুরুদেব!
কী ঘটেছে কোথা, আদেশ করুন,
জানিয়ে দোব সবাইকে সে কথা।
পুজোপাঠ, নাম-কীর্তন,
বাসনা যা থাকে; বলুন আমাকে।

গুরু—বয়স হলো বৃদ্ধ হলাম
এবার ছুটি চাই।
কাকে দেব আশ্রম-ভার
ভাবছি বসে তাই।
আমার মনের বাসনা যা
প্রচার করো আজ
পরখ করে দেখবো আগে
পরে দেব কাজ।
সত্যি যে কেউ বড় হবে
স্বভাব গুণে জ্ঞানে
তারেই দোব আশ্রম-ভার
পরম সম্মানে।

(শিষ্যের প্রস্থান)

প্রথম গুণীর প্রবেশ। (বিচিত্র ভঙ্গিতে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল)

গুরু—কী পরিচয় তোমার বাছা?

গুণী—আমি বড়লোকের ছেলে,
মণ্ডামিঠাই দৈ-সন্দেশ
খাই যে ক্ষিদে পেলে।
বেড়াই হেসে খেলে।

গুরু—বেশ, বেশ! বিদ্যা কতদূর?

গুণী—বিদ্যা? বিদ্যা অনেকদূর!
ভাবনা নাই কিছু।
গোটা চারেক পণ্ডিত
ঘোরে রোজই আমার পিছু।
খুব বেশী নয় বছর দু-তিন
পাঠ করেছি শুরু,
কিন্তু তবু পাইনি আজও
মনের মতো গুরু।
প্রবেশিকা সামান্য সে কথা
অকারণে ঘামাইনি আর মাথা।
পরীক্ষা তো দিতে পারি,
যখন—খুশি হলে
কারণ, আমি বড়লোকের ছেলে।

গুরু—বটেইতো! বটেইতো!
বয়স হলো কত?

গুণী—আজ্ঞে! বয়স আমার?
তা বেশী নয়—উনিশ বছর
এগার মাস হলো—
স্বাস্থ্য খুবই ভালো।
সারাটা দিন বেড়াই হেসে খেলে
খাওয়াপরার নেই ভাবনা,
বড়লোকের ছেলে।

গুরু—তা বেশ বেশ! জিরোও খানিক,
ভেবে দেখি আগে,
খবর পাবে সময় মত
যদি কাজে লাগে।

[ছেলেটি খানিক দূরে গিয়ে উৎসুক হয়ে দাঁড়াবে ও পরে যারা ঢুকবে তাদের কথার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র ভাবভঙ্গি করবে, ওস্তাদ বোকার মতো]

(দ্বিতীয় গুণীর প্রবেশ)

গুরু—কী পরিচয় তোমার বলো শুনি:

গুণী—আমি বড় পালোয়ান
ডনগীর বলীয়ান—মহাবীর সিং
রোজ নাম-গান গাই
পাঁচ সের দুধ খাই
তিন সের ছাতু দিয়ে
এক তোলা হিং।
দিতে পারি বৈঠক
পাঁচকুড়ি পাঁচবার। বুক ডন পিঠ ডন
হিসাব নেই তার
রোগা বটি দেখতে, কপাল যে মন্দ
ম্যালেরিয়া হাঁপি রোগ
বলে নিঃসন্দ
ডাক্তার কবরেজ হার মানে বার বার
ভজন পূজনে মন দিতে চাই এইবার।

গুরু—বেশ বৎস, বেশ বেশ!
বিশ্রাম করো তুমি।
একটু হাঁফ ছেড়ে
খবর পাবে সময় হলে
কপাল যদি ফেরে!

(হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে দাঁড়াবে আগের গুণীটির পাশে। ভাবভঙ্গিতে হতাশা ফুটে উঠবে)

তৃতীয় গুণীর প্রবেশ

গুরু—কী পরিচয় বৎস?

গুণী—আমি বড় ওস্তাদ,
সারা দিন গান গাই
কান নাড়া, নাক নাড়া
তাইরে নাইরে নাই।
বাগেশ্রী ছাগেশ্রী
দিল্‌খুসা খাম্বাজ
কেওড়া তেওড়া তালে
আমি পাকা নামবাজ।
শোনাতেও পারি অবশ্য
যদি শুনতে চান
সুমধুর নাম-গানে
খুশি হন ভগবান।

(বিকৃত কণ্ঠে গলা ভাঁজা শুরু করলে গুরু ব্যস্ত হয়ে বাধা দিবেন)

গুরু—থাক্ থাক্ বৎস।
বৃথা কেন কষ্ট,
আগে দেখি ভেবে
সময়মতো খবর পেলে
পরে কাজ নেবে।

(হতাশ ভঙ্গিতে সকলের সঙ্গে সেও মিললো)

চতুর্থ গুণীর প্রবেশ

(ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড়, সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য)

গুরু—কে তুমি সুকুমার,
পরিচয় কী তোমার?

গুণী—গরিবের ছেলে আমি
দিনভর করি কাজ—
জলে ভিজি—রোদে পুড়ি
ছোট কাজে নাহি লাজ।
রাতে পড়ি পাঠশালে
শিখি, লিখি, পড়ি,
চাষ করি, তাঁত বুনি
হাতের শিল্প গড়ি।
ঘরে রুগ্ন বাপ-মা
ছোট ভাই বোন
ঘুচাতে পারি না একা
দুঃখ অনটন।
(মুখে কাতরতা ফুটে উঠলো)

গুরু—এস বৎস।
তুষ্ট হয়েছি আমি
তোমার কথা শুনে
তোমাকে দিলাম ভার
মুগ্ধ হয়ে গুণে।

(গুরু আসন ত্যাগ করে উঠে আশীর্বাদ করলেন, আর সব গুণীরা রেগে প্রস্থান করল)

(সমাপ্ত)

রাজা কা দো শিং

শচীন সুর

আরশিতে নিজের মুখ দেখতে গিয়ে রাজা হঠাৎ দেখলেন, তাঁর দুটি শিং গজিয়েছে।

রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন। তাই তো মাথায় দুটি শিং নিয়ে তিনি কী করে লোকের সামনে বেরুবেন। তারা যে দুয়ো দুয়ো করবে। এখন কী উপায়!

দুশ্চিন্তায় রাজার চোখে ঘুম নেই। আহারে রুচি নেই। কারও সঙ্গে কোন কথা বলেন না। সব সময় মুখ ভার করে বসে থাকেন। সামান্য কথা নিয়ে রানীর সঙ্গে খিটিমিটি লেগে যায়। মন্ত্রী কোন কাজের কথা বলতে এলে বলেন, "পরে হবে, এখন আমার সময় নেই।" প্রজারা কোন নালিশ জানাতে এলে খবর পাঠিয়ে দেন—"আজ সভা বসবে না। শরীর ভালো নেই।"

সবাই অবাক। তাই তো, আমাদের রাজা মশাই তো এমন ছিলেন না। হঠাৎ তাঁর কী হলো! সবাই মাথায় হাত দিয়ে ভাবে। রাজাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না।

রাজাও মাথায় হাত দিয়ে শুধু ভাবেন। ভরসা করে কাউকে কিছু বলতে পারেন না। আরশির সামনে যখন তখন চুল আঁচড়ান। চুল দিয়ে ছোট দুটি শিং ঢেকে রাখেন। কিন্তু ভয় যায় না। শিং দুটি এখন অবশ্য ছোট আছে। কিন্তু যখন বড় হবে তখন তো আর চুল দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে না। কী সর্বনাশ হলো। ভগবান কেন তাকে এই শাস্তি দিলেন। রাজা বুঝি কেঁদেই ফেলেন।

রাজার কপালের জোরে শিং দুটি আর বড় হলো না। বড় বড় চুল দিয়ে তিনি তা কোন রকমে ঢেকে রাখলেন। ধীরে ধীরে মনের ভারও অনেকটা নামল। এখন দু-এক জনের সঙ্গে কথাও বলেন। সভাতে গিয়েও মাঝে মাঝে বসেন। প্রজাদের নালিশ শোনেন। মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্য শাসনের কথা বলেন। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু রাজা হাঁফ ছাড়তে পারলেন না। ভাবলেন—আর কেউ দেখতে না পেলেও নাপিত তো একদিন দেখবেই। বাবরি চুল তো রাখা যাবে না। চুল কাটাতেই হবে। রাজা আবার ভাবনায় পড়লেন। তাইতো, কী করা যায়।

অনেক ভেবে ভেবে একদিন তিনি নাপিতকে ডাকলেন। তারপর তাকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বললেন, তাঁর দুটি শিং গজিয়েছে। শিং দুটি তিনি নাপিতকে দেখালেন। পরে বললেন, "তুমি আসবে যাবে, চুল কাটবে। কিন্তু খবরদার, আমার শিং গজানোর কথা যদি তুমি কাউকে বল, তবে তোমায় আর আস্ত রাখব না। মনে থাকে যেন।"

নাপিত দুই হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে না মহারাজ, একথা আমি কাউকে বলব না। মহারাজের শিং, এ কি আমি বলতে পারি।"

রাজা খুশি হলেন। নাপিত চুল কেটে চলে গেল।

কিন্তু বাড়ি গিয়ে নাপিতের অবস্থা কাহিল। রাজার শিং গজিয়েছে এমন কথাটা কাউকে বলতে না পেরে সে ছটফট করে মরছে। কিন্তু উপায় কী। রাজার কানে কথাটা গেলে তার প্রাণ যাবে। কিন্তু এদিকেও যে তার প্রাণ যাবার জো হয়েছে। কথাটা বলতে না পেরে নাপিতের পেট ফুলে ঢাক!

তিন চার দিন এমনি করেই কাটল। নাপিতেরও রাজার অবস্থা। চোখে ঘুম নেই। খাওয়ার রুচি নেই। কথা বলতে ভালো লাগে না। কাজে মন বসে না। নাপিত পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কাউকে দেখতে পেলেই ডাকে, "শোন দাদা, শোন। একটা ভারি মজার খবর।" কিন্তু আর বলা হয় না। রাজার মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সবাই ভাবে নাপিত বেটা পাগল হয়ে গেছে।

নাপিত আর পারল না। একদিন চলে গেল গভীর এক জঙ্গলে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে অনেক দূরে চলে গেল। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানে জনমানব কেউ নেই। চারদিকে শুধু গাছ আর গাছ। নাপিত তখন একটা বড়গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "শোন, শোন, ভারি মজার কথা শোন। রাজার দুটি শিং গজিয়েছে।"

কিন্তু কে শুনবে মজার কথাটা। একটা মানুষও সেখানে নেই। আছে শুধু গাছ-পালা। কিন্তু তাতেই নাপিতের আনন্দ। মনের কথাটা তবু তো বলতে পেরেছে। অনেকটা হাল্কা হয়ে নাপিত বাড়ি ফিরে এল।

নাপিতের একথা কেউ জানে না। রাজার শিং-এর খবরও কেউ জানল না। নাপিত বাঁচল। রাজারও চিন্তা দূর হলো।

নাপিতের পেট ফুলে ঢাক

কিন্তু একদিন হঠাৎ রাজার শিং-এর কথা ফাঁস হয়ে গেল। নাপিতের মজার কথাটা সবাই জেনে ফেলল। কী করে জানল সেটা আরও মজার কথা। সেইটেই বলছি।

সেদিন রাজার বাড়িতে কী একটা উৎসব। আশে পাশের দশ গাঁ ভেঙে লোক এসেছে রাজার বাড়িতে। রাজার বাড়ির উৎসব। ফুলের মালা, নিশান, কত রং বেরং-এর আলো। বাইরে নহবতের শানাই বাজছে। বাড়ির উঠোনে ঢাকিরা নেচে নেচে ঢাক বাজাচ্ছে। হঠাৎ সবাই শুনল একটা ঢাক বারবার বলছে—

রাজা কা দো শিং
রাজা কা দো শিং
কিন্‌নে কহা, কিন্‌নে কহা?
বাম্বননে হাজমনে কহা।
রাজা কা দো শিং
রাজা কা দো শিং।

হঠাৎ শুনে সবার মনে সন্দেহ হলো, তাঁরা ভুল শুনছেন না তো? রাজার শিং, এ-ও কি সম্ভব। রাজার শিং আছে, একথা কে বলেছে? তাঁরা নিজেকে প্রশ্ন করেন। আর ওদিক থেকে জবাব দেয় ঢাক—

বাম্বননে হাজমনে কহা
বাম্বননে হাজমনে কহা
রাজা কা দো শিং

রাজার শিং-এর কথা আর গোপন রইল না। যে নাপিত রাজার চুল কাটত তার নাম বাম্বন। বাম্বন নাপিত যে গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, "রাজা কা দো শিং"—সেই গাছটা একদিন কাঠুরেরা কেটে নিয়ে আসে বাজারে বিক্রি করতে। কোন এক ঢাকী সেই গাছের ডাল দিয়ে ঢাকের কাঠি তৈরি করে। কোন মানুষ নাপিতের কথাটা শোনেনি। কিন্তু সেই গাছটা শুনেছিল। তাই তার ডাল একদিন ঢাকের কাঠি হয়ে শিং-এর কথাটা ফাঁস করে দিল।

সেই শিংওলা রাজা নেই। বাম্বন নাপিতও নেই। কিন্তু রাজার শিং আর নাপিতের গল্পটা ঢাকের বোল হয়ে এখনও বাজছে। ভারতের উত্তর প্রদেশের কোন গাঁয়ে গিয়ে যে-কোন একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে ঢাকের বোল বলে দেবে—

রাজা কা দো শিং
কিন্‌নে কহা, কিন্‌নে কহা
বাম্বননে হাজমনে কহা।

বাংলা দেশের ছেলেরা অবশ্য ঢাকের বোল অন্যরকম করে বলে। তারা বলে—তাক্ ডুমা ডুম ডুম, তাক ডুমা ডুম ডুম, ডুডুম, ডুডুম্।

গদাইচরণ

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

আজব দেশের মহারাজা, বেজায় তিনি খেয়ালী,
কখন কি তাঁর মরজি হবে সবার কাছেই হেঁয়ালি।

কখনো বা দিলদরিয়া, দরাজ হাতে বরদান,
কখনো বা বেজায় রেগে করেন দাবী গর্দান।
একটি ব্যক্তি আছে শুধু, সে তাঁর প্রিয় ভৃত্য—
গদাইচরণ; দুই বেলা তাঁর হাত পা টেপে নিত্য।

তারই প্রতি উদার এবং সদয় তিনি সদাই,
যখন তখন ডাকেন, "ওরে, কোথায় গেলি গদাই?"
অনেক গল্প বলে গদাই, যায় না তাদের গোনা,
কতক গল্প বানানো তার, কতক গল্প শোনা;

গল্প শুনে মহারাজা কাঁদেন এবং হাসেন।
কখনো বা কায়দা করে হাঁচির ঢঙে কাশেন।
গান গেয়েও শোনায় গদাই, নেই কোনো তার মানা,
নাই বা থাকুক সুরের বালাই, হোক না সে তালকানা;

শোনায় বাউল, ভাটিয়ালী, পল্লীগীতি, ভজন,
টপ্পা, গজল, ঠুংরি, ধ্রুপদ শোনায় ডজন ডজন;
কোনটা কি গান মহারাজা অত কি ছাই জানেন?
গদাই যে-গান যা-বলে গায় তাই বলেই মানেন।

বলেন, "আহা, গদাইচরণ হীরের টুকরো ছেলে
বিশ্বভুবন ঘুরলে পরেও ওর কি জুড়ি মেলে?
মন্ত্রী গেলে মিলবে আবার যখন তখন সদাই,
কিন্তু আহা, গদাই গেলে মিলবে না আর গদাই।"

পাঁচ মিনিটের গিন্নী

শ্রীরেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পাঁচ মিনিটের গিন্নী হয়ে বসল ইভা রান্নাশালে।
সরষে বাটা যেটুক ছিল ঢালল সেটা মুগের ডালে।
মা বসেছেন ঠাকুর-পুজোয় গিন্নীপনা করছে খুকু।
শুনবে নাকি, বলব খুলে, কেমন মজার ব্যাপারটুকু।
এক ঘটি জল সবটা দিলে ডালের হাঁড়ির মুখে ঢেলে।
পোয়াখানেক লবণ দিলে হাঁড়ির ভেতর সবটা ফেলে।
টিনের ভেতর হলুদ গুঁড়ো ছিল যত সবগুলো দেয়।
তার পরেতে চুপি চুপি মুঠো খানেক তেজপাতা নেয়।
তেজপাতা আর গোলমরিচে মিশিয়ে দিল ডালের মাঝে।
ডালের হাঁড়ির মধ্যে খুকুর খুন্তি কাঠির বাজনা বাজে।
শেষকালেতে উনুন থেকে ডালের হাঁড়ি তুলতে গিয়ে
উল্টে পড়ে খুকুমণি মেঝের উপর হুড়মুড়িয়ে।
ভাঙল হাঁড়ি, গরম ডালে পুড়ল খুকুর হাত দু'খানি।
গড়াগড়ি দিয়ে খুকু সারাটি দিন কাঁদল জানি।

প্যারিসের সিতে য়ুনুবরসেতার-এ মাঝে মাঝে যেতাম আমার বন্ধু ডক্টর মিশ্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। এই ইউনিভারসিটিতে তিনি অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছিলেন। একদিন তাঁর ঘরে পরিচয় হল সিনর কার্লো, হের গুতেনবার্গ, "মঁসিয়' মিলো ও শেখ গামাল-এর সঙ্গে। এঁরা সবাই ওখানে গবেষণা করছিলেন উচ্চগণিত সম্বন্ধে ডক্টর মিশ্রর সঙ্গে।

কথায় কথায় তাঁরা আমার পরিচয় পেয়ে ধরে বসলেন, আমাকে ম্যাজিক দেখাতেই হবে। কী আর করি? একটা থটরিডিং-জাতীয় খেলা দেখালাম তাঁদের।

একটা খাতার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তা চার ভাগে ভাগ করলাম। নব-পরিচিতদের বললাম এক-একটি দেশের নাম বলতে। সিনর কার্লো বললেন—ব্রেজিল। একটি স্লিপে আমি তা লিখে কাগজ মুড়ে রাখলাম। এমনি করে হের গুতেনবার্গ, মঁসিয়' মিলো ও শেখ গামাল যথাক্রমে জার্মানি, ফ্রান্স ও ইজিপ্টের নাম বললেন। আমিও আলাদা আলাদা স্লিপে তা লিখে মুড়ে নিলাম। এর পরে এই স্লিপগুলো রাখা যায় এমন একটি পাত্র খোঁজার জন্যে চলে গেলাম কামরা-সংলগ্ন বাথরুমে। বলা বাহুল্য, স্লিপগুলো ওদের সামনে টেবিলের উপরেই পড়ে রইলো। খুঁজে খুঁজে একটা প্লেট এনে হাজির করলাম। এই প্লেটের উপরে গুটানো স্লিপগুলো রেখে ওদের একজনকে বললাম, যে কোনও একটি স্লিপ তুলে নেবার জন্য। শেখ গামাল তুলে নিলেন একটি। দেশলাইর কাঠি জ্বালিয়ে আমি পুড়িয়ে ফেললাম বাকি স্লিপগুলো—ছাই হয়ে গেল তা। এবার ঐ ছাই একটু তুলে নিয়ে বাঁ হাতের কব্জির একটু উপরের দিকে ভেতরের পিঠে ঘষে নিলাম আচ্ছা করে। সবাই অবাক হয়ে দেখলেন, কব্জির উপরে লেখা ফুটে উঠেছে—'ব্রেজিল'। শেখ গামাল স্লিপটা খুললেন আমার অনুরোধে।

সবাই দেখে অবাক হলেন যে, ঐ স্লিপটার ভেতরেও লেখা আছে 'ব্রেজিল' কথাটা।

এখন শোন, কেমন করে এই মজার ম্যাজিকটা দেখিয়েছিলাম।

করেছিলাম কি জানো? চারজনে চার দেশের নাম বললে কী হবে। লেখার সময়ে আমি কিন্তু প্রত্যেকটি স্লিপেই লিখেছিলাম 'ব্রেজিল' কথাটা। এর পরে বাথরুমে গিয়ে পাত্র খোঁজার অছিলায় হাতের উপরে শুধু মুখ সাবানের কুচি ঘষে ব্রেজিল লিখেছিলাম। চারটি স্লিপেই লেখা ছিল ব্রেজিল। কাজেই যে স্লিপই তোলা হক না কেন, হাতে ব্রেজিল লেখা স্লিপ আসবেই আসবে।

বাকী তিনটে স্লিপে আগুন লাগানোতে তা হয়ে যায় ছাই। কারসাজির আর কোন প্রমাণই অবশিষ্ট থাকে না। হাতটা যখন সবার সামনে এগিয়ে দেওয়া যায়, তখন তাতে কোনও লেখার চিহ্নই থাকে না। কারণ, সাবানের দাগ দেখা যায় না এমনিভাবে। এই সাবানের দাগের উপরে ছাই ঘষে দিলে সাবানের আঠালো ভাবের জন্য ছাই-গুলো তাতে আটকে গিয়ে কালো লেখার সৃষ্টি হয়।

ভালো করে অভ্যাস করে নিয়ে যদি এ খেলা দেখাও, তবে খুব বাহবা পাবে দর্শকের কাছ থেকে।

গঙ্গার ধারে নির্জন একটা জায়গা বেছে নিয়ে আস্তানা গাড়লেন সাধু-মহারাজ। ধুনি জ্বলে উঠলো বটগাছের নীচে।

সাধু-মহারাজ রাত শেষ হতে-না-হতেই ঘুম থেকে ওঠেন, গঙ্গায় স্নান সেরে পুজোয় বসেন। পুজো শেষ হলে বসেন ধ্যানে। সেই ধ্যান ভাঙে ঠিক দুপুরে, সূর্য যখন মাথার ওপরে। তারপর চলে যান গঙ্গার তীর ধরে—কখনও এক ক্রোশ, কখনও বা দু-ক্রোশ। সঙ্গে থাকে ভক্ত-শিষ্য জোয়ান মাধব। সাধু-মহারাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে-ও চলে হেঁটে। বনে বনে ঘুরে, ফল-মূল সংগ্রহ করে গুরু-শিষ্য যখন নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসেন—সূর্য তখন পাটে নামে। সারা দিনরাতে সেই একবার মাত্র ফলাহার। অথচ, দুজনার স্বাস্থ্যের কি বাহার! সাধু-মহারাজের বয়স বোধকরি ষাটের ওপর—কিন্তু, চেহারা দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। চুল-দাড়িতে পাক ধরলেও, শরীরে পাক ধরেনি কোথাও। যেমন উঁচু-লম্বা স্বাস্থ্যবান তিনি, গায়ের রঙও তেমনি উজ্জ্বল তাঁর। চোখের দিকে তাকালেই মনে হয়, জ্যোতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। কণ্ঠস্বরও গুরুগম্ভীর।

সন্ধ্যা হতে-না-হতেই আবার ধ্যানে বসেন বৃদ্ধ সাধু। পাশে বসে ধুনির আগুন ঠিক-ভাবে জ্বালিয়ে রাখে শিষ্য মাধব। গঙ্গা থেকে ঘড়া ভর্তি করে জল তুলে আনে। কাঠকুটো লতা-পাতা কুড়িয়ে জড়ো করে। তারপর, সেও বসে পুজো-আর্চায়। দুপুর রাতে বালির ওপরে খড় বিছিয়ে ঘুমোন গুরু-শিষ্য। ধুনির আগুনটা কিন্তু ধিকি-ধিকি জ্বলতে থাকে সারা রাত ধরেই। সেদিকে তাকিয়ে বোধ করি আকাশের তারা-গুলোও অবাক হয়ে যায়। শরৎকালের নির্মল আকাশের নীচে, বটগাছের তলায়—গভীর নিদ্রায় মগ্ন হন সাধুবাবা আর তাঁর শিষ্য। নিদ্রা কোথায়, তাঁরা যেন তখনও ঈশ্বরের ধ্যানে আত্মহারা।

দু-চার দিন যেতে-না-যেতেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের গ্রামে। খবর রটে মুখে মুখে—হিমালয়ে বারো বছর তপস্যার পর দৈবজ্ঞ এক সাধুবাবা গঙ্গার তীরে ফুলডুংরিতে এসে আস্তানা গেড়েছেন। মানুষের চেহারা দেখেই তিনি তার ভূত-ভবিষ্যৎ সব নির্ভুল বলে দেন, মরা-মানুষও নাকি তাঁর মন্ত্রঃপূত জল পেয়ে বেঁচে ওঠে! ফলে, গাঁয়ের লোক দল বেঁধে ছোটে সেই-দিকে। ছেলে-বুড়ো, জোয়ান-মদ্দ, মেয়ে-ছেলে কেউ বাদ যায় না। বটগাছের তলায় যেন হাট বসে—সকাল থেকে সন্ধে।

কেউ বলে—বাবা হাতটা একবার দেখুন। কেউ বলে,—একটা শেকড়-টেকড় দিন সাধুজী, ঘরে ছেলেটা মরমর। কেউ বলে,—কি করলে টাকা ডবল করা যায় সেই মন্ত্রটা একবার বাৎলে দিন মহারাজ, আমি আপনার কেনা-গোলাম হয়ে থাকব। সাধু-মহারাজ শুনে হাসেন, আর বলেন—ভগবানকে ডাকো, তিনিই সবকিছু বাৎলে দেবেন! বলেই আবার ধ্যানে বসেন। লোকজনেরা বলাবলি করে—সময় না-হলে সাধুবাবা সঠিক কিছু বলবেন না। ভক্তি দেখাতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে—তবেই না অমন দৈবজ্ঞ ঋষির করুণা মিলবে।

সেই থেকে, যারা আসে তারা কেউ আনে ঘড়া ঘড়া দুধ, ঝুড়ি ঝুড়ি ফলমূল, থালা থালা মণ্ডা-মেঠাই। সাধুবাবার জন্যে কেউ কেউ আবার পেন্নামী আনে যার যেমন সাধ্য। শিষ্য মাধব বাধা দিলেও শোনে না কেউ। সাধু-মহারাজ আপত্তি করলেও, নিজেদের জিনিস-পত্র কেউই ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। বলে—ভক্তের দান কি ভগবান ফিরিয়ে নেন বাবা? আমরা বড় গরিব, যতটুকু সাধ্য তাই আপনার সেবায় দিচ্ছি। আমাদের অপরাধ নেবেন না, দোহাই মহারাজ! সাধুবাবা আর কি করেন? কেউ মনে দুঃখ পায় সেটা তিনি চান না। ভক্তের দান হাসিমুখেই গ্রহণ করেন। ভগবানকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ বিলিয়ে দেন সবাইকে।

খবরটা ক্রমশ গ্রাম ছাড়িয়ে শহরে গিয়ে পৌঁছায়। শহরের মানুষও এসে ভিড় করে গঙ্গার ধারে। সাধারণ মানুষ যেমন আসে, তেমনি আসে বড় মানুষের দল। সাধুবাবার পায়ের নীচে গড় করে সবাই; সিকি-দোয়ানির বদলে এবার থেকে মুঠো মুঠো রুপোর টাকা ছড়িয়ে পড়ে। দৈবজ্ঞ ঋষির করুণা আর কে না চায়?

সাধুবাবা ক্রমশই বড় চিন্তায় পড়েন।

"সে কী কথা বলছেন বাবা?"

তাঁর সাধন-ভজনের ব্যাঘাত ঘটে, ধ্যান-তপস্যা করা হয় দুঃসাধ্য। জনহীন গঙ্গার তীরে সকাল থেকে সন্ধে জন-কোলাহলে মুখর। ভূত-ভবিষ্যতের সঠিক হদিস দিতে চাইলেও, কেউ যেন সন্তুষ্ট হয়ে ঘরে ফিরতে চায় না। তারা চায়, কিসে বেশী টাকাকড়ি মিলবে, কী করলে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যাবে। ধনীরাও অনুরোধ করে মন্ত্রঃপূত কিছু-না-কিছু একটা দিতে—যাতে করে তারা আরও অনেক টাকা পাবে, বড়লোক থেকে আরও বড়লোক হবে। টাকা, টাকা, টাকা—সবাই চায় টাকার সন্ধান!

সন্ধ্যার পর, লোকেরা যখন বিদায় নিয়ে চলে যায়, সাধু-মহারাজ তখন শিষ্যকে ডেকে বলেন, "বল্ বেটা, এখন আমরা কী করি? এমন হলে তো আর এখানে থাকা যায় না। পুজো-আর্চা, ধ্যান-তপস্যা সব যে বন্ধ হবার জোগাড়! তার চেয়ে চল এখানকার আস্তানা উঠিয়ে ঐ বনে, লোকালয় থেকে দূরে। লোকজনদের তো আর কড়া কথা বলে তাড়াতে পারি না। ওরা আমার কথায় আঘাত পায়, সেটাও আমি চাই না।"

শিষ্য বলে, "সে কি কথা বলছেন বাবা? লোকের ভয়ে আমরা পালিয়ে যাব? তার চেয়ে এক কাজ করুন। বড়লোকেরা যখন আসবে তখন তাদের কাছ থেকে নারায়ণের সেবায় বেশী করে টাকা চেয়ে নিন। আর, সেই টাকা গরিবদের দিন ধার। দেখুন, কদিন বাদেই এ জায়গা আবার আগেকার মতো ফাঁকা হয়ে ওঠে কিনা!"

শিষ্যের কথায় খুশি হয়ে গুরু বললেন, "সাবাস্ বেটা, তোর বুদ্ধি আছে।"

পরদিন থেকে তাই হলো। বড়লোকদের কাছ থেকে রাশি রাশি টাকা চেয়ে নেন সাধুবাবা। পরে আবার সেই টাকাই গরিব লোকদের ধার দিতে শুরু করেন। বলেন, "পরের টাকা—এমনি তো আর বিলিয়ে দিতে পারি না! এখন তোমরা নিয়ে যাও, সুবিধে হলেই শোধ দিয়ে যেও। তোমাদের দুঃখ দূর হোক।"

কদিন যেতে-না-যেতেই গঙ্গার ধার আবার আগেকার মতো ফাঁকা। সাধুবাবাকে মোটা টাকা প্রণামী দিতে হবে ভেবে বড়লোকেরা আর সেদিকে যায় না, আর ধারের টাকা শোধ দিতে হবে মনে হতেই গরিবেরা আর সেদিকে পা বাড়ায় না!

শিষ্যের মুখে হাসি ফোটে।

সাধুবাবাও হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচেন। যারা সত্যিকারের ভক্ত তেমন দু-চারজন লোক আনাগোনা করলেও সাধুবাবার কোনো অসুবিধা হয় না তাতে। বরং, খুশিই হন তাদের সত্যিকারের ভক্তি দেখে। আবার পুজো-আর্চা চলে নিয়ম মতো, ধ্যান-তপস্যাও হয় বিনা বাধায়।

রাক্ষুসে গাছপালা

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গাছ মানুষের উপকারে লাগে, এই কথাই তো আমরা শুনে আসছি। আমাদের দেশে নানান্ ধরনের গাছ আছে। প্রায় প্রত্যেক গাছই কিছু না কিছু আমাদের উপকারে লাগে। কিন্তু গাছ মানুষের ক্ষতি করে—এটা শুনতে কেমন লাগে? পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এমন সব বিচিত্র গাছ আছে, যাদের অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারা। কেউ বা দেখতে অক্টোপাশের মতো, কেউ বোতলের মতো, কারও পাতা ছড়ির মতো লম্বা।

নানান্ জায়গার গাছ নিয়ে নানান্ রকমের গল্প আছে। শোনা যায়, অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে এমন সব গাছ আছে, যাদের ডাল-পালাগুলো পশুর থাবার মত, আর তার ডগায় লম্বা লম্বা খোঁচাওয়ালা কাঁটা। কোনও পথিক হয়ত ঘোড়ায় চড়ে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, আর দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গাছের কাছে এসে পড়ল, গাছটা তার থাবা দিয়ে পথিকটিকে চারদিক থেকে এমন করে জড়িয়ে ফেললো যে, কাঁটা ছাড়িয়ে সে আর বেরোবার পথ পেল না।

'ব্লাক বয়' বা কালোছেলে গাছ

তারপরও কিছু গাছ আছে অস্ট্রেলিয়ায়, যাদের প্রথমে দেখলেই মনে হবে রাক্ষুসে গাছ। কিন্তু সত্যি সত্যিই তারা কোন ক্ষতি করে না। এই গাছ-গুলোকেও কিন্তু ওই থাবাওয়ালা গাছের দলে ফেলা হয়। কারণটা হলো, ঠিক সন্ধে হলেই এদের চেহারা যায় বদলে। সারাদিন বেশ ভাল ছেলের মত থাকে গাছগুলো, কিন্তু সন্ধে হলেই রূপ পালটে ফেলে। বিরাট লম্বা গুঁড়ি, গায়ের রং মিশমিশে কালো, আর মাথার ওপর এক-ঝাঁকড়া পাতা। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'কালো ছেলে'। কোন পথিক বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ যদি গাছটার কাছে এসে পড়ে, ভয়ে আঁতকে উঠবে গাছটাকে দেখে।

আমরা তো মাংস খাই, কিন্তু গাছ মাংস খায় এটা অদ্ভুত, না? কিন্তু মাদাগাস্কার অঞ্চলে এমন গাছও আছে। ওই অঞ্চলের লোকেরা ওই গাছের নাম দিয়েছে মানুষ-খেকো তাল। দেখতে বিরাট বড় একটা আনারসের মত, পাতা-গুলো চটচটে আঠালাগানো ছড়ির

ধাঁধা নয়!

... আছে আঁকা ছবিতে

★ ★ ★

মত, আর অসংখ্য। অক্টোপাশের মত তারা লতিয়ে ওঠে। এই গাছগুলো মানুষ খায় বলে ওখানকার পিগমিরা ওদের পুজো করে। আমরা ঠাকুরের পুজো করে যেমন পাঁঠা বলি দিয়ে থাকি, ওরা তেমনি মাঝে মাঝে এক-একটা মেয়েকে উৎসর্গ করে গাছকে। গাছের কাছে মেয়েটিকে দিয়ে আসে আর তৎক্ষণাৎ গাছটি তার ডালপালা দিয়ে এমনভাবে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে যে, বাইরে থেকে তাকে আর দেখা যায় না। এক সপ্তাহ পরে গাছটার কাছে এলে দেখা যায়, সেই মেয়েটির হাড়গুলি ছাড়া গায়ের সমস্ত মাংস গাছটা খেয়ে ফেলেছে। হাড়গুলো পড়ে আছে গাছের তলায়।

অস্ট্রেলিয়াতে আর এক রকমের গাছ আছে বাওবাব্ বা বোতল গাছ। খানিকটা দেখতে ঠিক বিরাট বড় একটা বোতলের মত। এই বোতলের মত গুঁড়ির ভিতর ওরা খাবার, জল—সব ভর্তি করে রাখে। সময়মত একটু একটু করে খায়। এই গাছগুলোকে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো গাছ বলা হয়।

কুইন্সল্যান্ড ও নিউ সাউথওয়েলসে এক রকমের গাছ আছে, যাদের মানুষ ছুঁতে ভয় করে। এই গাছগুলো লম্বায় হয় প্রায় একশো ফুট আর গুঁড়িগুলো মোটা হয়

'বাওবাব' বা বোতল-গাছ

চার ফুটের মত। পাতাগুলো খুব বড় বড়, পুরু, আর প্রায় বারো ইঞ্চির মতো লম্বা। সবচেয়ে মজা হলো, গাছগুলোর পাতার ওপরে অসংখ্য রোঁয়া থাকে—যার মধ্যে ওরা সাংঘাতিক রকমের বিষ রেখে দেয় যত্ন করে। যে বিষ মানুষে বা কোন জন্তুর গায়ে লাগলে তারা মরে যায়। এই পাতার ডগাগুলো ছুঁলে, যদি কোন-রকমে মানুষের গায়ে একবার ফুটে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয়।

আমাদের দেশে আলোকলতা বলে এক-রকমের লতানে গাছ আছে। যারা কোনও গাছকে আশ্রয় করে বেড়ে চলে। হলুদ রংএর সরু-সরু লতা। কুইন্সল্যান্ড-এ এই ধরনের গাছ আছে—যারা বীজ থেকে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য ডালপালা নিয়ে লতিয়ে ওঠে এবং সামনের কোনও গাছকে আশ্রয় করে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলে। অল্পদিনের মধ্যেই সেই গাছটাকে মেরে ফেলে। তখন আবার তারা নতুন শিকারের সন্ধান করে।

এই সব গাছ সত্যিই মানুষের ক্ষতি-কারক, কিন্তু তবুও অন্য সব গাছের মত এরা বছরের পর বছর নিজেদের জায়গা দখল করে বসে থাকে।

গাড়ড়ু-গাধা

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

এক যে ছিলো বোকা-হাঁদা।
সবাই বলে, গাড্ডু-গাধা।
কাজকর্ম করবে সে ঠিক,
আগাগোড়া হিসেব সঠিক।
তবে কাজের ধারণ-ধরন
নয়কো তোমার-আমার মতন।
শেষটাকে সে করবে আগে।
শুরুর কথা বললে রাগে।

ঘর তৈরি করতে হলে
সবার আগে ছাদটা ঢালে।
কারণ জানো? বিষ্টি পড়ে
দেয়ালে নয়, ঘরের চালে।

কোথাও যেতে সর্বদা সে
দরজা জোড়া সঙ্গে নেবে।
রাত্রে যদি চোরটি আসে?
দরজা এ'টে রুখতে হবে।

আরেকটি তার কাণ্ড আজব,-
তোমরা শুনে হাসবে জানি ঃ
দেয়াল জুড়ে পড়লে ছায়া,
ঘষবে বসে দেয়ালখান।

সবার সেরা কীর্তি তাহার
বলছি শোনো কাছে এসে ঃ
সবাই যখন কাঁদে তখন
গাড্ডু-গাধা উঠবে হেসে।
আবার যখন সবাই হাসে,
তানধরে কেউ গা-মা-পা-ধা,
গাড্ডু তখন হাঁউ-মাউ-কাঁউ
উঠবে কে'দে—এমনি হাঁদা।

সম্বর্ধনা

। পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

ন্যাড়া পাল নাকি যাবে বেলতলা
শিখতে কী এক কল।
কেলাব ঘরেতে জল্পনা করে
গাঁয়ের ছেলের দল—
"বিদেশে গেলে বা ঘুরে এলে কেউ,
কিংবা চাকরী পেলে,
অথবা বয়েস পঞ্চাশ ষাট,
সত্তর হয়ে গেলে,
নয়তো ভোটের লড়াইয়েতে নেমে
কেউ যদি যায় জিতে
চাঁদা করে সভা ডেকে তাকে হয়
সম্বর্ধনা দিতে।"
বললে পণ্ডা—"ভজহরি তোরা,
নেই কিছুতেই সাড়া!
বিলেত না যাক, পাকা ছ'টি মাস
হবে সে তো গ্রাম-ছাড়া।
যা করেই হোক, সম্বর্ধনা
দিতে হবে ন্যাড়াদাকে।"
সেদিন বিকালে স্যাওড়াতলায়
তাই তারা সভা ডাকে।

পাড়ার সকলে জুটেছে সেখানে,
ভিন্ন গাঁয়েরও জন।
দেসো ময়রার খুড়তুতো ভাই
গাইলো উদ্বোধন।
কানাই মুদীর ছোটোছেলে ঘ্যাঁচা
ন্যাড়াকে পরালে মালা।
গদ্যে পদ্যে তারপরে যত
শুভেচ্ছা হলো ঢালা।
প্রধান অতিথি প্যালারাম দাস
বলেন ভাষণ শেষে—
"কাজ শিখে এসে বাবা নেড়ু, তুমি
বসবাস করো দেশে।"
সভাপতির অভিভাষণে বলেন
দোলগোবিন্দ মাল—
"করুক উজ্জ্বল আমাদের মুখ
কল শিখে ন্যাড়া পাল।
বেলতলা থেকে বিলেত আমেরিকা
ঘুরে আসতেও পারে।
আজকাল শুনি, হরে-নরে-যোদো
রোজ কত পাড়ি মারে।"
সভা শেষ হলো হাততালি দিয়ে,
'থরুবায়ু' হলে গান।
তারপর ন্যাড়া পালেরই খরচে
সকলের জলপান।

হাঁস মুরগীর লড়াই

শ্রীপরিতোষ কুমার চন্দ্র

মুরগির লড়াই তোমরা হয়তো অনেকেই দেখেছ। কিন্তু আমি জোর করেই বলতে পারি, তোমাদের কেউই হাঁস-ম্বরগির লড়াই দেখনি। তোমাদের বাড়িতেই এই দ্বটো পাখির লড়াই লাগিয়ে দিলে কেমন হয়? কী? —লাগিয়ে দেবে নাকি? তাহলে চট্‌পট্‌ নীচের ফর্দ মতো জিনিস কটা যোগাড় করে ফেলো:—

(১) হাঁস ও ম্বরগির ছবি দ্বটো ধরে এমন মাপের এক পিস্‌ পাতলা পিচবোর্ড। (২) সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি চওড়া বেশ মোটা ও শক্ত পিচবোর্ডের দ্বটো লম্বা পিস্‌। ৪নং ছবিটা দেখো। (এই পিস্‌ দ্বটোর একটা পিঠ যদি কালো রং করতে পারো তবে ভালো হয়)। (৩) কাঁচি: (৪) ময়দার লেই বা গ'দের আঠা। (৫) টোয়াইন বা মোটা যে কোনো স্বতো। (৬) শিরীষ কাগজ। (৭) হাঁস ও ম্বরগির ছবি দ্বটো যদি রং করতে চাও, তবে তোমার পছন্দ মতো জল-রং ও তুলি।

প্রথমেই বই থেকে হাঁস ও ম্বরগির ছবি দ্বটো কাঁচি দিয়ে চৌকো করে কেটে নিয়ে এ দ্বটোর জন্যে নির্দিষ্ট পিচবোর্ডটার গায়ে আঠা দিয়ে জ্বড়ে দাও ও একটা ভারী বইয়ের তলায় চাপা দিয়ে রেখে দাও। এটা বাইরে ফেলে রাখলে দ্বমড়ে বেঁকে যাবে। শ্বকিয়ে গেলে এটা বের করে হাঁস ও ম্বরগির ছবি দ্বটোর ধার বরাবর কাঁচি চালিয়ে আলাদা আলাদা করে কেটে ফেলো।

এবারে পিচবোর্ডের লম্বা পিস্‌ দ্বটোতে শিরীষ কাগজ ঘষে বেশ করে প্লেন করে নাও, যেন কোথাও খোঁচ না থাকে। শিরীষ কাগজ ঘষা হয়ে গেলে পিস্‌ দ্বটো পাশা-পাশি সমান্তরালে রেখে দ্বটোরই এক দিকের প্রান্ত থেকে ১½ ইঞ্চি দ্বরে এবং অপর দ্বটো প্রান্ত থেকে ½ ইঞ্চি দ্বরে মোটা খাতা সেলাই করা ছ্বঁচ দিয়ে একটা করে ফ্বটো করো। ৪নং ছবিটা আবার দেখ।

এখন সমান একটা জায়গায় হাঁস ও ম্বরগির ছবি দ্বটো উপ্বড় করে রেখে তার ওপরে পিচবোর্ডের লম্বা পিস্‌ দ্বটো সিকি ইঞ্চি ফাঁক রেখে সমান্তরালে পাশাপাশি এমনভাবে রাখো যাতে একটা পিসের এক প্রান্তের ১½ ইঞ্চি দ্বরের ফ্বটোটার ঠিক নীচেই অন্য পিস্‌টার ½ ইঞ্চি দ্বরের ফ্বটোটা থাকে, এবং ঠিক তেমনি অন্যদিকে ½ ইঞ্চি ফ্বটোটার ঠিক নীচেই অন্য পিসটার ১½ ইঞ্চি দ্বরের ফ্বটোটা থাকে। খেয়াল রেখো, হাঁস ও ম্বরগির পাগ্বলোর ঠিক মাঝখানে নীচের পিসের ফ্বটো দ্বটো রাখতে হবে। ৩নং ছবিটা দেখলেই সব কিছ্বই পরিষ্কার-ভাবে ব্বঝতে পারবে। যদি পিস দ্বটোর এক পিঠ রং করে থাকো তবে রং করা দিকটা নীচের দিকে অর্থাৎ ছবির সামনের দিকে করে রাখতে হবে।

এবার এক হাত দিয়ে এগ্বলো সাবধানে চেপে ধরে রেখে পিস দ্বটোর চারটে ফ্বটোরই ভেতর দিয়ে ছ্বঁচ ঢ্বকিয়ে হাঁস ও ম্বরগির পা ও গা এফোঁড় ওফোঁড় করে ফ্বটো করে দাও। তারপর এই ফ্বটোগ্বলোর এপাশ থেকে টোয়াইন স্বতো ঢ্বকিয়ে ওপাশে বের করে দ্বপাশেই গেরো দিয়ে এমন ভাবে বেঁধে দাও, যাতে পিস্‌ দ্বটোর গায়ে হাঁস ও ম্বরগির ছবি দ্বটো বেশ টাইট্‌ হয়ে সেঁটে লেগে থাকে।

এবার এটা তুলে নিয়ে তোমার ইচ্ছে মতো তোমার দিকে বা তোমার বন্ধ্বদের দিকে হাঁস ও ম্বরগির ছবির সোজা দিকটা রেখে এক হাতের দ্বটো আঙ্বল দিয়ে ওপরের পিস্‌টার বেশী-বেরিয়ে থাকা প্রান্তটা ধরে অন্য হাতের দ্বটো আঙ্বল দিয়ে নীচের পিসেরও বেশী বেরিয়ে থাকা প্রান্তটা ধরে একবার বাঁ দিকে আর একবার ডান দিকে বারবার ঠেল ও টানো,—দেখবে হাঁস ও ম্বরগি দ্বটো দিব্যি লড়াই করবার কায়দায় কেমন পরস্পরকে ঠোকরাতে চাচ্ছে; কিন্তু কিছ্বতেই তা পারছে না। কেবলই মাটিতে ঠোকর মারছে।
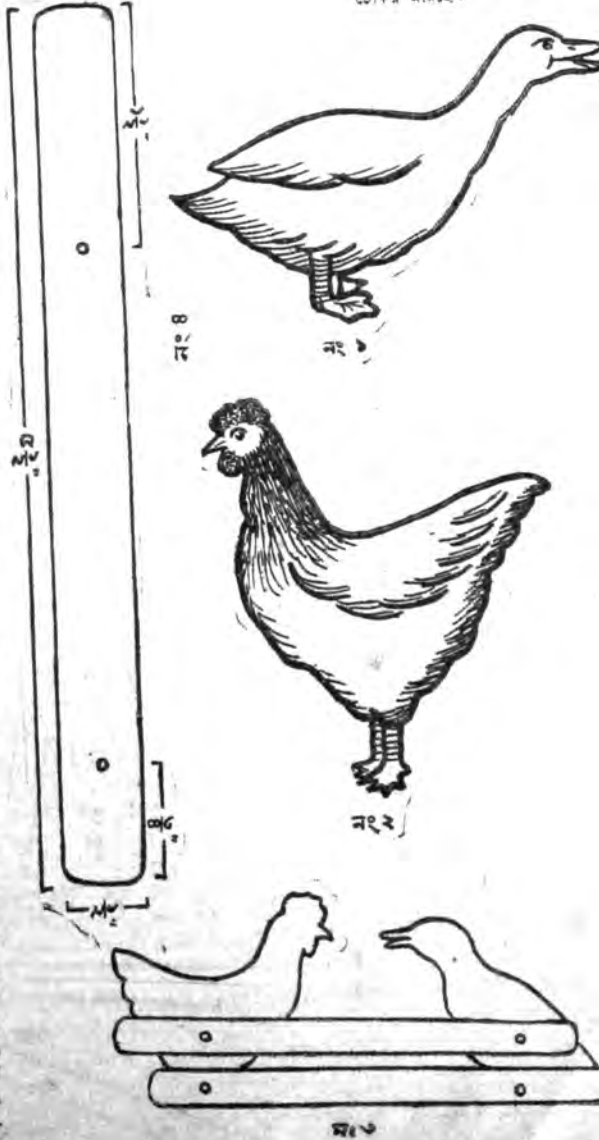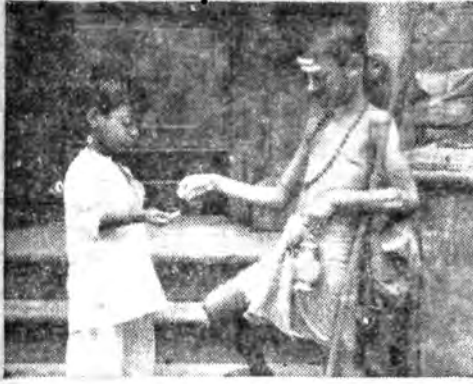
★ পুতুল-বিলু ★

পয়সা পেয়ে সাধু খুশি, বিলুর হাতে বড়ি দিলে,
বললে—'ইচ্ছা পূরণ হোবে: এইটা তুমি খাইলে গিলে।'

ঘরে গিয়ে বড়ি গিলে, পুষিটাকে সঙ্গে নিয়ে,
চোখ বুজে কী ভাবলো বিলু: শুলো বুকে হাতটি দিয়ে।

'টিক্-টিক্-টিক্, ভুল করেছ ঠিক!' হঠাৎ কানে আসে
বিলু দেখে—"ওমা! সে যে ছোট্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ঘড়ির পাশে!
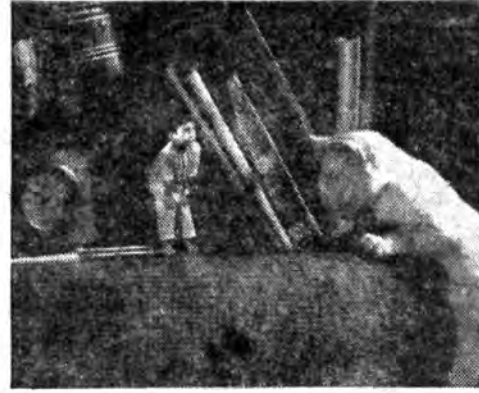
ভাবল বিলু—'কেইবা তাকে করলে ছোটো, তুলল এনে র‍্যাকে!"
বই, ঘড়ি, পুষি সব যে বিরাট! অবাক চোখে দ্যাখে।
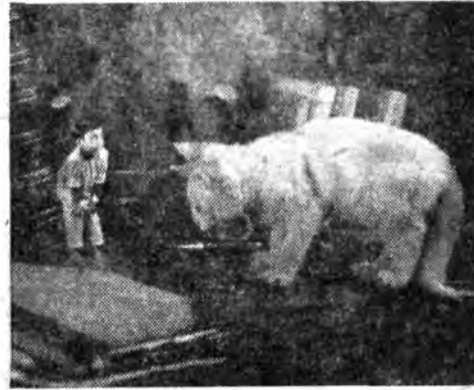
বিলুর বিপদ দেখে, লাফিয়ে পুষি উঠলো র‍্যাকের পরে
বললে—'পুতুল হওয়ার ইচ্ছে যেমন', হাঁকলো 'মিয়াঁও' ক'রে।

'আঁ-আঁ-পুষিটা বাঘ!' চেঁচায় বিলু জোরে
ছুটে এসে দিদি জাগায়—'ঐ তো পুষি ওরে।

ছড়া—শ্রীবিমল ঘোষ   ফটো—রেবন্ত ঘোষ

তখন শরৎকাল। বর্ষার শেষে আকাশ পরিষ্কার। বন্যার জল কমতির দিকে। মাঠে কাঁচ ধানের শিষের সমারোহ। সকাল বেলায় শাপলা ফুলের মেলা। রাতের আকাশ তারার মালায় উজ্জ্বল। বাতাস শিউলির গন্ধে মদির। আউশ ধানের গোলা তখনও শূন্য হয়নি। নতুন ফসলের শুভ আভাস। অন্নচিন্তা কম হলেই অন্যচিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। নতুন চাষের শুরুতে পাশের জমির আল-ভাঙা নিয়ে যখন নায়েবের তোয়াজ করা বা থানা পুলিশ কোর্ট কাছারি করার সময় আসেনি, তখন দেশকে চেনা-জানার ও সেবা করার মহৎ ব্রত পালন করলে মন্দ হয় না, ভাবলেন শহুরে বাবুরা। বললেন চলো গ্রামে। ডাকো তাদের যারা অনুন্নতকে উন্নত করতে চায়, গ্রামে শিক্ষার আলো চায় জ্বালাতে। কিন্তু এই 'সেবক'দের তোয়াজ করবে কে? ডাকো গ্রামের মধ্যে যারা দু একজন বাবু আছে। বাবু মানে শিক্ষিত অর্থাৎ মাইনর পাশ দিয়েছে। কি আর করি? মাথা পেতে দিলুম। কলকাতা থেকে বাবুরা গিয়েছেন সপরিবারে। গ্রামোন্নয়ন, বিদ্যা-প্রচার ত হবেই, সেই সঙ্গে গুণ্টিসুদ্ধ সকলকে চার দেওয়াল থেকে বের করে একটু হাওয়া পরিবর্তন করিয়ে আনাও হবে। সুযোগ বুঝে আমরাও উঠি-পড়ি করে লেগে গেলাম আমাদের বিদ্যাগুলি জাহির করতে। অনুষ্ঠানের অন্ত নেই। কাব্যগন্ধী নাম সব। সকালে 'মুক্তবায়ু সেবন' অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে পাড়ার কাদা ভেঙে অলিগলি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এলুম। তাঁরাও বঙ্গপল্লীর অনবদ্য রূপ দেখে মহা উল্লসিত। প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেমন খড়ের ঘর। মাটির দাওয়া। ভিজে মেঝে, পাটকাঠির বেড়া। কাকের কা কা রব। উলঙ্গ শিশু। কেমন ঘরের ভেতর নির্ভেজাল সূর্যালোক ঢোকে। ঘুঁটের জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না, কেমন শান্ত থেয়ে সব ক্রমেই শান্ত হয়ে আসছে। এই সব দেখে তাঁরা ত মহা উল্লসিত। আমরাও সেবক ব্যাজ ধারণ করে নিজেদের ধন্য মনে করতে লাগলাম।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান "অবগাহন ও সন্তরণ"। সে যে কী দৃশ্য তা কি আর বলে বোঝাতে পারব? বাবুদের ও তাঁদের সঙ্গে দিদি-মণি ও মা-জননীদের নিয়ে ত ঘাটে হাজির হলাম। বাবুরা আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে কোমর অবধি জলের নীচে যেতেই গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে এলোপাতাড়ি হাত ছুঁড়তে লাগলেন। পিছন ফিরে দেখি যে দিদিমণিরা হাঁটুজলেই হাবুডুবু খাচ্ছেন। ডুবতে কতক্ষণ! উঠে আসতেই হাসি হুল্লোড়ের মধ্যে শুনলুম, "কি সুন্দর সাঁতরেছে লাটু", "পাঁটলী আর একটু হলে ডুবত আর কি?" "গাবুদা শরীরটা কেমন ফ্রেশ মনে হচ্ছে?" ইত্যাদি। আমরাও অবশ্য এই সুযোগে সাঁতারে বাহাদুরী নিতে কসুর করিনি।

তৃতীয় অনুষ্ঠান "নৌকা-বিহার", অর্থাৎ বর্ষণ ক্ষান্ত মেঘমুক্ত নির্মল নীল

দূরদৃষ্টি — আলোকচিত্রী : শ্রীশম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়

চাঁদোয়ার নীচে এবং স্রোতহীন গাঢ়নীল জলের উপর দেশী মিস্ত্রীর তৈরি ডিঙ্গি নৌকার পাটাতনের উপর বসে ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা বঙ্গ প্রকৃতির দৃশ্য অবলোকন। ব্যাপারটি অনুধাবন করে আমরা আধ-ময়লা গেঞ্জি গায়ে, মালকোচা দিয়ে কাপড় এ'টে কাঠের বৈঠা এবং বাঁশের লগি হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে অতিথিদের সাদর আহ্বান জানালুম। কোন কোন দাদা ত আমাদের অনুসরণ করতে গিয়ে পাটাতনের ভিতর ঢুকে গেলেন। উপর থেকে আহা, উহু, হা-হা, হি-হি ইত্যাদি হৈ চৈ ম্বারা ঐ সব কৃতী নৌকাচালকদের বাহবা বর্ষণ চলতে থাকল। অন্য যাত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই কারো কাঁধে ভর দিয়ে, হামাগুড়ি হয়ে এবং চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ নিয়ে নৌকায় উঠে প্রত্যেকে প্রত্যেকের যথাসম্ভব কাছে বসে পড়লেন। ধাক্কা খেয়ে নৌকা যখন জলে ভেসেছে তখন আর একদফা ভীতি বিহ্বল চিৎকার এবং জড়াজড়ি করে ডিঙ্গি নৌকা ডোবাবার উপক্রম। যা হক নৌকার টাল সামলানর পর ক্রমে সকলে ধাতস্থ হলেন। মণিদা তাঁদের সবার অনুরোধে পড়তে শুরু করলেন "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ"। প্রত্যেকের জন্যে শাপলার মালা তৈরি করা হল এবং দিদিমণিরা মাথায় গু'জলেন সদ্যফোটা শালুক ফুল, প্রায় ডজন খানেক করে। এবার ফেরবার পালা। মণ্টুদা, গাবুদা নৌকার মাঝখানে বসেই চতুর্ভুজ হয়ে দিদিমণিদের বৈঠা চালনা শিক্ষা দিয়ে একেবারে সার্টি-ফিকেট নিয়ে ফেললেন। ঘাটে এসে নৌকা লাগানোর পর আমাদের আর পায় কে? বুঝতেই পারছেন আমাদের মত বীর-পুঙ্গবদের তাঁদের কাপড় ধোয়া, জুতোর কাদা ছাড়ানো ইত্যাদি সব কাজেই দরকার। এহেন পদমর্যাদা দেখে মূঢ় গ্রামবাসী বিমূঢ় হয়ে শুধু আমাদের তারিফ ছাড়া আর কি করতে পারে। ওদিকে আশপাশের গ্রাম প্রধানদের সঙ্গে উন্নতি বিধায়িনী সমিতির সভা সমাপ্ত হয়েছে।

তার পরের অনুষ্ঠান "ভোজ সম্মিলনী"। ভিজে মাটির উপরে বাঁশের অল্প পরিসর পাটাতন করে বাঁশের খুঁটির উপর বসবার জায়গা এবং ডাইনিং টেবিল করা হয়েছে। আমরা স্থানীয় ছেলেমেয়েরাই পরিবেষক। মেয়েরা ভাঁড়ার থেকে পাত্রভর্তি ভোজ্যবস্তু আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে এবং আমরা পরি-বেষণ করে চলেছি। অবশ্য তাড়াতাড়িতে কেউ লেবু পাননি, কারও পাতায় নুন দেওয়া হয়নি, ডাল দিয়ে ফিরতে না ফিরতে ভাত শেষ হচ্ছে, একজনকে চাটনি দিতে আর-একজন বেগুন ভাজা চেয়ে বসছে। ব্যস্ততার শেষ নেই। একবার ভিজে মাটিতে পা পিছলে গিয়ে ডালের হাঁড়ি আমার গায়ের উপরই পড়ল। কিন্তু তাই কি দেখবার সময়। এদিকে এক দিদিমণি যে লেবু চাইছেন। ভাবলেশহীন মুখে উঠেই চিৎকার করতে করতে ছুটেছি, "বিনু, বিনু, শিগগির একটু চাটনি দাও।" সেটা হাতে নিয়ে আবার "বিনু-বিনু, মাছের ঝোলটি এগিয়ে নিয়ে এস।"

এর মধ্যে তৈরি হয়ে বাবুদের আশে পাশে ঘুর ঘুর করছি এবং উৎসুক নেত্রে তাঁদের মুখের দিকে তাকাচ্ছি পরবর্তী অনুষ্ঠানের নির্দেশের জন্যে। শুনলাম এবার অদ্যকার শেষ অনুষ্ঠান শুরু হবে—"স্বপ্নায়োজন"।

এহেন অনুষ্ঠানের নাম শুনে ত চক্ষু চড়ক গাছ। বাবুরা কষ্ট করে স্বপ্ন দেখবেন, তার আয়োজন আমরা কী করে করব! নিজেরা কোন পথ দেখতে না পেয়ে নতুন কিছু দেখবার জন্য উন্মুখ হচ্ছি, এমন সময় যেন হঠাৎ গাবুদা আমাকে আবিষ্কার করে বললেন, "হ্যালো, ইয়ংম্যান, মুষড়ে পড়েছ নাকি? বিছানা-টিছানাগুলো শোবার ঘরে নিয়ে পেড়ে ফেলো ত?" এতক্ষণে বোঝা গেল। অনুষ্ঠানের নামকরণ দেখেই বোঝা উচিত ছিল। যা হক তাদের শোবার ঘরের নির্দেশ দিয়ে লাইব্রেরী থেকে ট্রেনের ধুলো আর ছারপোকা ভর্তি হোল্ডঅল ঘাড়ে করে স্কুল ঘরে হাজির হলুম। ইতিমধ্যে সবাই সেখানে হাজির হয়ে স্থান নির্বাচনে ব্যস্ত। চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে পার্টিশান করে মেয়েদের ও পুরুষদের আলাদা শোবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বাবুদের সময়-জ্ঞান দেখে বিস্মর বোধ করছিলাম। প্রথমেই গাবুদার বিছানা খুলে লম্বা করে ফেললাম। ভাঁজ খুলে উপরে মোড়া দুগ্ধফেননিভ চাদরটার মাঝামাঝি ধরে টান দিতেই লালুদি কোত্থেকে হাঁহাঁ করে এসে বললেন, "থাক ভাই থাক, ওসব গাবুদাই ঠিক করে নেবেন। এখন বিশ্রাম নাও গিয়ে, খাওয়া হয়েছে?" খাওয়া অবশ্য তখনও হয়নি, তবু যেন লালুদির এত দরদে আবিষ্ট হয়ে গেলাম। খুশী হয়ে নীচে নামতে নামতে শুনলুম গাবুদার অনুযোগ, "তুমি কি বলত লালী, বিছানাটি পেতে দিলে দিব্যি শুয়ে পড়া যেত, দিলে সব ভণ্ডুল করে।" উত্তরে লালুদি যা বললেন, তা শুনে ঘাড়-হে'ট করে দৌড়ে পালাতে বাধ্য হলুম। লালুদি বলছিলেন, "ওঃ তাহলে ত বড় অন্যায় করেছি! আচ্ছা গাবুদা পাড়াগাঁয়ে এসে একেবারে জংলী হয়ে গেছ নাকি? আমার দিকে অত না তাকিয়ে চাদরে দেখ পচা কাদা রঙের পঞ্চাঙ্গুলির জোড়া থাবোল।"

ঘাটে এসে হাত ধুয়ে ফেললুম। হোল্ড-অলের গায়ে ট্রেনের ধুলো আর নৌকার কাদার সমন্বয়ে এই অপূর্ব রঙের সৃষ্টি করেছিল। ঠিক করলাম আর এসব বাবুদের পাশেও ঘে'ষব না।

কিন্তু আমি ঠিক করলে কি হবে, শহুরে বাবুরা কি গ্রামবাসীদের রেহাই দেবেন? পিকনিক করার মেজাজ এলেই যে তাঁরা গ্রামের দিকে পা বাড়ান—গ্রামোন্নয়ন বা অমনি কোন নামে।

শেষ পর্যন্ত সীয়াশরণজীকেই আসতে হল।

লাইন-বাবুরা এখানে আসতে চায় না। কিসের টানেই বা আসবে!

এখানে মানুষ বলতে বিলাসপুরী কুলীকামিন। তাদের সাময়িক আস্তানা হিসেবে গুটিকতক হোগলার ঝুপড়ি আর চটের তাঁবু।

এখান থেকে আধ মাইলের মধ্যে সীমান্ত। সীমান্ত বরাবর রেলের লাইন বসাবার কাজ চলছে।

• রেলের লাইন, ভাঙা পাথর আর স্লিপার স্তূপাকার হয়ে আছে।

চারপাশে ধু-ধু নিষ্ফলা মাঠ, উঁচুনিচু কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি। নোনা মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলে আছে কিছু ন্যাড়া শিমুল আর রুগ্ন চেহারার কয়েকটা পলাশ।

এ সবও বাধা হত না। লাইন-বাবুরা হয়ত আসত। যদি ফালতু রোজগারের ভরসা থাকত। কিন্তু তার উপায় নেই।

এখানে আসার নাম শুনেই লাইনবাবুরা ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বসল।

অগত্যা সীয়াশরণজীকেই রওনা হতে হল। সীয়াশরণজীও লাইন-বাবু অর্থাৎ লাইন-ইনস্পেক্টর।

সীয়াশরণজী যখন এসে পৌঁছলেন, তখন আকাশে গলা কাঁসার রঙ ধরেছে। সে দিকে তাকানো যায় না। তাকালে চোখ ঝলসে যাবে। আকাশটা যেন পুড়ে পুড়ে গলে গলে নীচে ঝরে পড়ছে।

বিশ মাইল ট্রলিতে এসেছেন। সীয়াশরণজীর মনে হল, এইমাত্র একটা আগুনের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এলেন। মনে হল, রোদের স্যাকা খেতে খেতে চামড়া মাংস কুঁকড়ে কুঁকড়ে গিয়েছে।

আগে থেকেই খবর দেওয়া হয়েছিল। সীয়াশরণজীর জন্য আলাদা একটা তাঁবুর বন্দোবস্ত হয়েছে।

ট্রলি থেকে নামতেই কুলীদের সর্দার তাঁকে তাঁবুতে নিয়ে গেল। কোন দিকে তাকাবার মত অবস্থা নয় সীয়াশরণজীর। সিধা বাঁশের মাচানে দেহটাকে সঁপে আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলেন।

কুলীদের সর্দার বলল, "তখলিফ হচ্ছে ইনাসপিটারজী?"

অস্ফুট শব্দ করলেন সীয়াশরণজী। কী বললেন, ঠিক বোঝা গেল না।

সর্দার তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই একটি কামিনকে সঙ্গে নিয়ে আবার এল। ডাকল, "ইনাসপিটারজী!"

চোখ বুজেই সীয়াশরণজী বললেন, "হাঁ—"

"রতিয়াকে এনেছি। আপনার তখলিফ হচ্ছে। রতিয়া থোড়া হাওয়া করুক।"

সীয়াশরণজী এবার জবাব দিলেন না। চোখও মেললেন না।

এটা কী তিথি কে জানে! সন্ধের ঠিক পরে পরেই চাঁদ দেখা দিল। ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নায় কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি বিভোর হয়ে আছে। আকাশটা আশ্চর্য নীল, আশ্চর্য স্নিগ্ধ। কে বলবে দুপুরে এই আকাশটাই গলা কাঁসার রঙ ধরেছিল!

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে।

ঘোর-ঘোর আচ্ছন্ন ভাব অনেকটা কেটে গিয়েছে। শরীরটা জুড়িয়েছে। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে উঠে বসেছেন সীয়াশরণজী।

দুপুরে তাঁবুতে ঢুকেই শুয়ে পড়েছিলেন। তাঁবুর ভিতরকার কিছুই দেখেননি। এখন সীয়াশরণজী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলছে।

তাঁবুতে আসবাব বলতে দুটি বাঁশের মাচান, একটি মাটির সোরাই আর নারকেল পাতার খান-দুই পাখা।

বাইরে একটা গলা পাওয়া গেল, "অন্দর আসব জী?"

জবাবের অপেক্ষা না করেই একটি কামিন ঘরে ঢুকল। তার হাতে তিনটে পিতলের বাসন।

প্রথমে খেয়াল করেননি সীয়াশরণজী। উদাসীন গলায় বললেন, "তুই কে?"

"আমি রতিয়া। তামাম দিন আপনাকে বাতাস করলাম। এখন পুছছেন আমি কে!"

সীয়াশরণজীর মনে পড়ল। দুপুরে সেই ঘোর-ঘোর আচ্ছন্ন অবস্থায় সর্দারের মুখে রতিয়ার নাম শুনেছিলেন বটে।

পিতলের বাসন তিনটে নামিয়ে তেজী লণ্ঠনটা উসকে জোরালো করল রতিয়া।

একটু আগে উদাসীন অন্যমনস্কের মত কথা বলছিলেন সীয়াশরণজী। জোরালো আলোতে রতিয়ার দিকে হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন।

সুঠাম শরীর। চকচকে তামার মত চামড়ার রঙ। কাঁধ থেকে দুটো নিটোল, মসৃণ, নগ্ন হাত নেমে গিয়েছে। সুপুষ্ট শরীর, খাটো কাপড়ে বাগ মানে না। বিড়ালীর মত কটা চোখ। জোড়া ভুরুর মাঝখানে কালো উল্কিতে সাপ আঁকা। হাঁটু পর্যন্ত আঁটো কাপড়। তারপর উদাস পা। হাতে রুপার কাঙন, পায়ে গুজরি-পঞ্চম। সারা দেহে এক ধরনের উগ্র বন্যতা।

রতিয়া বলল, "যে ক' রোজ থাকবেন, সর্দার আমাকে আপনার দেখাশোনা করতে বলেছে। রোটি-ভাজি পাকিয়ে দিতে বলেছে।"

পিতলের বাসনগুলো দেখিয়ে বলল। "এই আপনার রাতের খানা—"

"ঠিক আছে, তুই এখন যা।"

"আপনার বিস্তারা পেতে দিয়ে যাই।"

"দরকার নেই। আমিই পেতে নেব। তুই এখন যা।"

একরকম তাড়া দিয়েই তাঁবু থেকে রতিয়াকে বার করে দিলেন সীয়াশরণজী।

যাবার আগে রতিয়া বলল, "কাল ফির আসব ইনাসপিটারজী।"

বলার পর একটু হাসল রতিয়া। তিনটে

চোখা ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তারপর চিকন দুটি নিটোল পায়ের ছন্দ বাজিয়ে চলে গেল।

পরের দিন সকাল থেকেই কাজ শুরু হল।

কাজ আর কী! সীমান্ত-বরাবর রেলের লাইন আর স্লিপার পাতা হচ্ছে। সিগন্যাল-পোস্ট, সিগন্যাল-পুলি বসানো হচ্ছে। এই-সবের ইন্সপেকসন অর্থাৎ তদারকি করা।

বিলাসপুরী কুলীরা ভারী ভারী লোহার লাইন টানে। আর হাঁকে, "মারে জ—জো—য়া—ন্—ন্—"

"হাঁইও—"

তাদের ঘামে-মাজা পিঠ মুখ রোদে চক-চক করে।

দুপুরের আগে আগেই কাজ শেষ হয়ে যায়।

সেই সকাল থেকেই মহড়া চলে। রোদের তাত বাড়তে বাড়তে এক সময় আকাশে গলা কাঁসার রঙ ধরে। কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ির উপর দিয়ে লু ছুটে যায়। অনেক—অনেকদূরে আকাশ যেখানে ধনু-রেখায় নেমে গিয়েছে, ঠিক সেইখানে জিল-জিল করে আগুনের একটা হল্কা কাঁপতে থাকে।

এ-বেলার মত কাজ চুকল। বিকেলের পর যখন ঝিরঝিরে, ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি জুড়তে শুরু করবে, আবার কাজ আরম্ভ হবে।

সীয়াশরণজী তাঁবুতে ফিরলেন।

রতিয়া স্নানের জল আর দুপুরের খাবার রেখে গিয়েছে।

রতিয়া ছিল না। না থাকাতে মনে মনে স্বস্তিই পেলেন সীয়াশরণজী।

ধীরেসুস্থে স্নান সেরে খেতে বসেই চমকে উঠলেন। পিতলের থালায় রোটি আর মাংস রেখে গিয়েছে রতিয়া। থালাটা ঠেলে উঠে পড়লেন সীয়াশরণজী। হাঁকলেন, "সর্দার—সর্দার—"

কুলীদের সর্দার ছুটতে ছুটতে তাঁবুতে ঢুকল, বলল, "জী—"

"এ কী খানা দিয়েছে!"

যেমন এসেছিল, ছুটতে ছুটতে তেমনি বেরিয়ে গেল সর্দার। একটু পর রতিয়াকে সংগে নিয়ে আবার ঢুকল। ভয়ে ভয়ে বলল, "আপনার রোটি এই রতিয়া পাকিয়েছে।"

সীয়াশরণজী বললেন, "এ কী পাকিয়েছিস!"

"কেন, গোস্ত আর রোটি।"

লাইন-বাবু বলে ভয়ডর নেই রতিয়ার। সহজ স্বাভাবিক গলায় সে জবাব দিল।

সীয়াশরণজী বললেন, "আমি মাছি-গোস্ত খাই না। এগুলো নিয়ে যা।"

থালাটা নিয়ে যেতে যেতে রতিয়া বেজার মুখে বলল, "আপনার জন্যে বহুত আচ্ছা করে গোস্ত পাকিয়েছিলাম ইনাস-পিটারজী।"

রতিয়া চলে গেল। এ বেলা সীয়াশরণজীর খাওয়া হল না।

সন্ধে পর্যন্ত লাইন পাতার কাজ চলল।

রাত্রে তাঁবুতে ফিরে সীয়াশরণজী দেখলেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে রতিয়া বসে আছে। তাঁকে দেখেই মেয়েটা হেসে উঠল। হাসল কিন্তু শব্দ হল না। দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে তিনটে চোখা ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়ল। ভুরু দুটো কুঁচকোতে উল্কির সাপটা আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুল।

রতিয়া বলল, "আপনার রোটি এনেছি ইনাসপিটারজী—"

সীয়াশরণজী জবাব দিলেন না। কেন জানি না তাঁর মনে হল, রতিয়ার সংগে যত কম কথা বলা যায়, ততই মংগল।

এ-বেলা রোটি, ঢুলা শাক ভাজি, আলুর ছোকা আর মরিচের আচার নিয়ে এসেছে রতিয়া। খেতে বসে বেশ খুশীই হলেন সীয়াশরণজী। মরিচের আচার তাঁর খুব প্রিয়।

খেতে খেতেই সীয়াশরণজী মুখ তুললেন। রতিয়া এখনও যায়নি। লণ্ঠনটার পাশে বসে জ্বল জ্বল করে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে।

সীয়াশরণজী বললেন, "তুই এখনও যাসনি?"

"না ইনাসপিটারজী। আপনার খাওয়া হলে তাম্বু সাফ করব। বর্তন নিয়ে যাব।"

আর কিছু না বলে সীয়াশরণজী রুটি ছিঁড়তে লাগলেন।

খাবার পর আঁচিয়ে বাঁশের মাচানে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন সীয়াশরণজী। রতিয়া ঠুক ঠাক, ঠুন ঠান শব্দ করে তাঁবু সাফ করতে লাগল।

বাইরে কালকের মত ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে। কাঁকুরে ডাঙা স্নিগ্ধ দুজ্ঞেয় রহস্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দূরের নাড়া ঝিমুলে আর রুখন পলাশ-গুলি অদ্ভুত এক শ্রী পেয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশের অগ্রগতি

অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হওয়ার তিন বছর পর উহার অগ্রগতি বস্তুতঃই লক্ষ্য করবার মত।

খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে চলতি পরিকল্পনার লক্ষ্য ইতিমধ্যেই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। প্রস্তাবিত সার কারখানা স্থাপন হলে উহা আরও এগিয়ে যাবে।

সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টায়ও অন্ধ্র প্রদেশ বেশ এগিয়ে চলেছে। এখন ২২৮টি ব্লক কাজ করছে এবং জেলাগুলিতে কুড়িটি এড হক পঞ্চায়েৎ সমিতির মধ্য দিয়ে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের উপর উন্নয়নের দায়িত্বভার অর্পিত হবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হওয়ার আগেই সার্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বরংগল ও তিরুপতিতে আরো দুটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও তিনটি নূতন পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কাকিনাড়া ও বরংগলে বেসরকারী প্রচেষ্টায় আরো দুটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিরুপতিতে আরো একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই শিক্ষা-বৎসর থেকেই হায়দ্রাবাদে বি এস-সি নার্সিং কোর্স সহ একটি নার্সিং কলেজ খোলা হয়েছে।

বর্তমান পরিকল্পনাধীনে তেলেংগানা অঞ্চলের প্রত্যেক জেলা হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বাড়িয়ে ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের আগেই ১০০টি করা হবে এবং সবগুলোর না হলেও অনেক তালুক হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ৫০টি করা হবে। জনসাধারণের সাগ্রহ সহযোগিতায় সারা রাজ্য মধ্যে ইতিমধ্যেই ১১৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা ছাড়াও ২২১টি সাহায্যপুষ্ট পল্লী ডিস্পেন্সারী স্থাপিত হয়েছে।

চলতি পরিকল্পনা সময় মধ্যে এই রাজ্যে ১৪টি সমবায় কৃষি সমিতি কাজ আরম্ভ করেছে।

নাগার্জুনসাগর বাঁধ স্থানে স্থানে ৬০ ফুট উঁচু হয়েছে এবং ৫০ মাইল পর্যন্ত দুই পাশে প্রধান ক্যানালের খনন কাজ চলছে। আরও কয়েকটি পরিকল্পনা হয় সমাপ্ত হয়েছে, নয় দ্রুত সমাপ্তির পথে। পোচামপাদ পরিকল্পনা সম্পর্কে অনুসন্ধান শেষ হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন আস্তে আস্তে বেড়েই চলেছে এবং মাথা পিছু বিদ্যুৎ খরচা (যা বর্তমানে ১২ ইউনিট) দ্বিতীয় পরিকল্পনা সময় শেষ হওয়ার আগেই ১৫ ইউনিটে পৌঁছবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সিংগারেণী কোলিয়ারীসমূহে কয়লা উৎপাদন বছরে ১৫ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ২১ লক্ষ টনের বেশী হয়েছে, আর এই পরিমাণকে বাড়িয়ে ৩০ লক্ষ টন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই রাজ্যে অন্যান্য শিল্প সম্পর্কে সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কাজ হচ্ছে।

সমবায়, বাড়ীঘর নির্মাণ এবং সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে অনুরূপ দ্রুত অগ্রগতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে।

মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন সীয়াশরণজী। কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন হুঁশ নেই। হঠাৎ পায়ের উপর ঠাণ্ডা হাত পড়তেই চমকে উঠলেন। পা দুটো টেনে গুটিয়ে খাড়া হয়ে বসলেন। দেখলেন, সামান্য ঝুঁকে ধূর্ত চতুর হাসি হাসছে রতিয়া।

মুখোমুখি সাপ দেখলে যেমন হয়, সীয়াশরণজীর অবস্থা ঠিক তেমনি। অস্ফুট, ভয়ভয় গলায় তিনি বললেন, "কী—কী—কী মতলব?"

"কুছ না ইনাসপিটারজী। আপনার পায়ের দাবিয়ে থোড়া আরাম দোব।"

সীয়াশরণজী চেঁচিয়ে উঠলেন, "না, না, দরকার নেই। তুই যা।"

"আচ্ছা, আচ্ছা জী।" তাঁবু থেকে বেরুবার আগে ফিস ফিস করে রতিয়া বলল, "রাতে কুছ দরকার হলে আমাকে বুলাবেন ইনাসপিটারজী। আমি পাশের ঝোপড়িতেই আছি।"

রতিয়া চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ একই ভাবে বসে রইলেন সীয়াশরণজী। বুকের মধ্য থেকে কেমন এক ধরনের ঠাণ্ডা সিরসিরে কাঁপুনি উঠছে। কিছুতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

সামলে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। নিজের কথা ভাবতে শুরু করলেন সীয়াশরণজী।

তিনি মৈথিলী ব্রাহ্মণ। সুগৌর ঋজু চেহারা। বেশ বয়স হয়েছে। চল্লিশ পার হয়েছেন। কিন্তু মাথার চুলে দু-একটা পাক ধরানো ছাড়া বয়স তাঁর চেহারায় আঁচড় কাটতে পারেনি। গাম্ভীর্য আর প্রসন্নতা শ্রী হয়ে তাঁর মুখে চোখে লেগে আছে।

সীয়াশরণজী বিয়ে করেননি। কামিণীতে তাঁর মোহ নেই, কাঞ্চনে লোভ নেই। জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিকার এবং নির্মোহ।

এটুকুই সীয়াশরণজীর সমস্ত পরিচয় নয়। জীবনে তিনি মিতাচারী, অদ্ভুত সংযমী। এমন খাদ্য খান না যাতে শরীর উত্তেজিত হয়। এমন কথা ভাবেন না যাতে মন বিচলিত হয়। নীতি এবং সংযমে তাঁর অটুট নিষ্ঠা।

সীয়াশরণজী লাইন-ইন্সপেক্টর। সমস্ত জীবন তিনি রেলের লাইন পেতে আসছেন। রেলের লাইনই শুধু নয়, নিজের জীবনে নীতি আর সংযমের লাইনও তিনি বসিয়ে চলেছেন। তার বাইরে যাবার উপায় নেই।

এখানে, এই কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়িতে লাইন পাততে এসেছেন তিনি। সীমান্ত-বরাবর রেলের লাইন টেনে নিতে মাস-দুই সময় লাগবে।

দু মাস মেয়াদের সঙ্গে রতিয়ার কথাটা যতই ভাবলেন, বিচিত্র এক ভয় চার পাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ধরল।

সীয়াশরণজী ঠিক করলেন, রতিয়াকে এড়িয়ে চলবেন। পারতপক্ষে তার সঙ্গে কথা বলবেন না।

সীয়াশরণজী আসার পর দিন-দশেক পার হল। লাইন পাতার কাজ পুরোদমে চলছে। দুপুরে আকাশ, বাতাস, কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি যখন অস্বাভাবিক তেতে থাকে, সেই সময়টুকু ছাড়া কাজের কামাই নেই। এ কদিনে অনেকখানি লাইন বসানো হয়েছে।

কাজ যেই চুকে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুতে চলে আসেন সীয়াশরণজী। তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও, অজান্তেই একটা ব্যাপার ঘটে চলেছে।

সেই যে তিনি ভেবে রেখেছিলেন, রতিয়াকে এড়িয়ে চলবেন, তার সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলবেন না, তা আর হয়ে ওঠেনি।

এই বিলাসপুরী কামিনটা ভারি ফিচেল। হেসে হেসে ঢলে ঢলে প্রচুর কথা বলে। আশ্চর্য! সীয়াশরণজী তাকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। তার সঙ্গে তাল রেখে পাল্লা দিয়ে কথা বলছেন, হাসছেন।

রতিয়া বলে, "ইনসপিটারজী কী সাদি-উদি করেছেন?"

"না।"

গালে একটা হাত রাখে রতিয়া। চোখের কটা তারা দুটো চরকির মত ঘোরে। কপট দুঃখ করে একটা নিশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, "হায় রামজী! এখনও সাদি করেননি!"

সীয়াশরণজী হাসেন। বলেন, "সাদি করিনি ত হয়েছে কী?"

"জনমটাই আপনার বেফায়দা হয়ে গেল ইনাসপিটারজী। সমঝালেন?"

"হাঁ।" আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন সীয়াশরণজী।

সীয়াশরণজীর এমনিতে বড় ভুলো মন। লাইনের তদারকিতে হয়ত গিয়েছেন। ছাতাটা ভুলে সঙ্গে নেননি। রোদের তাতে চামড়া সেঁকছে।

ছুটতে ছুটতে ছাতা নিয়ে এল রতিয়া। ফিস ফিস করে বলল, "আপনার বহুত ভুল হয় ইনাসপিটারজী। ভুল সজুত করার জন্যে একটা সাদি করুন। বহুড়ী এলে আর ভুল হবে না।"

সস্নেহে ধমক দেন সীয়াশরণজী, "যা যা তামাসাবালী—"

একটা নধর ভুট্টাগাছের মত শরীর। দুলতে দুলতে ঢলতে ঢলতে চলে যায় রতিয়া।

জোর কাজ চলছে।

আর মাস-খানেকের মধ্যেই সীমান্ত

পর্যন্ত লাইন পাতা হয়ে যাবে।

সীয়াশরণজী আসার পর পুরো দেড়টা মাস পার হতে চলল। এই দেড় মাসে রতিয়ার হাসি, চলানি, তামাসা নিজের অজান্তেই তাঁর সমস্ত সত্তাটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

আজকাল রতিয়াকে ছাড়া সীয়াশরণজীর চলে না।

সকাল-দুপুর-সন্ধে—দিনে তিনবার তাঁর তাঁবুতে আসে রতিয়া। তাঁবু সাফ করে। রোটি-ভাজি সাজিয়ে দেয়। মাটির সোরাইতে জল ভরে রাখে। বিছানা পাতে। লণ্ঠনের কাচ মোছে। টুকিটাকি কাজ সারে আর হেসে হেসে তামাশার কথা বলে, রসের কথা বলে।

ইদানীং আরও একটা কাজ বেড়েছে রতিয়ার। রাত্রে খেয়েদেয়ে সীয়াশরণজী শুয়ে পড়লে নরম ঠাণ্ডা হাতে তাঁর পা টিপে দেয়।

এখানে আসার পরের দিন তাঁর পায়ে রতিয়া হাত ঠেকাতেই চমকে উঠে বসেছিলেন সীয়াশরণজী। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুকের ভিতরটা কেঁপেছিল। কিন্তু কখন যে নিজের অজান্তে রতিয়ার এই সেবাটুকু মেনে নিয়েছেন, খেয়াল নেই তাঁর।

রতিয়ার আসতে দেরি হলেই সীয়াশরণজী অস্থির হয়ে ওঠেন। তাঁবুর বাইরে এসে পায়চারি করেন; এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে থাকেন।। রতিয়া যতক্ষণ না আসে, স্বস্তি পান না।

সিগন্যাল-পোস্ট, সিগন্যাল-পুলি পোঁতা হচ্ছে। স্লিপার বসানো হচ্ছে। আর পনের দিনের মধ্যেই রেল-লাইন সীমান্ত ছোঁবে।

কুলী কামিন এবং ইন্সপেক্টরজীর শ্বাস ফেলার ফুরসত নেই।

আজ একটানা সমস্ত দিন কাজ হয়েছে। দুপুরে খেতে আসতে পারেননি সীয়াশরণজী। রতিয়া বার দুই ডেকে ফিরে গিয়েছে।

সন্ধের পর আকাশে চাঁদ দেখা দিল। কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ উঠে আসছে। দুপুরের আগুনের আকাশটা স্নিগ্ধ এক রহস্যে বিভোর হয়ে আছে। ঝিরঝিরে, মিঠেল বাতাসে সমস্ত দিনের অবসাদ জুড়তে জুড়তে তাঁবুতে ফিরে এলেন সীয়াশরণজী। কারণ নেই, হেতু নেই, তবু অদ্ভুত এক খুশিতে মন ভরে আছে।

তাঁবুর বাইরে থেকেই সীয়াশরণজী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, "রতিয়া—রতিয়া—"

অন্য অন্য দিন ডাকতে হয় না। পায়ের শব্দ পেলেই লণ্ঠন হাতে বাইরে বেরিয়ে আসে রতিয়া।

বার-তিনেক ডাকার পরও সাড়া মিলল না। অগত্যা তাঁবুর ভিতরে ঢুকলেন সীয়াশরণজী। রতিয়া নেই। এক কোণে একটা তেলের লণ্ঠন জ্বলছে।

লাইন থেকে ফিরে রতিয়াকে দেখা, তার সঙ্গে গল্প করা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। অহেতুক খুশিতে মনটা ভরিয়ে তাঁবুতে ফিরেছিলেন সীয়াশরণজী। মনটা এখন উদাস হয়ে গিয়েছে।

মাচানের উপর নিঝুম হয়ে পড়ে রইলেন সীয়াশরণজী।

খানিকটা পর তাঁবুর বাইরে খচমচ শব্দ হল। ধড়মড় করে উঠে বসলেন সীয়াশরণজী। আকুল আগ্রহে ডাকলেন, "আয় আয় রতিয়া।"

কিন্তু তাঁবুর ভিতর যে ঢুকল, সে রতিয়া নয়। অন্য একটা কামিন। কামিনটা পিতলের থালায় রোটি-ভাজি এনেছে।

থালা নামিয়ে কামিনটা চলে গেল।

সীয়াশরণজী একবার ভাবলেন, কামিনটাকে ডেকে রতিয়ার কথা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু কোথায় যেন বাধো-বাধো সংকোচ ঠেকল। সংকোচটাকে ছাপিয়ে তাঁর ইচ্ছা জয়ী হল না।

অনেকক্ষণ বসে রইলেন সীয়াশরণজী। মনের সঙ্গে অনেক বুঝলেন। কিন্তু একটা অবুঝ যন্ত্রণা তাঁকে বিকল করে ফেলল। আর সেই যন্ত্রণাটাই তাঁকে তাঁবুর বাইরে টেনে আনল।

লাইনের ধারে টিকারা বাজিয়ে কুলীরা হোলির গীত গাইছে। সন্তর্পণে তাদের এড়িয়ে যেখানে ন্যাড়া শিমুল আর রুগ্ন পলাশগুলি সারি-বাঁধা জমাট অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে চলে এলেন সীয়াশরণজী।

শিমুল আর পলাশের নীচে কামিনদের ঝুপড়ি। ঝুপড়িগুলোর চারপাশে কিছুক্ষণ ঘুর ঘুর করলেন। বার বার ভাবলেন, রতিয়াকে ডাকেন। এতে দোষের কিছু নেই। রতিয়া রোজ তাঁর তাঁবুতে যাচ্ছে। তা ছাড়া ইন্সপেক্টরজী যদি তাকে রাত্রে ডাকেনই, কুলীরা খারাপ চোখে দেখবে না। সীয়াশরণজীকে বিশ্বাস করে তারা।

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত রতিয়াকে আর ডাকা হল না। অসহ্য অবুঝ এক যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে তাঁবুতে ফিরে এলেন সীয়াশরণজী।

সারা রাত ঘুম হয়নি। ভোরের বাতাসে চোখদুটো জুড়ে এসেছিল।

কে যেন ডাকল, "ইনাসপিটারজী—"

চোখ মেলেই সীয়াশরণজী যাকে দেখলেন, সে রতিয়া। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন। প্রথমেই যে কথা বললেন, তা এই, "কাল রাতে আসিসনি কেন রতিয়া?"

রতিয়া জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে সেই হাসি হাসল, যাতে শব্দ নেই।

একটা রাত্রি না ঘুমিয়ে চোখ বসে গিয়েছে। হনু দুটো ফুঁড়ে বেরিয়েছে। মুখটা শুকনো, চুল উড়ুউড়ু। সীয়াশরণজীকে দেখতে দেখতে রতিয়া বলল, "চেহারার এ কী সুরত হয়েছে!"

ব্যস্তভাবে সীয়াশরণজী বললেন, "ও কুছ্ না, কুছ্ না। কাল তুই আসিসনি কেন, বল্?"

রতিয়া এবারও জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে আগের মতই হাসতে লাগল।

সীয়াশরণজী বললেন, "হাসছিস কেন?"

"বলব?" জবাবের অপেক্ষা না রেখেই ফিস ফিস করে রতিয়া বলল, "কাল রাতে একটা বেকুব মুরুখ আমার ঝোপড়ির পাশে ঘুর ঘুর করছিল। লেকিন ভরোসা করে ঝোপড়িতে ঢুকল না। মুরুখটার জন্যে দরদ লাগল।" খিল খিল করে দমকে দমকে হেসে উঠল রতিয়া।

সীয়াশরণজী শিউরে উঠলেন। অসহ্য গলায় চিৎকার করলেন, "বাহার যা, বাহার যা—"

হাসি থামিয়ে সীয়াশরণজীর মুখের দিকে তাকাল রতিয়া। সে মুখে কী দেখল, সে-ই জানে। আর একটা কথাও না বলে সে বেরিয়ে গেল।

আজ আর বেরুলেন না সীয়াশরণজী। সমস্ত দিন তাঁবুতে বসে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করলেন। এতকাল নিজের জীবনে নীতি আর সংযমের লাইন পেতে এসেছেন। জীবনের চাকাটা মসৃণ নিয়মেই তার উপর দিয়ে চলছিল। কিন্তু এখানে, এই সীমান্তে এসে, চল্লিশটা বছর পার হয়ে জীবনের সীমান্তে পোঁছে সেটা বেচাল হয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম করেছে। প্রায় দুটি মাস অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে কাটিয়ে সীয়াশরণজী আজ আত্মস্থ হলেন। স্থির করে ফেললেন, আজই এখান থেকে চলে যাবেন।

বিকালে কুলীকামিনদের অবাক করে দিয়ে ট্রলিতে উঠলেন সীয়াশরণজী।

সকলের সঙ্গে রতিয়াও ট্রলির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার কটা চোখ-দুটো ধক ধক করছে। রতিয়ার চোখের দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন সীয়াশরণজী।

বিড় বিড় করে দুর্বোধ্য গলায় রতিয়া বলল, "ডরপোক—"

ট্রলি চলতে শুরু করল। জীবনের ভয়ানক এক সীমান্ত থেকে পালিয়ে গেলেন সীয়াশরণজী।

বেকার সমস্যা

পূর্ণেন্দুকুমার বসু

জ থেকে বারো বছর আগে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। স্বাধীন হবার পর দেশবাসীর আশা ছিল যে প্রায় দুশো বছর ইংরাজ রাজত্বে দেশে যে অভাব অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার বুঝি সমাধান হবে। প্রধান অভিযোগ ছিল দেশে মানুষের কাজের ব্যবস্থা হয় না। যত লোক কাজ করতে পারে তাদের কাজ জোটে না, বেকার অবস্থায় থাকে। দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই সমস্যা সমাধানের কথা সরকার ভাবতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আজও মানুষের সে আশা সফল হয়নি। প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সমস্যার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়, কিন্তু দেশে বেকারের সংখ্যা হ্রাস ত পায়ইনি বরং উত্তরোত্তর বাড়ছে। এই প্রবন্ধে সারা ভারতবর্ষে বেকার সমস্যার সমগ্ররূপ যে কি দাঁড়িয়েছে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। এর সমাধান যে কী তা বলা খুবই শক্ত, তবে তারও কিঞ্চিৎ আভাস দেব।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ষ একটি অনগ্রসর দেশ। প্রতি বছর এর জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। জনসংখ্যা বাড়ার জন্য কাজ করার লোকও সংগে সংগে বাড়ছে। দেশে যে পরিমাণ কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে তার সংগে কর্মক্ষম লোকের সমতা থাকছে না, যার ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। এই সমস্যাটির প্রকৃত রূপ কী? সমগ্র দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এর অংশ কতটা? শহরে এবং গ্রামে এই সমস্যার কি কোন তারতম্য আছে? এইরূপ বিবিধ প্রশ্ন মনে ওঠে। তারই কিছু জবাব দেবার চেষ্টা করছি।

১৯৫১ সালে আদমসুমারি হয়। তখন লোকসংখ্যা ছিল ৩৫·৬৯ কোটি। তারপর ৮ বছর হয়ে গিয়েছে, এই সময়ে লোকসংখ্যা কি দাঁড়িয়েছে, তা অনুমান করা যায়। ১নং তালিকাতে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা রাশিতথ্যের সাহায্যে অনুমান করা হয়েছে।

এই তালিকা থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রতি বছর প্রায় ০·৫০ কোটি লোক যোগ হচ্ছে।

১নং তালিকা, ১৯৫২—৫৮ সাল পর্যন্ত লোকসংখ্যা (অনুমান)

বৎসর	লোকসংখ্যা (কোটি)	বৎসর	লোকসংখ্যা (কোটি)
১৯৫২	৩৬·৭৫	১৯৫৬	৩৮·৭৪
১৯৫৩	৩৭·২৩	১৯৫৭	৩৯·২৪
১৯৫৪	৩৭·৭১	১৯৫৮	৩৯·৭৫
১৯৫৫	৩৮·২৪		

এই হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে ১৯৬১ সনে অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনা আরম্ভ করার সময় লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ৪২ কোটির মতন। মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৮৩ ভাগ থাকে গ্রামে আর ১৭ ভাগ থাকে শহরে। গ্রামে ও শহরে সমাজ বিন্যাস আলাদা, কাজের ধরনও আলাদা। সেইজন্য বেকার-সমস্যা আলোচনা করতে হলে গ্রাম ও শহরকে আলাদা করে দেখতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৮২·৪৯ জন লোক অশিক্ষিত, ১৬·৯৯ জন লোক সামান্য লেখাপড়া জানে আর মাত্র ০·৪৬ জন শিক্ষিত। শহরাঞ্চলের অবস্থা অন্যরকম। শতকরা ৫৫·২৫ জন লোক অশিক্ষিত, ৩৯·২৪ জন লোক সামান্য লেখাপড়া জানে আর ৫·৫ জন শিক্ষিত। আয়ের দিক থেকে দেখ্‌লে দেখা যাবে যে গ্রামে শতকরা ২৯·২৮ জন আয় করে আর শহরে শতকরা ২৯·৫৪ জন আয় করে। শতকরা অর্ধেকের বেশী লোক শহরে ও গ্রামে নির্ভরশীল, শহরে এর পরিমাণ শতকরা ৬৪·০৪ ভাগ আর গ্রামে ৫৩·০৮ ভাগ। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা আয় করে কিন্তু তবুও তারা কিছু পরিমাণ পরনির্ভরশীল, তাদের ইংরাজীতে বলা হয় 'আরনিং ডিপেন্‌ডেন্টস'। এদের সংখ্যা শহরের থেকে গ্রামে অনেক বেশী, শহরের ভাগ হচ্ছে শতকরা ৬·২৫ আর গ্রামের ভাগ ১৬·৬১। (২নং তালিকা দ্রষ্টব্য)

২নং **তালিকা**:—গ্রামের ও শহরের শিক্ষার ও অর্থনৈতিক অবস্থা (শতকরা)

	গ্রাম			শহর		
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
শিক্ষা						
১। অশিক্ষিত	৭২·৭২	৯২·৬৪	৮২·৪৯	৪৩·৪৩	৬৮·৩১	৫৫·২৫
২। সামান্য লেখাপড়া জানে	২৬·৩৬	৭·২৫	১৬·৯৯	৪৭·৭৮	২৯·৮১	৩৯·২৪
৩। শিক্ষিত	০·৮৪	০·০৭	০·৪৬	৮·৭৫	১·৮৪	৫·৪৭
৪। জানা যায় নি	০·০৮	০·০৪	০·০৬	০·০৪	০·০৪	০·০৪
অর্থনৈতিক অবস্থা						
১। রোজগারী	৪৯·১৮	৯·৮০	২৯·৮৮	৪৯·৩৯	৭·৬৬	২৯·৫৪
২। রোজগারী, কিন্তু নির্ভরশীল	১০·৭৮	২২·৬৮	১৬·৬১	৫·০০	৭·৬২	৬·২৫
৩। পরনির্ভরশীল	৩৯·৫৬	৬৭·১৫	৫৩·০৮	৪৫·৪৯	৮৪·৪৮	৬৪·০৪
৪। জানা যায় নি	০·৪৮	০·৩৭	০·৪৩	০·১২	০·২৪	০·১৭
নমুনার সংখ্যা	২০,৬৫৪	১৯,৭৫৮	৪০,৪১২	৪৬,৩২৯	৩৮,৯৩৭	৮৫

ভারতবর্ষের বেকার সমস্যার কথা আলোচনা করতে হলে এই সমাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এই প্রবন্ধের রাশি-

তথ্যগুলি নমুনা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সরকারী ব্যবস্থায় সংগ্রহ করা হয়েছে, নীচের লাইনে নমুনার সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

দেশে কতজন বেকার হয়ে আছে, এ বিষয় অনুসন্ধান করতে হলে প্রথমেই দেখা প্রয়োজন মোট জনসংখ্যার মধ্যে কতজন লোক কর্মপ্রার্থী, কারণ অনেক লোক আছে যারা বেকার কিন্তু কাজ চায় না, এই শ্রেণীর লোককে বেকারের আওতায় আনা যায় না। যারা কাজ চায়, তাদের বলা হয়েছে "লেবার ফোর্স"। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে যারা বসে আছে তারাই প্রকৃত বেকার। তাদের কাজের সংস্থান করাই সরকারের আশু কর্তব্য।

যারা বর্তমানে কাজ করছে তাদের চার ভাগে ভাগ করা যায়—(১) নিযুক্ত ব্যক্তি, (২) নিয়োক্তা, (৩) নিজের কাজ করে আর (৪) বাড়ির কাজ করে। ৩নং তালিকাতে গ্রামের ও শহরের লোকের কাজ হিসাবে (ইনডাস্ট্রিয়াল স্ট্যাটাস) শ্রেণী বিভাগ করে দেখান হয়েছে।

৩নং তালিকা:—গ্রামের ও শহরের লোকের কাজ হিসাবে শ্রেণী বিভাগ (শতকরা)

কাজ চায়। ৩নং তালিকা থেকে দেখা যায় শহরের বেকারের সংখ্যা বেশী। পূর্বেই বলা হয়েছে মোট লোকসংখ্যার ৮৩ ভাগ থাকে গ্রামে আর ১৭ ভাগ থাকে শহরে। এই ভাগ অনুসারে গ্রামের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩ কোটির মতন আর শহরের ৭ কোটির মতন। এই লোকসংখ্যার উপর ভিত্তি করে দেখতে পাওয়া যাবে যে শুধু পুরুষদের মধ্যে বেকার সংখ্যা গ্রামে ও শহরে মোট ২২ লক্ষের মত। এ ছাড়া শহরে মেয়েদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে যারা বাড়িতে কাজ করে, বা বছরে কিছুদিন কাজ করে বা ছাত্র ইত্যাদিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সারা দেশে যদি কর্মপ্রার্থী লোকের হিসাব করতে হয় তা হলে তার সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশী হবে। ১৯৫৬ সনে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন দেশে মোট কত লোক বসে আছে তার সংখ্যা নিরূপণ করেছেন। ১৯৫৬ সনে এই সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ। আরও দু বছরে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। প্রথম পরিকল্পনার পর বেকারের সংখ্যা এইরূপ ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা আরম্ভ হয় ১৯৫৬ সন থেকে, এই পরিকল্পনায় ৪৮০০ কোটি টাকা খরচ করা

শহরে এবং গ্রামে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এমনই আলাদা যে একই ধরনের কাজ দু জায়গায় সম্ভব নয়। ৪নং, ৫নং এবং ৬নং তালিকায় এই প্রয়োজনীয় রাশি-তথ্য দেওয়া হল।

৪নং তালিকা। গ্রামে ও শহরে নিযুক্ত লোকের বয়স হিসাবে শ্রেণী বিভাগ (শতকরা)

বয়স	গ্রাম	শহর
০—৬	০·০০	০·০৮
৭—১৫	২২·৫৯	৭·৭০
১৬—১৭	৫৭·৬৮	২৮·২৬
১৮—২১	৬৫·৫৮	৩৭·৪৩
২২—২৬	৭১·২৭	৫১·৫৭
২৭—৩৬	৭৪·৯০	৬১·৪২
৩৭—৪৬	৭৪·০৩	৬৩·৩৫
৪৭—৫৬	৬৭·০৯	৫৯·১০
৫৭—৬১	৫২·৪৬	৪২·১৩
৬২——	৩৬·৫৭	২৪·৩০

৪নং তালিকা থেকে দেখতে পাওয়া যাবে গ্রামে অনেক কম বয়স থেকে লোক কাজ করতে আরম্ভ করে আর কাজ করে যায় অনেক বেশী বয়স পর্যন্ত। ৭-১৫ বছরে গ্রামে কাজ করে শতকরা প্রায় ২৩ জন আর শহরে প্রায় ৮ জন। ৬২ বছরের বেশী বয়সে গ্রামে কাজ করে শতকরা ৩৭ জন আর শহরে কাজ করে ২৪ জনের মতন।

৫নং তালিকা—নিযুক্ত লোকের শিক্ষার মান হিসাবে শ্রেণী বিভাগ (শতকরা)

শিক্ষার মান	গ্রাম	শহর
অশিক্ষিত	৭৯·৬৯	৪৫·৫৫
অর্ধশিক্ষিত	১৯·৭৩	৪৪·৩৭
শিক্ষিত	০·৫৭	১০·০৭

	গ্রাম			শহর		
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
১। প্রয়োজনীয় কাজ করছে	৫৯·০৭	২৮·০৮	৪৩·৮৮	৫১·৬০	১১·৫৬	৩২·৫৫
২। যারা কাজ খুঁজছে	০·৫২	০·০৪	০·২৯	৩·৪৪	০·৪০	১·৯৯
৩। কাজের লোক	৫৯·৫৯	২৮·১২	৪৪·১৭	৫৫·০৪	১১·৯৬	৩৪·৫৪
৪। যারা কাজ চায় না	৪০·৩২	৭১·৮৪	৫৫·৭৭	৪৪·৮৯	৮৮·০২	৬৫·৪১
৫। জানা যায় নাই	০·০৯	০·০৪	০·০৬	০·০৭	০·০২	০·০৫

উপরের তালিকা থেকে দেশে বেকারের অবস্থা বেশ ভাল ভাবে বোঝা যায়। শহরে পুরুষের মধ্যে বেকারের সংখ্যা শতকরা ৩·৪৪ ভাগ আর গ্রামে মাত্র ০·৫২ ভাগ, স্ত্রীলোকের মধ্যে গ্রামে বেকারের সংখ্যা খুবই কম কিন্তু শহরে এর ভাগ ০·৪০। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় (১) লোক বেকার হয়ে পড়লেই গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে, কারণ শহরে কাজ পাবার আশা অনেক বেশী। (২) গ্রামে বেশীর ভাগ অশিক্ষিত লোক থাকে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় চাষের কাজ। বেশীর ভাগ লোক বছরে কিছু না কিছু চাষ করে, এইজন্য তারা বেকারের পর্যায়ে আসে না, কিন্তু তারা বছরে বহু সময়ে বেকার অবস্থায় থাকে, (৩) গ্রামে মেয়েরা চাষের এবং বাড়ির কাজ করে, কিন্তু শহরে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী, সেইজন্য মেয়েরা

হবে। পরিকল্পনা শেষ হবে ১৯৬১ সনে। সরকার আশা করেন এর পর বেকারের সংখ্যা কিছু হ্রাস পাবে।

গ্রামে ও শহরে যারা কাজ করছে তাদের শ্রেণী বিভাগ কী রকম? কারণ যদি বেকারদের কাজ দিতে হয়, কী ধরনের কাজ সৃষ্টি করতে হবে তা জানা প্রয়োজন।

গ্রামে অশিক্ষিত লোক কাজ করে প্রায় শতকরা ৮০ জন আর শহরে করে প্রায় ৪৬ জন, অর্ধশিক্ষিত আর শিক্ষিত লোক কাজ করে গ্রামে শতকরা ২০ জন আর শহরে করে প্রায় ৫৬ জন।

৬নং তালিকা গ্রামে ও শহরে নিযুক্ত লোকের কাজ হিসাবে শ্রেণী বিভাগ
(শতকরা)

কাজের ধরন	গ্রাম	শহর
কৃষি	৮৪·২১	২০·০২
শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি	১০·৮২	৪৭·২৭
যানবাহন চলাচল	০·৮০	৭·৬৫
অন্যান্য	৪·১৭	২৫·০৬

৬নং তালিকা—গ্রামে ও শহরে নিযুক্ত শতকরা ৮৪ জনের অধিক লোক কৃষির কাজ করে আর শহরে শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি কাজে শতকরা ৮০ জন লোক কাজ করে। অতএব দেখা যাচ্ছে শহরে ও গ্রামে কাজের ধরন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

যদি এই বিপুল সংখ্যক বেকার লোকের কাজের সংস্থান করতে হয় তা হলে উপরোক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। বেকার সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে এ বলা খুবই শক্ত কিন্তু তার উপায় সম্বন্ধে দু-একটি কথা আলোচনা করব।

প্রথমেই দেখতে হবে বেকারের সংখ্যা যাতে আর খুব বেড়ে না যায়। ১নং তালিকাতে দেখান হয়েছে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে বছরে প্রায় ০·৫০ কোটি। এই হার কমাতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভারত সরকারকে অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। গ্রামে শতকরা ৮৪ জন লোক চাষের উপর নির্ভর করে। লোক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষের জমিও মাথা পিছু কমে যাচ্ছে। বেকার লোকেদের আর চাষের জমি দেওয়া সম্ভব নয়, বরং চাষের কাজ থেকে কিছু সংখ্যক লোককে অন্য কাজে দেওয়া প্রয়োজন। অতএব গ্রামে বেকার সমস্যা সমাধান করতে হলে আমাদের কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রাকার শিল্প প্রবর্তন করা প্রয়োজন। কুটির ও ক্ষুদ্রাকার শিল্পের প্রসার হলে গ্রাম থেকে আর লোক শহরে চলে আসবে না।

কুটির ও ক্ষুদ্রাকার শিল্প পাঁচটি মণ্ডলীতে ভাগ করা যায়, যেমন (১) বস্ত্রাদি, (২) যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, (৩) কাষ্ঠসামগ্রী (৪) ফাঁপা পাত্রাদি, (৫) বিবিধ। বস্ত্রাদি বলতে মিলজাত কাপড়ের কথা বলা হচ্ছে না, হস্তচালিত বা বৈদ্যুতিক তাঁতে প্রস্তুত জিনিসের কথা বলা হয়েছে। এর আওতায় আসে (ক) রঙীন বা সাদা বোনা কাপড়, (খ) হোসিয়ারি দ্রব্যাদি, (গ) পাটের বস্তা (যেগুলি রপ্তানির জন্য নয়)। কাষ্ঠ-সামগ্রীর অধীনে আসে গৃহস্থালির আসবাব ও মালপত্র, দরজা জানলার প্যানেল ও ফ্রেম। ফাঁপা পাত্রাদি বলতে বোঝায় বাড়িতে ব্যবহারের জন্য ধাতব পাত্রাদি। বিবিধের মধ্যে অনেকগুলি বলা যেতে পারে, যেমন দেশলাই তৈরী, কাপড় কাচা সাবান তৈরী, শিল্পে ব্যবহার্য চর্মদ্রব্য ইত্যাদি। এই ধরনের ক্ষুদ্রকায় শিল্প যদি গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠে তাহলে গ্রাম থেকে শহরে লোক চলে যাওয়া বন্ধ হবে। গ্রামে নতুন নতুন কাজের সন্ধান পেলে, গ্রামগুলি আবার নতুন করে গড়ে উঠবে। সরকার এ বিষয়ে অবহিত আছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বাবদে বেশ মোটা টাকা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত একাজ তেমন ভাল ভাবে এগোয়নি। গ্রামবাসীর মধ্যে এ কাজের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা দলে দলে কুটিরশিল্পে মন দেয়। এ ছাড়া কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় প্রথায় চাষ করার প্রথা প্রবর্তন করা দরকার।

শহরে সরকারের অধীনে ভারী শিল্পের প্রসার প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর এ বিষয়ে সরকার খুবই সচেতন এবং অনেকগুলি ভারী শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ কাজের প্রসার আরও হবে। বেসরকারী বিভিন্ন ভারী শিল্প সংস্থাগুলি যতদূর সম্ভব জাতীয়করণ করা প্রয়োজন। সরকারী উদ্যমে ভারী শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে। অতএব বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে আমাদের নিম্নলিখিত জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে:—(১) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (২) গ্রামে কুটির ও ক্ষুদ্রাকার শিল্প প্রতিষ্ঠা ও সমবায় চাষ ও (৩) পাবলিক সেক্টরে নতুন ভারি শিল্প সংস্থা গঠন ও ভারী শিল্প জাতীয়করণ।

র সকলের কৌতূহল মিটে-ছিল লোকটার সম্পর্কে। মেটেনি খেলানীর।

কিংবা বলা যায়, লোকটার সম্পর্কে আর কৌতূহলী হয়ে কোনো লাভ নেই বলে কেউ হয় না। কারণ তাতেও লোকটিকে ঠিক ঠাহর পাওয়া মুশকিল।

কিন্তু খেলানীর কৌতূহল কি-না কে জানে। ওর চোখে একটা খেলার ইশারা কেমন যেন হাতছানি দিয়ে ফিরতে লাগল। লোকটাকে দেখলে খেলানীর ফুলো ফুলো ঠোঁট দুটি ধনুকের ছিলার মত হাসির টানে বাঁকে। কালো দুটি টানা টানা চোখের অতি সূক্ষ্ম বক্রতায়, জাদুকরের অঙ্গুলি সংকেতের মত কি একটা কথা যেন শুধু বলার অস্পষ্টতায় চাপা পড়ে থাকে। কাঁপে, ঝিকিমিকি করে। নতুন খোলস-ছাড়া সাপের মত তার কালো রঙের ছটা শুধু চলকে যায় না। লোকটার কাছে এলে, খোলস-ছাড়া সাপের মতই তার গতি শ্লথ নিথ্রালু হয়ে ওঠে।

শাস্ত্রানুযায়ী কুললক্ষণ মিলিয়ে খেলানীর রূপ যাচাই চলবে না। নাক মুখ এমন কিছু নেই। সব মিলিয়ে একটা নিরালা নদীর মত। যার খবর কেউ রাখে না, কিন্তু পাহাড়ের ঢলটা নেমেছে অনেকদিন। বেয়ে যাবার পথে কোথায় যেন থমকে গেছে। সেখানে একটি প্রতীক্ষমান আবর্ত পাক খাচ্ছে প্রায় বাইশ চব্বিশের গহীনে।

আদিবাসী নাকি ছিল। এখন এই বাদা অঞ্চলের সঙ্গে মিশ খেয়ে গেছে পুরো-পুরি। কোন্ পুরুষে এসেছিল কোথা থেকে, তার হিসেবনিকেশ জানা নেই খেলানীর। ওর মা ছিল এক জোতদারের কাছে এই জগপুরের বাদাতেই। বয়স হয়েছে এখন। জোতদার ঘর করে থাকার মত একটু জায়গা দিয়েছে জীবনস্বত্ব স্বরূপ। মা মেয়ে এখন কৃষিমজুরি করে।

বাদায় যেমন করে আদিবাসীরা।

খেলানী এখন পুরোপুরি বাদাবনের মেয়ে। এখানে লাল মাটি, চূড়ো পাহাড়, নুড়ি অরণ্য নেই। এখানে কালো মাটি, নোনা জল আর সাপ-চকচকে কালচে সবুজ অরণ্য। সুঁদুরি অর্জুনের কোমরে কোমরে হোগলা আর গোলপাতার জঙ্গল। গেমো আর কেওড়ার পায়ে পায়ে বিষ কাঁটারির ঝাড়। দিগন্ত জুড়ে আবাদ।

দুলাল সোরেনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল খেলানীর। জাতের লোক ছিল সে। যার কামড়ে কেউ মরে না, সেই বিছের কামড়ে দুলাল মারা গেল। সাঙা করবার লোকের অভাব ছিল না। ভাত কাপড় দেবার মানুষও পেখম খুলে ছিল চারপাশে। কিন্তু ওই লোকটাকে দেখে খেলানীর কূল ভাসো ভাসো।

প্রথম প্রথম অবশ্য জগপুরের গঞ্জে লঞ্চে বাঁধে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। সেই থেকেই শুরু। তারপর একদিন গঞ্জ থেকে মাইল-খানেক আবাদ পেরিয়ে লোকটা হাজির। বেশভূষা দেখে কিছু আন্দাজ করবার উপায় নেই। ভদ্রলোক হতে পারে। নাও হতে পারে। চুলে বোধহয় তেল দেয় না কোনো-দিন। না দিক, রুখা রুখা চুলগুলিতেই লোকটাকে মানিয়েছিল। মালকোঁচা ধুতি, সেটা কোনদিন ফর্সা থাকে, কোনদিন থাকে না। গায়ের জামার বরাবরই বুকটি হাট করে খোলা। লোকে বলে মেয়েদের বয়েস দেখে কিছু বোঝা যায় না। লোকটির ক্ষেত্রে সেটা উল্টো। তিরিশ হতে পারে, চল্লিশ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। দশটি বছর বেমালুম শরীরের নানান আনাচে কানাচে গায়েব করে রেখেছে। চেহারার মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই। আর-দশটা ভব-ঘুরের মতই। গাছপালাহীন একটি ধূসর পাহাড়ের মত। তার গায়ে পৃথিবীর বয়সের দাগ কতখানি পড়ে, টের পাওয়া যায় না সহসা। কেবল চোখ দুটিতে কী এক চুম্বক আছে। একটি দূরাগত অচেনা হাতছানি?

মত কী যেন লক্ষ্য করা যায়। চোখে চোখ পড়লে তাই একটু লক্ষ্য করে দেখতে হয়। দেখতে দেখতে এক সময়ে হাতছানির ইশারায় বুঝি পা বাড়াতেও ইচ্ছে করে। বাড়ালে তা থামবে কোথায়, কে জানে। ওই চোখও তা জানে না। পা যে বাড়াবে, সে হারিয়ে যাবার জন্যেই বাড়াবে।

লোকটা যেদিন আবাদের ওই দূরে এসে হাজির, খেলানীর পা আর একমুহূর্ত ঘরে থাকতে চাইল না। আসলে খেলানীর চোখের কোণে যে জাদুকরের অংগুলি-সংকেতের মত কি একটি না জানার ইশারা খেলছিল, সেটা হারিয়ে যাবার ইচ্ছেরই সংকেত।

বাদ সাধলে তানিচারি, খেলানীর মা। বাবুর সংগে ঘর করবে, তাতে বোধ হয় আপত্তি ছিল না তানিচারির। নয় তো জাতের লোকের সংগে সাঙা। কিন্তু ওই লোকটিকে চেনে সারা জগপুর লাট আবাদের মানুষেরা। বাবু নয়, চাষা নয়। যে-মানুষের ঠিকানা নেই, তার কড়া নাড়বে কোথায়?

জগপুর গঞ্জের লোকেরা লক্ষ্য করেছিল খেলানীর ছটফটে হাবভাব। মন সেয়ানি। লোকটিকে নিয়ে তারা আর মাথা ঘামায় না।

এক সময়ে গোটা জগপুরের আবাদ গঞ্জ ঘামিয়েছে। লোকটার নাম বুঝি হিরণ। প্রথম যখন এসেছিল জগপুরে, তখন সে কিংবদন্তীর লোক। মস্ত লেখাপড়া জানা মানুষ নাকি। লঞ্চে এসেছিল ভাসতে ভাসতে। জগপুরের মা-কালী হোটেলে কয়েকদিন থাকল। তারপরে দেখা গেল, ডাক্তার বাবুর ডিসপেন্সারিতে ওষুধ তৈরী করছে।

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা আপনার নখ-দর্পণে মশাই। পড়াশোনা করেছেন নাকি?

হাসে। বলে, ওসব কিছু নয়। আপনাদের সংগে ওঠাবসা করি। কিছু জানা হয়ে যায়। তারপরে আবার দেখা গেল লঞ্চের টিকেট-বাবু হয়ে বসে আছে হিরণ। কিন্তু তা-ই বা কতদিন। লোকের মামলা মোকদ্দমায় সাহায্য করল কিছুদিন। মহকুমা কোর্টের উকিলরা জগপুরের হিরণবাবুকে চিনে ফেলেছিলেন। এক বাক্যে বলে দিয়েছিলেন তাঁদের নিজেদের মক্কেলদের, যা ঘটবে, আগে ওই বাবুটির সংগে পরামর্শ করবে তারপর আমাদের কাছে আসবে। আইনের জ্ঞান ও'র জবর।

কিন্তু পাওয়া যাবে কেমন করে তাকে? সে হয় তো তখন নদীর ওপারে মাটোখারির সার্ভিসের মোটর চালাচ্ছে। তাই বা চালায় কতদিন। শীতের মরসুমে তবে মাঝিদের সংগে সমুদ্রে যাবে কে?

ইংরেজী হাতের লেখা নাকি চমৎকার। অনেকের অনেক দরখাস্ত লিখে দিয়েছে। এখন দরকারের সময় খোঁজ করে দেখ। জগপুর মাটোখারি, দক্ষিণের গোটা তল্লাটে তার ছায়াটিও খুঁজে পাবে না।

তারপরে যদি দেখা যায়, জগপুর গঞ্জের এক পুবে-বাতাস-দোলা দুপুরে, বাজারের মেয়েপাড়ায় মেয়েদের সংগে বসে দুনিয়ার গল্প ফেঁদেছে লোকটি, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

তবু ইজ্জৎ আছে। ডাক্তারবাবু হাত তুলে নমস্কার করেন। থানার দারোগাবাবু ভ্রু কুঁচকে কিন্তু সমীহ করে কথা বলেন।

যে যতই সমীহ করুক, তানিচারি বোকা নয়। বাদায় কালো মাটির একটি টুকরো নেই, এমন লোকের কাছে মেয়ে ভিড়তে দেবে না সে।

কিন্তু ভিড়তে না দেবার মালিক তানিচারি নয়। জলের স্রোতকে বাঁধ দিয়ে আটকানো যায়। রক্তস্রোতকে বাঁধা যায় না।

হিরণ ফিরে গেল। সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে খেলানীও পিছু নিল তার।

হিরণ তখন বাঁধের ওপর বসে গালে হাত দিয়ে ওপারের দিকে তাকিয়ে ছিল। সামনে এসে দাঁড়াল খেলানী। হাতে একটি ছোট পুঁটলি তার। গলার রুপোর হারগাছটি খোলা ছিল। পরে আসতে ভোলেনি সে।

হিরণ তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখল। খেলানীর সর্বাংগে ওর শেষ লজ্জাটা এঁকেবেঁকে আড়ষ্ট হয়ে আছে। ঠোঁটের হাসিটুকু দাঁত দিয়ে ধরে রেখেছে চেপে। দু চোখ দিয়ে যেন হাতড়ে ফিরছে হিরণের বুকের মধ্যে। ফিসফিস করে বলল, পালায়ে এইচি।

হিরণ ফিরে তাকাল একবার নদীর দিকে। ভাটা নামা নদী সমুদ্রে যাচ্ছে। কিন্তু তার মুখের তেমন কোনো পরিবর্তন হল না। শুধু চোখ দুটি যেন আরো গাঢ় গহীন হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল। —বলি, যাবি তা হলে?

খেলানী হিরণের চোখের দিকে তাকিয়ে ত্রাসচকিত ভংগিতে ঘাড় নেড়ে জানাল, যাবে। হিরণ উত্তর দিকে, বাঁধের নীচে গেঁয়ো গাছের গোড়ায় বাঁধা একটি নৌকো দেখিয়ে বলল, ওই নৌকোটায় গিয়ে বোস। সুরীন মাঝি আছে। আমি আসছি।

—কোথা গো?

উৎকণ্ঠিত ত্রাস খেলানীর গলায়।

হিরণ বলল, কিন্তু চক্রবর্তীর ধান চালানের কাজে হাত দিয়েছিলাম। বলে আসি, থাকব না, লোকটা মুশকিলে পড়ে যাবে নইলে।

বলে হিরণ বাঁধের নীচে গঞ্জের চালাঘরের ভিড়ে হারিয়ে গেল। খেলানী সেই দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ভীরু পায়ে সুরীনের নৌকোর দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু নৌকোয় উঠল না। হিরণের জন্য দাঁড়িয়ে রইল।

নদী বড় নিরালা। নৌকো নেই, লঞ্চেরও সময় নয় এখন। আর এ নদীতে লোক নামে না। মৃত্যুদূত-শমন কামটেরা আছে এই তিস্ত নদীর জলে। তবু রক্তাভাখানি তাকিয়ে দেখতে ভাল লাগে।

সুরীন নৌকোর গলুয়ে চুপ করে বসেছিল গালে হাত দিয়ে। খেলানীকে একবার তাকিয়ে দেখছে মাত্র। কিছুই বলেনি।

একটু পরেই হিরণ এল। বলল, উঠিসনি?

খেলানীর চোখে এর মধ্যেই অভিমানের ছায়া। বলল, তুমি চলে যেইছিলে যা।

বলে হিরণের দিকে তাকাল। হিরণ হাত বাড়িয়ে খেলানীর হাত ধরে বলল, আয়। নৌকোয় উঠে, নির্দেশ দিল হিরণ, মাটোখারির ঘাটে চল সুরীন।

খেলানী গঞ্জের দিকে তাকিয়ে রইল। মা খুঁজতে আসবে হয়তো এখুনি। পরে সুরীনের কাছে খবর পাবে। তখন এই ঘাটে বসে কাঁদবে, গাল দেবে।

খেলানী ফিরে তাকাল হিরণের দিকে।

হিরণ বলল, কোথায় যাবি খেলানী?

খেলানী বলল, জানি না।

হিরণ বলল, শহরে যাবি?

—কোন্ শহরে?

—কলকাতায়।

খেলানীর দুই চোখে কলকাতার কল্পনা রংমশাল হয়ে জ্বলে উঠল। বলল, যাব।

কলকাতা কোনোদিন দেখেনি খেলানী।

হিরণ জিজ্ঞেস করল, পুঁটলিতে তোর কী আছে?

—দুইখানা কাপড়, দুইখানা জামা।

হিরণের ঠোঁটে একটু হাসির আভাস ফুটল। তার চোখে মুখে কোথাও একটি মেয়ে নিয়ে পালাবার ত্রাস উত্তেজনা নেই। যত ভাবনা সব যেন ওই চোখে আর আলুথালু চুলের অন্ধকারে মিশে আছে।

নৌকো থেকে পাড়ে ওঠবার সময় খেলানীর হাত থেকে পুঁটলিটা নিয়ে, নৌকোয় ফেলে দিল হিরণ। বলল, ও কাপড় থাক্। শহরে গিয়ে নতুন কাপড় পরবি। ওগুলো তোর মাকে দিয়ে দেবে সুরীন, কেমন?

খেলানী হিরণের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে তার বুকের কাছে ঘেঁষে এল। এসে তাকিয়ে রইল পুঁটলিটার দিকে। ওই পুঁটলিতে তার বিয়ের স্মৃতি ছিল একটি। কিন্তু সে আর হাত বাড়িয়ে নিল না।

হিরণের বুকের আড়ালে আড়ালে, মাটোখারির মোটরে করে মহকুমা শহরে এল। মহকুমা শহর থেকে কলকাতা।

মধ্য কলকাতায় যে-বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল হিরণ, সেখে, খেলানী তার জামা টেনে ধরল। বলল, কোথা যাইছ?

হিরণ বলল, ভয় পাচ্ছিস কেন, এইখানে আমার বাসা আছে। কড়া নাড়ল হিরণ।

একটি লোক এসে দরজা খুলে দিল।

সামনে ছোট একটি উঠোন। তারপরে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি।

হিরণ দোতলায় উঠল। দোতলার দরজার মাথাতেই সাইনবোর্ড ছিল, রুবি হোটেল। ফুডিং অ্যান্ড লজিং। চার্জ মডারেট।

কিন্তু হিরণ সে সব ফিরে দেখল না। বারান্দায় যিনি চেয়ারে বসেছিলেন, তাকে জিজ্ঞেস করল, তেতলার সিঁড়িঘরটা খালি আছে তো মহেন্দ্রবাবু?

মহেন্দ্রবাবু হাঁ করে দেখছিলেন খেলানীকে। বললেন, হ্যাঁ, আছে বৈ কি। কিন্তু এটি কে হিরণবাবু?

হিরণ বলল, বউ।

মহেন্দ্রবাবুর নড়া দাঁতগুলি জিভের ধাক্কায় টলমল করতে লাগল। কপালের ওপর যেন দলা পাকাতে লাগল কালো কালো পুরু সাপ।

কিন্তু খেলানীর হাসি পেয়ে গেছে।

মহেন্দ্রবাবু বললেন, বিয়ে করলেন কবে?

—এই দু চারদিন।

—দু' চারদিন। এই ভাদ্র মাসে?

—হ্যাঁ। দিন্ চাবিটা দিন।

বলে সে টেবিলের কাছে গেল। চাবিটা দিতে দিতে মহেন্দ্রবাবু ফিসফিস করে বললেন, দেখবেন, কোনো রকম হরণ ফোসলানোর কেস্‌টেস্ হবে না তো। হোটেলটিই কিন্তু ভরসা।

হিরণ খেলানীর হাত ধরে তেতালার সিঁড়ি উঠতে উঠতে বলল, না, সে ভয় নেই।

সিঁড়ি-ঘরের দরজা খুলে বাতি জ্বালল হিরণ। ছোট একটি বিছানাও গুটানো ছিল সেখানে। গত বছরের একটি ক্যালেন্ডার দেয়ালে, তাতে একটি মেশিনের ছবি।

হিরণ বলল, এই ঘরটায় আমরা থাকব। কেমন লাগছে?

একটু যেন কুণ্ঠার সঙ্গেই বলল খেলানী, ভাল।

হিরণ আর একটি দরজা খুলল। আলসে ঘেরা বড় ছাদ। নীচে রাস্তা। সেখানে গাড়ি ঘোড়া লোকজন। খেলানী উঁকি দিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারল না। তার ঠোঁটের কোণে, চোখের তারায় বিস্মিত খুশির হাসিটা একটু একটু করে ছড়াতে লাগল। একটু একটু করে সর্বাঙ্গে একটা ঢেউ লেগে যেন সে কেঁপে উঠে হিরণের বুকের কাছে লেপটে এল।

হিরণ বলল, ভাল লাগছে খেলানী?

খেলানী ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, খুব ভাল লাইগছে আমার।

হিরণ তাকে বুকের মধ্যে সাপটে নিয়ে বলল, আমরা এখন এখানেই থাকব তা হলে।

হিরণকে শুধু মহেন্দ্রবাবুই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। হিরণ শাড়ি ব্লাউস, সায়া, আয়না চিরুনি আলতা পাউডার স্নো, কিছু বাদ দিলে না। বিকেল হলেই খেলানীকে নিয়ে হয় থিয়েটার, না হয় সিনেমায়।

মহেন্দ্রবাবু চিরকাল জানতেন হিরণ একটি ভবঘুরে লোক। মাঝে মাঝে আসে। দু' এক মাস থাকে। আবার চলে যায়। শোনা যায়, কাগজেপত্রে নাকি কী সব লেখে। অর্থাৎ পত্রপত্রিকায়।

কিন্তু বিয়ে? মহেন্দ্রবাবু চিরকাল হিরণের মুখে শুনে এসেছেন, মেয়েমানুষের সঙ্গে ঘর? মাপ করবেন মহেন্দ্রবাবু। ওর মধ্যে নেই।

সেই লোক হিরণ? তাও আবার ওই জংলীদের মত দেখতে একটি মেয়ে। খালি হাসে নয় তো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু এক মাস গেল না, খেলানী হাঁপিয়ে উঠল।

একদিন বলল, মনটা আমার টিকছে না এখেনে। আর কোথাও চল।

হিরণ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল খেলানীর দিকে। এর মধ্যেই একটু যেন ফর্সা হয়ে গেছে খেলানী। লাবণ্যে ঢলঢল করছে। চোখের তারায় একটি ঢুলুঢুলু আবেশ।

সে বলল, যাবি?

খেলানী বলল, হ্যা, আর কোথাও চল।

হিরণ বলল, আর দুটো দিন দেরী কর। তারপরে যাব।

দুদিন হিরণের নাওয়া খাওয়া বেড়াবার সময় হল না। তৃতীয় দিন বাসা ছেড়ে, খেলানীকে নিয়ে বেরুল। কিন্তু জামাকাপড় সব পড়ে রইল।

হিরণ বলল, একটা বাড়তি শাড়ি নে, আর জামা নে। এগুলো এখানেই থাকুক এখন।

ভোর ভোর বেরিয়ে আবার সেই দক্ষিণের পুনর্যাত্রা দেখে খেলানী বলল, কোথা যাইছ গো?

হিরণ বলল, সাগরে।

—সাগরে?

—হ্যা। আকুশা দ্বীপের নাম শুনেছিস খেলানী?

—না।

—সেখানে আমার এক বন্ধু আছে। শুকনো মাছের কারবার করে। সেখানে যাব।

খুব খুশি খেলানী। যাক, জগপুরে তো নয়। মাটৌখালির ঘাটে তো নয়। সাগরে, আকুশা দ্বীপে যাবে।

আশ্বিন মাস। সাগরের চেহারা খুব সুবিধার নয়। কিন্তু মাঝি যখন সাহস করল, তখন পিছনে ফেরবার কারণ নেই।

সন্ধ্যা ঘেঁষে প্রথম ভাটার মুখেই নৌকা ভাসল। মাঝ রাতে নৌকা নাচতে লাগল উথালিপাথালি। মাঝিরা চিৎকার করে কন্-গুলি অনামী দেবতার সঙ্গে কথা বলল। খেলানী কেঁদে বমি করে অস্থির। কিন্তু ভোররাত্রেই নৌকা এসে লাগল আকুশা দ্বীপে।

হিরণ যাকে বন্ধু বলে পরিচয় দিল, সে লোকটার বয়স হিরণের চেয়ে বেশী বলে মনে হল। মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। রক্তাভ চোখ।

বালির ওপরে বাঁশের ঘর। মাথায় গোল-পাতার ছাউনি। আকুশা দ্বীপেও বন আছে। সেদিকটায় কেউ যায় না।

লোকটির নাম অধীর। সে ছাড়াও আর তিনজন শুকনো মাছের ব্যবসায়ী আছে এই দ্বীপে। প্রত্যেকেরই দু তিনটি করে নৌকো, জনা পাঁচ ছয় করে মুসলমান মাঝি আছে।

হিরণ বলল, অধীর, তোর এখানে কিছু-দিন থাকব।

অধীর বলল, দ্বীপে! থাকতে পারবি?

—কেন, থাকিনি আগে?

—তখন একলা ছিলি।

—খেলানী থেকে দোকলা হয়েছি বটে। কিন্তু একলারই সামিল। যেখানে যাব, সেখানেই যাবে ও।

অধীরের মুখে একটু অস্পষ্ট হাসির আভাস দেখা গেল। সে খেলানীকে ঘরে বসাল ডেকে। হিরণকে ডেকে নিয়ে গেল বাইরে। বলল, তা হলে সারা দেশ ঘুরে এত-দিন বাদে সেই মেয়েকে খুঁজে পেলি?

—কোন্ মেয়েকে?

—যে তোর মতই যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারবে? তোর তত্ত্বে বিশ্বাস করবে?

—বোধহয়।

অধীরের ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম একটি হাসি আবার দেখা দিল। বলল, এমন করে বোধ-হয় বাগবাজারের অরুণা ঘোষও থাকতে পারত।

হিরণ ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বলল, মিথ্যে কথা। থাকতে পারলে নিশ্চয়ই কেরানী বিয়ে করে ঘর করত না।

অধীর বলল, আর বিজলী চৌধুরী?

হিরণ বলল, ও-পাখি তো সোনার খাঁচা ছাড়া কিছু চিনতই না।

অধীর বলল, কিন্তু কণা হালদার তোর সঙ্গে ভাসতে চেয়েছিল।

হিরণের হাসিটা ছুরির ফলার মত চকচকিয়ে উঠল। বলল, মেয়েটার সাহসের ভড়ং ছিল খুব। আসলে মেয়েটার ধারণা ছিল, আমার মত একটা বিকৃতমনা ভবঘুরে পুরুষকে ও জয় করবে, তারপরে মাথায় শামলা পরিয়ে, মুখে পান গুঁজে দিয়ে, টা টা করে চাকরি করতে পাঠাবে।

অধীর হেসে ফেলল। বলল, তুই দেখছি কিছুতেই আর মত বদলালিনে হিরণ। সংসারে থাকতে গেলে, কণা বিজলীরা ছাড়া উপায় কী? একটা বাঁধা নিয়মে কাজকর্ম ছাড়াই বা রাস্তা কোথায়?

হিরণ বলল, সেইজন্যেই ওদের জড়াইনি। সংসারে ইচ্ছেমত, খুশিমত থাকতে চাই। সেইজন্যেই খেলানীকে নিয়ে বেরিয়েছি। ও তো আমাকে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি আফিসে নিয়ে তুলবে না কাছা টেনে ধরে। বি এস-সি পাস করেছি বলে, চিপটেন কেটে কেটে প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক না হতে পারার জন্য খোটা দেবে না। বাঁধা সড়কের ধারে ভদ্রলোক হয়ে বাস করতে চাইনে বলেই বউ করেছি খেলানীকে।

—কিন্তু এটাকে কী জীবন বলে হিরণ।

—প্রতিবাদের জীবন।

—তা হলে রাজনীতি করলিনে কেন?

—সেটাও ওই সব নামী অনামী ভদ্র-লোকেরাই করে থাকেন।

অধীরের শান্ত হাসিটাও প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ ও বিদ্রূপাত্মক মনে হল। বলল, খেলানী যদি কোনোদিন বাঁধতে চায়?

হিরণ বলল, ফেলে রেখে যাব।

অধীর প্রসঙ্গ ত্যাগ করল। বলল, আমা-দের মুক্তারানী স্ট্রীটের বাসায় গেছিলি নাকি?

—হ্যা। তোর দাদা বউদি ভালই আছেন। তোর বউদির এখন তেরোটি সন্তান, সকলেই ভাল আছে। তুই নাকি রাগ করেই এ ব্যবসায় পড়ে রইলি, তোর দাদা বল-ছিলেন।

অধীর বলল, রাগটা দাদার ওপর নয়। কার ওপর ঠিক বলতে পারছিনে। কিন্তু এক ভদ্রলোকের ঘাড়ে বসে, ম্যাট্রিক ফেল করে বারো বছর বিনা পয়সায় খাওয়া, সেটাও আর সম্ভব ছিল না। এই ভাল আছি।

বলে অধীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হিরণ বলল, যতদিন থাকি, তোর কাজেকর্মে সাহায্য করব। খেলানী আর আমি, দুজনেই করব। তাড়ানর দরকার হলে আগেই বলিস।

অধীর হেসে বলল, বাঃ। সংসার পাতবার আগেই সংসারী লোকের মত কথা বলছিস যে? তবে কাজকর্ম যদি করিস, তাড়াব না। বিনে মাইনের লোক তো শত্রু হলেও।

হিরণ বলল, কিন্তু পেটভাতা আছে।

—সেটাও লাভের।
অধীর হাসল।

খেলানী অকূল হয়ে গেল সমুদ্রের মত। আর সেই অকূলে শুধু হিরণই নয়। গোটা আকাশা দ্বীপের মাঝিমাল্লা মাছমারারা সবাই যেন খেলানীর সংস্পর্শে এসে এই দূর নির্জন দ্বীপে ঘরের কথাটা মনে করতে পেরে বেঁচে গেল।

মাঝে মাঝে খেলানী মুখ ভার করে থাকে। যেমন মুখ ভার করে এই দ্বীপের আকাশ।

হিরণ বলে, কি হয়েছে খেলানী?

খেলানী বলে, তোমার মুখে হাসি নাই কেন সারাদিনে? খালি বন্ধুর সঙ্গে কথা, কথা আর কথা।

হিরণ-অধীরের অবুঝ কথাগুলির ওপর বড় বিতৃষ্ণা খেলানীর। সে চায়, হিরণ শুধু তার কাছে থাকুক।

হিরণ আদর করে বলে, তুই আমার মুখে হাত চাপা দিলেই পারিস।

মেঘ খুব তাড়াতাড়ি কাটে খেলানীর মুখের। দৌড়ে ছুটে বালি ছিটিয়ে, মাছের পেট চিরে রোদ ছড়ানো বালিতে শুকোতে দিয়ে, হেসে নেচে খেলানী যেন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না।

অবশ্য খেলানীর শরীরে আর একটু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এই দেড় মাসের মধ্যেই, চোখের কোলে একটু কালি, চাউনিতে একটি মদির ক্লান্তি। কালো হয়েছে আরো একটু, সেটা হিরণও হয়েছে। এখানে সবাই কালো হয়ে যায়।

একদিন সন্ধ্যায় হিরণ আর খেলানী সমুদ্রের ধারে বসে আছে, অধীর তার মাঝিদের নিয়ে মাছ ধরতে গেছে। এখনো ফেরেনি। যদিও অধীরের যাবার কথা নয়, তবু সে মাঝে মাঝে যেতে ভালবাসে।

আকাশ সেদিন পরিষ্কার। অগ্রহায়ণের আকাশ জুড়ে রক্তাভা। দূরে, বহু দূরের উত্তরের কালচে রেখাটা বোধহয় খুলনার ইশারা। জোয়ার আসার সময়। সামনের জলে যে স্তব্ধতা, তাকে ভাঙতে আসার সুদূর ধ্বনিটা স্তিমিত সোঁ সোঁ শব্দে বাজছে।

খেলানী বলল, কত জল গো? ই জল কোথা শেষ হইচে গো?

হিরণ বলল, কোথাও নয়।

—কোথাও নয়?

হিরণ বলল, না খেলানী। এই গোটা পৃথিবীটার তিন ভাগ জল, এক ভাগ মাত্র মাটি।

খেলানী যেন হতবাক হয়ে গেল। বলল, তিন ভাগ জল? আ মা গো।

তারপরে খেলানী ফিরে বলল, আমার
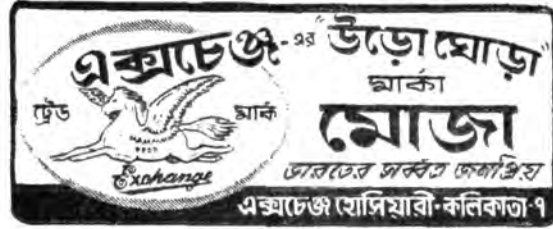
আর এখেনে ভাল লাইগছে না, বুইলে?

হিরণ বলল, চলে যাবি?

—হ্যাঁ।

—কোথায় যাবি?

—যেখেনে যাবে।

—বেশ। কাল পরশুই যাব।

একদিন পরেই হিরণ অধীরের মাঝিদের সংগে পাড়ি দিল। তুলে নিয়ে গেল কাকদ্বীপে।

খেলানী মুখটি অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখে বলল, কোথা যাবে এখন?

হিরণ বলল, এখন কলকাতা যাব খেলানী, তারপরে দুদিন কি চারদিন বাদে, অন্য জায়গায় চলে যাব।

খেলানী বলল, আমি কিন্তুক যাব না।

হিরণ থমকে গেল।—যাবিনে?

—না।

খেলানী হাত ধরে কাছে টেনে মুখ তুলে ধরল। খেলানীর মুখে যেন একটি বিচিত্র রহস্যের হাসি।

হিরণ যেন ভয় পেল হঠাৎ। বলল, কবে কোথায় যাবি?

খেলানী বলল, জগপুরে।

—জগপুরে?

হিরণের সেই গাছপালাহীন পাহাড়ের মত ভাবলেশহীন মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বলল, তুই পরশু আকাশায় বমি করছিলি কেন বল তো?

লজ্জায় মাথা নীচু করে, নখ দিয়ে মাটি খুঁটতে লাগল খেলানী। বলল, বলা যায় নাকি? বুইঝতে পার না?

এই প্রথম বুঝল হিরণ, খেলানী গর্ভবতী হয়েছে। তাইতে ওর এত আনন্দ?

মুখ আরো কঠিন হল হিরণের। সে বলল, কিন্তু আমি তোর সংগে তো সেখানে যাব না। তোর কাছে ওখানে থাকতে পারব না।

খেলানী হিরণের জামার বোতাম খুঁটতে খুঁটতে বলল, তুমি যাওগা, বুইলে? তুমি যাওগা, আমি ফিরে যাই। মন কইরলে আবার এইস জগপুরে, অ্যাঁ। আইসবে তো?

হিরণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খেলানীর মুখের দিকে। এমন কথা কোনো মেয়ের মুখে সে আর কোনো দিন শোনেনি। শুধু কি রক্তের কোষ ভরে এইটুকু নিতেই তার সংগে এসেছিল খেলানী? এইটুকু নিয়ে ফিরে যাবে আবার সেই আবাদের জগপুরে, গঞ্জে ভোঁড়ি বাঁধে। খাটবে খাবে, ছেলে নিয়ে হাসবে? হিরণকে বাঁধবে না, ডাকবে না, খোরপোষ খেসারত কিছুই চাইবে না!

খেলানী জামা ছেড়ে দিয়ে কয়েকটা নৌকার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওরা ক্যানিং হইয়ে উত্তরে যাবে। আমি ওদের সাথে যাইগা, অ্যাঁ?

হিরণ যেন নিশিপাওয়া মানুষের মত বলল, যা।

খেলানী একটু যেন আদরের আশা করল। হিরণের চুলে গালে হাত বুলিয়ে বলল, জগপুরে আবার এইস, কেমন?

হিরণ তাকিয়ে রইল। খেলানী নেমে গেল জলের দিকে। একটু পরেই ব্যাপারীদের ঘুঁটিন নৌকা ছেড়ে গেল।

হিরণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তার মনে হল, জীবনে এই প্রথম পৃথিবীর এক ভাগ স্থলের এক কোণে সে তার বহু যুগ যুগান্তের ফেলে আসা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে।

সেতুর কথা

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গোধূলির ম্লান অস্তরবিরশ্মি-রঞ্জিত বর্ণাঢ্য প্রদোষে অথবা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাস্নাত নিশীথে স্রোতস্বিনীর উপর সুন্দর একটি সেতু সত্যই তটিনীবক্ষে যেন এক সুরচিত স্নিগ্ধ কবিতা, যেন স্বর্গারোহণের এক সুবিন্যস্ত সোপানশ্রেণী। সেতুর ইতিবৃত্ত মানবজীবনের দূরদৃষ্টি ও অসীম সাহস, দুরাশা ও দুরাকাঙ্ক্ষা, বিষাদ ও বেদনা, চেষ্টা ও উদ্যমের এক মহাকাব্য। সেতু শুধু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের, প্রয়োজন ও মনোন্নয়নের মাধ্যম নয়, মানুষের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও বাহুর এক সমবেত প্রচেষ্টার অভূতপূর্ব কাহিনী। সেতু শুধু ইস্পাত আর ইঁট-পাথরের সন্নিবেশ নয়, স্ট্রেস-স্ট্রেনের জটিল সমন্বয়ই নয়, এটি মানুষের এক অনন্যসাধারণ সৃজন-প্রতিভার অভিব্যক্তি; আদর্শ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূর্ত বিকাশ। সেতু বিভাগকে করে বিদূরিত, দূরকে করে নিকট, পরকে করে বন্ধু। প্রবাদ আছে, একা নদী বিশ ক্রোশ। সেতু-সংযোজনায় সেই দূরত্ব হয় দূরীভূত। যান-চলাচল ও বাণিজ্যের হয় সুবিধা। সেতু-রচনার নৈপুণ্যের বিবর্তনধারা সভ্যতার ইতিহাস ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির নিদর্শন, ইঞ্জিনীয়ারিং-বিদ্যার ক্রমোন্নতির উদাহরণ, তৎকালীন মানুষের সৌন্দর্যবোধের পরিচয়, কালের অর্থনৈতিক পরিমাণজ্ঞাপক আলেখ্য, লোকায়ত্ত শাসনের পরিমিতির পরিচয়। সেতু উচ্চনীচনির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের প্রয়োজন মেটায়। সেতু পরিকল্পনাকারী ইঞ্জিনীয়ার ও কর্মিবৃন্দের সমবেত প্রচেষ্টার এবং বিজ্ঞান ও কলাকুশলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্তমান জনগণের প্রেরণা, দূরদৃষ্টির স্মারকচিহ্নস্বরূপ অনাগত ভবিষ্যতের সন্তানসন্ততির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ঐতিহাসিক অবদান।

এক সেতু-উদ্বোধনী সভায় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেছিলেন, "এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে, সেতু-নির্মাণের কাহিনী সত্যই বহুলাংশে মানব-সভ্যতার ইতিবৃত্ত। এর প্রগতি থেকে সহজেই মানুষের অগ্রগতির এক বৃহৎ অংশের পরিমাপ করতে পারি।"

সত্যই রুজভেল্টের উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হয় যখন আমরা দেখি সেতু-নির্মাণকারী ইঞ্জিনীয়ারদের একসঙ্গে গাণিতিক, ধাতুতত্ত্ববিদ, ভিত্তিরচনা-বিশেষজ্ঞ, ইস্পাত-ব্যবহারক, শিল্পী, স্থপতি ও মানবজাতির এক অধিনায়ক হিসাবে। যদিও সেতু-নির্মাণবায়ের প্রায় অর্ধেক মৃত্তিকা ও নদীগর্ভে প্রোথিত থাকে, যা মানুষের নয়নগোচর হয় না। তবুও যা নভ-চুম্বন করার দুরন্ত প্রয়াসের অভিজ্ঞানস্বরূপ দীপ্ত গৌরবে দণ্ডায়মান, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

সেতু-নির্মাণের ইতিহাসে প্রাকৃতিক পরিবেশ, নৈসর্গিক গঠন উপাদান, পৃথিবীর বিভিন্ন মণ্ডলের আচ্ছাদনের উপর সেতুর আকৃতি ও রূপ নির্ণয়ে যুগে যুগে উদ্যোগী পুরুষসিংহকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এর বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ক্রমাগত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রথম যেদিন এক বৃক্ষকাণ্ড বা প্রস্তরখণ্ড যাযাবর মানুষ নির্ঝরিণী পার হবার জন্য স্থাপন করে, সেই দিনই সেতুর ইতিহাসের শুরু। প্রসারণী খিলান বা ঝুলন-সেতুর প্রেরণা, প্রকৃতির রম্য নিকেতন থেকেই যে গ্রহণ করা হয়েছে, তা অনস্বীকার্য।

সেতুর বিভাগ নানাভাবে করা যায়। যেমন বিভিন্ন প্রণালীতে সেতুর ভার, ভারগ্রাহী ভিত্তির উপর সংস্থাপনের প্রক্রিয়ার উপর।

১। সহজভাবে বসানো সেতু (simply supported)।

২। সংযোজনী সেতু বা অবিচ্ছিন্ন সেতু (continuous)।

৩। অর্ধবৃত্তীয় বা বৃত্তাভাসীয় সেতু (arch)।

৪। প্রসারণী সেতু (এক দিক সংলগ্ন ও অপর দিক মুক্ত) (cantilever)।

৫। ঝুলন-সেতু (suspension)।

৬। প্রসারণী ঝুলন অথবা প্রসারণী গার্ডার সেতু (combined)।

গঠনসামগ্রীর উপর সেতুর উত্তার বহুলাংশে নির্ভর করে। যেমন ৪০০০ ফুট উত্তরের সেতু কোনদিনই কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত হতে পারে না। গঠন উপাদানের উপর সেতুকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—

১। কাষ্ঠনির্মিত সেতু বা দারুময় সেতু।

২। প্রস্তরনির্মিত সেতু।

৩। ইষ্টকনির্মিত সেতু।

৪। কাণ্ড-লৌহনির্মিত সেতু (wrought iron).

৫। ইস্পাতনির্মিত সেতু।

৬। উচ্চ টানের ইস্পাতনির্মিত সেতু high tensile).

৭। শক্তিসম্বন্ধ কংক্রীটের সেতু (reinforced concrete).

৮। পাইপনির্মিত সেতু।

৯। অন্য ধাতুর সেতু।

প্রাকৃতিক ঝুলন সেতু

১০। ইস্পাত অথবা উচ্চ টানের ইস্পাতের তারনির্মিত সেতু (cable wire)।

১১। অপূর্ব শক্তিসম্বন্ধ কংক্রীটের সেতু (pre-stressed concrete).

নির্মাণপ্রণালীর বিভিন্নতার দিক দিয়ে বিচার করলে নিম্নলিখিত পর্যায়ে সেতুকে বিভক্ত করা যায়—

১। ইস্পাতের চাদরনির্মিত কড়ি বা পাটি গার্ডার (plate girder)।

২। দৃঢ়ভাবে শলাকাসম্বন্ধ ইস্পাতের কাঠামো বা রিভেট্ মারা ট্রাস (rivetted truss).

৩। শঙ্কু-নিবন্ধ লোহ কাঠামো বা পিন দিয়ে জোড়া ট্রাস (pin-jointed truss)।

সেতুনির্মাণে দুটি প্রধান অংশ থাকে—একটি ভিত্তিস্তম্ভ, অপরটি উপরে দৃশ্যমান গঠিত অংশ অর্থাৎ সাধারণত যাকে সেতু বলে থাকি। বহু উত্তারের সেতু-নির্মাণে সবচেয়ে সস্তায় সেই সেতুনির্মাণ সম্ভব, যার একটি সেতুস্তম্ভের ব্যয় উপরের একটি জ্যা নির্মাণের ব্যয়ের সমান। এটি গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়।

লৌহবর্ত্ম ও রাজবর্ত্ম সেতুর বিভিন্ন অংশে স্থাপনের উপর সেতুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

১। শিরোগামী সেতু বা ডেক শ্রেণীর (deck)

২। অর্ধ-মধ্যগামী সেতু (half-through)।

৩। পূর্ণ অন্তর্গামী বা পূর্ণ মধ্যগামী সেতু (full-through)।

তা ছাড়া একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল সেতু আছে। কোথাও বা সেতু বাড়ির মত চাল দিয়ে ঢাকা, কোথাও বা সেতু খোলা যায়, যার অর্ধ উত্তারকে ডাইনে-বাঁয়ে পাক দিয়ে সরিয়ে যেমন পোর্ট কমিশনারের সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোডের সেতু, কোথাও বা কাৎ করে উপরে উঠিয়ে, কোথাও বা সমস্তটা লম্বাভাবে খাড়া উপরে তুলে, যেমন বাগ-বাজারের খালের মুখের সেতু। কোথাও বা বয়া ভাসিয়ে ভাসমান পুল তৈরি করা হয়, যেমন প্রাচীন হাওড়ার সেতু ছিল।

এখন বিভিন্ন রীতিতে সেতুভার ভিত্তির নিক্ষেপণের প্রক্রিয়ার উপর সেতু বিভাগের কথাই শুধু আলোচিত হবে।

১। সহজভাবে বসানো সেতু

একটি কড়ি অথবা ওই জাতীয় ইস্পাতের গঠনকে দুটি সরলোন্নত সেতুস্তম্ভের অথবা তীরস্তম্ভের উপর ন্যস্ত করলে সেতুর ভার লম্বভাবে দুই স্তম্ভের উপর পড়বে। এইরূপ সেতুকে সহজভাবে বসানো সেতু বলে। ইস্পাতে তৈরি এইরূপ সেতুর উত্তার ৬০০ ফুট; নিকেল-ইস্পাতে নির্মিত হলে ৭৫০ ফুট পর্যন্ত করা যায়। ইলিনয় প্রদেশে মেট্রোপোলিস শহরে ওহায়ো নদীর উপর সেতুটি ৭২০ ফুট উত্তারের, ক্যানাডায় নবস্কোশিয়া প্রদেশে প্রায় ৩০০ ফুট উত্তারের কাষ্ঠনির্মিত সেতুও দেখেছি। পাটি গার্ডারে ১০০ থেকে ১২০ ফুট দীর্ঘ জ্যারের সেতুনির্মাণের রীতি। পাটি গার্ডারের গভীরতা উত্তারের ১।১২ হইতে ১।২০ ভাগ সাধারণত হয়।

২। সংযোজনী বা অবিচ্ছিন্ন সেতু

যদি সেতুর কাঠামোকে তিন বা ততোধিক ভারগ্রাহী সেতুস্তম্ভের উপর স্থাপন করা যায়, তাকে সংযোজনী সেতু বলে। যদিও সেতুর ভার লম্বভাবে তীর বা সেতুস্তম্ভে ন্যস্ত করা যায়, কিন্তু মধ্যস্তম্ভের অবস্থিতির দরুণ লোহ কাঠামোর মধ্য-স্থলে সর্বাধিক বক্রীকরণের (Bending Moment) বহু চ্যুতি ঘটে ও বক্রীকরণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কংক্রীটের সেতুতে এই প্রণালীর সুযোগ নেওয়া হয়।

৩। অর্ধবৃত্তীয় বা বৃত্তাভাসীয় সেতু

এর আকৃতি প্রাচীন কালের বাড়ির দরজা-জানলার উপর খিলানের অনুরূপ, কিন্তু আকারে বৃহৎ। বর্তমানে দরজা-জানলার উপর লিণ্টেল দেওয়ারই রেওয়াজ অধিক। তা ইস্পাতের, প্রস্তরের, ইস্টকের অথবা কংক্রীটের (সাধারণ অথবা শক্তি-সংযোজিত) হয়ে থাকে। এর ভার কতক ঋজুভাবে এবং কতক তির্যকভাবে ন্যস্ত হয়। যেখানে তীরবর্তী ভূমি সেতুর পার্শ্বস্থ চাপ সহজে গ্রহণ করতে পারে, সেখানে সেতু নিম্নের জমি ও নদী থেকে অতি ঊর্ধ্বে এবং যেখানে সহজে সেতু-স্তম্ভ নদীগর্ভে নির্মাণ করা সম্ভব নয়, সেখানে বৃত্তীয় অথবা ঝুলন সেতুর সাহায্য গ্রহণ করার রীতি। তিন হাজার ফিট উত্তারের বৃত্তীয় সেতুনির্মাণ সম্ভব। নিউ ইয়র্ক শহরের হেলগেট সেতুটি ৯৭৭′—৬″ উত্তারের দুই শঙ্কু-সন্নিবিষ্ট জলের উপর থেকে ১৩৫′ ফুট ঊর্ধ্বে অবস্থিত বৃত্তীয় সেতু। এর ইঞ্জিনীয়ার গুস্তাফ লিনডেনথেল এটি পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেন। দুই শঙ্কুযুক্ত সেতু রেলপথ নিয়ে যাওয়ার পক্ষে উপযোগী, কিন্তু তিন শঙ্কুবিশিষ্ট বৃত্তীয় সেতু আরও স্থিতিস্থাপক। তিনটি শঙ্কুর দুটি দুই তীরে এবং তৃতীয়টি শীর্ষে সংযুক্ত।

জাম্বেসী নদীর উপর 'ভিক্টোরিয়া জল-প্রপাত সেতু'টি নদীগর্ভ হইতে ৪০০ ফুট ঊর্ধ্বে, ৫০০ ফুট উত্তারের সেতু। এর নির্মাণকাল ১৯০৭।

হেলগেট সেতুর দীর্ঘ জ্যায়ের বৃত্তীয় সেতুর গৌরব অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হারবার সেতু হরণ করে। এর উত্তার ১৩৫০ ফুট ও চলার পথ নদীর জলের উপর হতে ১৭২

ফুট ঊর্ধ্বে অবস্থিত। সাধারণ নির্মাণ বিভাগের মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার ডাঃ ব্র্যাডফীল্ড সাধারণ বিন্যাস ও রালফ ফ্রীম্যান এর বিশদ পরিকল্পনা ও গণনার জন্য দায়ী। প্রতি ফুটের ওজন ৫৭,৫০০ পাউণ্ড। ১৯৩১ সনের মে মাসে এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ওই বৎসর নভেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কে কিলভ্যানকুল নদীর উপর বেয়নী সেতু খোলা হয়—এর উত্তারের মাপ ১৩৫২ ফুট ১ ইঞ্চি। অর্থাৎ সিডনি সেতুর চেয়ে ২'—১" বেশী। এটির প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন ও এইচ আম্মান। শ্রী আম্মান প্রথমে লিনডেনহলের অফিসে কাজ শুরু করেন। যে সোনার কাঁচি দিয়ে বেয়নী সেতুর উদ্বোধনপর্বের ফিতা কাটা হয়েছিল, সেই সোনার কাঁচি ১৯৩২ সনের মার্চ মাসে পৃথিবীর অপর প্রান্তে সিডনি হারবারের সেতুর উদ্বোধনপর্বের কাজে লাগে। সিডনি বন্দরের সেতুটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভারী সেতু ও সবচেয়ে প্রশস্ত পথ নির্মাণ করা হয়েছে এর উপর।

ফ্রীম্যান দক্ষিণ আফ্রিকার সাদী নদীর উপর ১০৮০ ফুট উত্তারের ব্রীকীনাউ বৃত্তীয় সেতু নির্মাণ করেন। এই সেতু-নির্মাণকার্যে 'ক্রমেডর ইস্পাত' ব্যবহার করা হয়। এটি তৃতীয় দীর্ঘতম বৃত্তীয় সেতু। এই সেতুগুলি বৃত্তীয় সেতুর অর্ধ-মধ্যগামী শ্রেণীর অর্থাৎ এর দুই বৃত্তীয় অংশের মধ্য দিয়া লোহবর্ত্ম ও রাজবর্ত্ম স্থাপিত। কিন্তু খিলানের শীর্ষ দিয়ে পথ স্থাপনের উদাহরণে নিউ ইয়র্ক শহরে 'হেনরি হাডসন' সেতু অন্যতম। এর উত্তার ৮০০ ফুট ও উচ্চতা ১২০ ফুট। পীটসবার্গ শহরের এলিথজী নদীর উপর 'ওয়াশিংটন ক্রসিং' সেতুটি ১৯২৪ সনে যাতায়াতের জন্য খোলা হয়। নায়গ্রা নদীর উপর ১৯২৭ সনে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তির শতবার্ষিকী উৎসবের স্মারকচিহ্নস্বরূপ 'শান্তি সেতু' নামকরণ হয়। ১৯০৮ সনে ডঃ স্টীনম্যানের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস হিসাবে যে ইস্পাতের বৃত্তীয় সেতুর পরিকল্পনা, স্পর্টেম ডেভিলে', পঁচিশ বৎসর পরে, সে-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হয়। নায়েগ্রার 'হনিমন সেতু' বরফের আক্রমণে নদীগর্ভে পতিত হওয়ায় সেখানে আর-একটি সেতু ৯৫০' উত্তারের ১৯৪১ সনে নির্মিত হয়। এটি বৃত্তীয় সেতুর চতুর্থ দীর্ঘতম সেতু।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে জাপানে নাগাসাকি শহরে ১০৪২ ফুট উত্তারের একটি দীর্ঘতম ইস্পাতের বৃত্তীয় সেতু নির্মিত হয়েছে। এইটি বর্তমানে বৃত্তীয় চতুর্থ দীর্ঘতম সেতু পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কলিকাতার মারাঠা খালের উপর কয়েকটি কংক্রীটের বৃত্তীয় সেতু বিদ্যমান।

৪। প্রসারণী সেতু

এই সেতু উচ্চ সেতুস্তম্ভ থেকে দু দিকে প্রসারিত। তীরস্থ প্রসারণী অংশটি ভূগর্ভে এমনভাবে নিহিত যে তার ওজন নদী বা সমুদ্রের দিকে প্রসারিত অংশের স্থির ও চলমান যানবাহনের ওজনের চেয়ে যেন কিছু বেশী হয়, যাতে না নদীস্রোতের নিকটস্থ অংশ অবিকল অবস্থায় থাকে। ফার্থ অব ফোর্থের উপর অবিস্মরণীয় সেতুটি দীর্ঘ প্রসারণী সেতুর গৌরব অর্জন করে আসছিল যতক্ষণ না কুইবেকের প্রসারণী সেতুটি তার স্থানটি অধিকার করে। কুইবেক সেতুর নির্মাণকাহিনী এক রোমাঞ্চকর লোমহর্ষণ ঘটনা। নানা বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে মানুষের অদম্য সাহস ও প্রচেষ্টার কাহিনী, ১৯১৭ সনে নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয়। ওইটি ১৮০০ ফুট উত্তারের সেতু। এর নির্মাণকার্য চলে প্রায় পনের বৎসর। ১৯৫৮ সনে সমাপ্ত ১৫৭৫ ফুট জ্যায়ের 'নিউ অরলীএ সেতু'র পর হাওড়ার রমণীয় ব্রীজ। ১৯৪৩ সনে হাওড়া ব্রীজ যানচলাচলের জন্য খোলা হয়। এর দুই তটস্থ স্তম্ভের মধ্যবর্তী জ্যায়ের মাপ ১৫০০ ফুট যার মধ্যস্থলে ৫৬৪ ফুট দীর্ঘের ঝুলন্তাংশ দুই ৪৬৮ ফুট দৈর্ঘ্যের তীরস্থ অংশের উপর ন্যস্ত। (৪৬৮+৫৬৪+৪৬৮=১৫০০) তীরস্থ প্রসারণী অংশদ্বয় ৩২৫ ফুট দৈর্ঘ্যের, দুই পাশ থেকে দুটি ক্রেন ওর নদীবক্ষ থেকে খণ্ড খণ্ড অংশ গ্রহণ করে সেতুটি গঠিত। কোন অতিরিক্ত কাঠামো গঠনের প্রয়োজন হয়নি। পৃথিবীর দীর্ঘতম সেতু ও দীর্ঘ জ্যায়ের সেতুর গৌরব স্যানফ্রানসিসকো শহরের। যখন বাসে দুই দীর্ঘ সেতু অতি-ক্রম করি তখন ইঞ্জিনীয়ারদের কীর্তিতে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। "ওকল্যাণ্ড বে" সেতুটি দুতলা, দৈর্ঘ্যে ঝুলন অংশ ১০,৪৫০ ফুট, প্রসারণী অংশ ১৪০০ ফুট, ৫টি ৫০৭ ফুট উত্তারের গার্ডার ও ১৪টি ৩০০ ফুট উত্তারের সেতু।

৫। ঝুলন-সেতু

ঝুলন-সেতুর ঐতিহ্য অনুসন্ধানে ট্রীকুকের ঝুলনের কাছে যাব না। আরও প্রাচীন কালের দ্রাক্ষা কি মাধুরী লতার বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে যাওয়ার প্রাকৃতিক নিদর্শনের আশ্রয় নেব। ১৮৯৪ সনে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ইঞ্জিনীয়ার বোর্ড সর্ব দীর্ঘ ৪৩৩৫'

হাওড়ার ব্রিজ

জ্যায়ের সম্ভাবনার অংক কষেন। ১৯১৩ সনে বিখ্যাত সেতু-ইঞ্জিনীয়ার রাল্‌ফ্ মড্‌জেস্কী ৭০১০ ফুট পর্যন্ত জ্যায়ের ঝুলন-সেতুর পরিকল্পনা করেন। বর্তমানে ঝুলন-সেতু বলতে গেলে সুবর্ণ-তোরণ সেতুর কথাই মনে পড়ে। ঝুলন-সেতুর প্রধান অংশটি হল ইস্পাতের মোটা তার যা চেন যার উপর সমস্ত ভারের টান পড়ে। ওই ঝোলাবার তার দুই অতিদীর্ঘ সেতুস্তম্ভের উপর দিয়ে চলে গিয়ে দুই তীরস্থ ভিত্তিতে এমনি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন যে সমস্ত ভারের টান সহ্য করতে সক্ষম। এর সুবিধা এই যে টানের মাত্রা ইস্পাতের উপর ৫৫০০০ থেকে ৬০,০০০ পাউণ্ড প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে দেওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের "ব্রুকলীন" সেতু দীর্ঘ বিশ বৎসর দীর্ঘতম ঝুলন-সেতুর গৌরব বহন করে। ১৯০৩ সনে ঈস্ট নদীর উপর "উইলিয়ামস্‌বার্গ সেতু"টি ৪—৬" বেশী দৈর্ঘ্যের ১৬০০ ফুট জ্যায়ের নির্মিত হবার পর প্রথম স্থান অধিকার করে। তারপরে ১৯২৪ সনে 'বেয়ার মাউণ্টেন সেতু' ১৬৩২ ফুট জ্যায়ের, ১৯২৬ সনে 'ফিলাডেলফিয়া কেমডেন সেতু' ১৭৫০ ফুট জ্যায়ের, ১৯২৯ সনে যুক্তরাষ্ট্রের মোটর-নগরী ডিট্রয়েট ও কানাডার মোটর-নগরী উইণ্ডসরকে সংযুক্ত করার জন্য 'অ্যামব্যাসেডর সেতু' ১৮৫০ ফুট জ্যায়ের নির্মাণ করা হয়, কিন্তু এই ক্রমোন্নতির ধারার রেকর্ড পূর্ণ করে ১৯৩১ সনে নির্মিত নিউ ইয়র্কের 'জর্জ ওয়াশিংটন সেতু'। এটি ৩৫০০ ফুট জ্যায়ের। ১৯৩৭ সনে নির্মিত হয় 'সুবর্ণ তোরণ সেতু', ৪২০০ ফুট জ্যায়ের। দীর্ঘ সেতুর নির্মাণের উদ্যম বেশ কিছুদিন স্থগিত থাকে। এর মোট উত্তার ৮৯৮১ ফুট, এর তীরস্তম্ভদ্বয় ৭৪৬ ফুট ঊর্ধ্বে আকাশ বিদ্ধ করে, প্রতি তারটির ব্যাস ৩৮⅜ ইঞ্চি ও ২৭,৫৭২টি তারের ৬১টি গুছিতে প্রস্তুত। ২৭শে মে, ১৯৩৭ সনে এটির উদ্বোধন হয়। সিঁদুরের রঙে রঞ্জিত বলে একে আলোক-প্লাবনে মনে হয় যেন একটি সুবর্ণ উত্তার। ১৯৪০ সনে টেকোমা নেরোসের ২৮০০ ফুট জ্যায়ের সেতু তৃতীয় দীর্ঘ ঝুলন-সেতু, ৬৪ লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত হয়। ডঃ স্টীনম্যানের পরিকল্পনায় মেকিনাক প্রণালীর সেতু পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘ জ্যায়ের ঝুলন-সেতু। তবে দু পাশের জ্যা যোগ করলে এটি দীর্ঘতম ঝুলন-সেতু, যার মোট দৈর্ঘ্য ৮৬১৪ ফুট, যদিও তীরস্তম্ভের অন্তর্বর্তী জ্যা- ৩৮০০ ফুট। এটি গত বৎসর শেষ হয়েছে। এর তীরস্তম্ভের ভিত্তি জলের উপর থেকে ২০৫ ও ২১০ ফিট নিম্নে প্রোথিত। দুই তীরস্তম্ভে ৪,৯০,০০০ টন কংক্রীট ও ইস্পাত লাগানো হয়েছে। অন্যান্য সেতুতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৭৬ মাইল বেগে ঝটিকা-প্রবাহে কিঞ্চিৎ ভয়ের কারণ আছে। কিন্তু 'বিগ ম্যাকের' বেলা ৬৩২ থেকে ৯৬৬ মাইল বেগের ঝটিকাও এর কোন অংশ বিধ্বস্ত করতে পারবে না—মডেলের পরীক্ষায় জানা গিয়েছে। ৫৫২ ফুট উচ্চ তীরস্তম্ভ থেকে ২৪⅜ ইঞ্চি ব্যাসের তারের কেব্‌ল ঝোলানো। ডেভিড স্টীনম্যান বর্তমানে ইটালি ও সিসিলিকে সংযোগ করার জন্য মেশিনা প্রণালীর উপর ৫০০০ ফুট জ্যায়ের একটি সেতুর পরিকল্পনা করেছেন।

৬। প্রসারণী ঝুলন বা প্রসারণী বৃত্তীয় সেতু

উপরিউক্ত দুই প্রকারের সেতু সমন্বয়ে এ ধরনের সেতু গঠিত। প্রকৃতপক্ষে হাওড়া ব্রীজ প্রসারণী ও ঝুলন-সেতুর উদাহরণ। শুধু প্রসারণীর নয়। তেমনি দুই প্রসারণী অংশের মধ্যবর্তী স্থান পূরণের জন্য ঝুলনাংশের বদলে বৃত্তীয় অংশ সংযুক্ত করা যায়।

সেতুনির্মাণের গণনাকার্যে কত দুরূহ ও জটিল গাণিতিক গণনা, বায়ুসুড়ঙ্গে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নির্মাণের সময় অসাবধানতা, অবাধ্যতা ও নিরাপত্তার নিয়মাবলী অগ্রাহ্য করার জন্য অথবা দৈব দুর্বিপাকে কত জীবন বলি দিতে হয়, তার কাহিনী কোন রম্য উপন্যাস বা রোমাঞ্চ শ্রেণীর গল্পের চেয়ে কোন অংশে কম উদ্দীপনাময় নয় বা কম বিস্ময়কর নয়।

মহাশ্বেতা

[১২৮ পৃষ্ঠার পর]

একি সে? পাথর চাপা বিবর্ণ ঘাসের মত বিবর্ণ শীর্ণ প্রায় কঙ্কালসার একটি মেয়ে, মুখের হনুর হাড় দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে, পিছনে ফোলা ফাঁপা একরাশ বিশৃঙ্খল চুল তাকে আরও কদর্য করে তুলেছে, না—কদর্য নয়, বীভৎস। শুধু রয়েছে সেই চোখ দুটো। সেই দুটি চোখ দেখে সে চিনতে পারলে—এ-সে নিজে!

জীবনে ত্যাগ-স্বীকারের এই পরিণতি! পুণ্যফল?

না। জেঠীমা'র কথা সত্য। নিজের আত্মার যে অপমান সে করেছে, এ তার ফল।

অকস্মাৎ সে উঠে চলে গেল সিঁড়ি বেয়ে ছাদের উপর, সূর্যালোকিত পৃথিবীর দিকে তাকালে। ওঃ, এই এক বছরে জায়গাটা কত বদলে গেছে!

সারাটা দিন সে ছাদের উপর ঘুরল। সন্ধ্যেবেলা সে নতুন করে পড়বার জন্য বই নিয়ে বসল। হঠাৎ বেরিয়ে এসে বললে, জেঠীমা আমার দরজায় তালা চাবি দেবেন না।

জেঠীমা তার মুখের দিকে শুধু একবার তাকালেন, কিছু বললেন না। তাতে যত অবজ্ঞা—তত ঘৃণা।

এই মেয়েটির মত নিষ্ঠুর সে আর জীবনে কাউকে দেখেনি! এই নিষ্ঠুর ঘৃণা আর তার কোনদিন যায়নি। শুধু কি তার উপর! এরপর থেকে হেনাকেও তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি যেন তার জীবন-সংস্কারের এক ফলহীন পুষ্পহীন শুধু শাখা পল্লব-পত্র-সার পুণ্য নিযে বিষাক্ত একটা গাছ, যার তলায় রৌদ্র আসে না—ঘন হিম অন্ধকার, আর অহরহ পত্রপল্লব থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে বিচিত্র পুণ্যের বিষবাষ্প। শুধু যেন কয়েকটা দিনের জন্য, যে কারণে মানুষের ব্যাধি হয়, তেমনি একটা কারণে স্নেহের পোকা লেগে একটা ডাল শুকিয়ে ভেঙে গিয়েছিল, তারই মধ্য দিয়ে এসে পড়েছিল খানিকটা সূর্যালোকের দীপ্তি এবং উত্তাপ। আবার সেখানে ডাল গজিয়ে ফাঁকটা সম্পূর্ণ-রূপে ঢেকে গেছে।

এইবার দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য।

এ দৃশ্যে ভাগ্য অদৃষ্ট যদি মানো, তবে ভাগ্য অদৃষ্ট, যদি বিচিত্র কার্যকারণ বল, তবে তাই; যত আঘাত করলে তারা, তত আঘাত করলে সে। হার-জিত ঠিক হয়নি। তবে সে হারেনি, আঘাতে আহত হয়ে শুয়ে পড়েনি। সিন্দুর চিহ্নহীন মাথার সিঁথিটাকে সে মনে করে অপরাজয়ের চিহ্ন। আবার বর্তমান এই অনাথ আশ্রমে বেসিক ইস্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ আঁকড়ে বেঁচে থাকা, এইটেই তার ব্যর্থতার পরিচয়। যার শেষ হবে আজ। হবে নয়, হল।

আজকের কথা থাক।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যের কথা। ৪৫ সালের এপ্রিলে আরম্ভ—৪৯ সালের শেষ দিকে সমাপ্তি। চার বৎসরেরও বেশী। তবে মার সে একা খায়নি। জেঠাইমাও খেয়েছেন। থাক; নাটকের নিয়ম পরের পর সাজানো। শুধু নাটকেরই বা কেন, ক্রমান্বয়, এলোমেলো যা কিছু, তাই বিশৃঙ্খল—অনিয়ম।

যবনিকা তোল। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস; নীরা পড়ছে মুখ গুঁজে, সামনে তার পরীক্ষা। অপরাহ্নবেলা।

দৃশ্যপটে, সেই প্রায় অন্ধকার বারান্দার ঘরখানা নয়। তার বা তাদের ভাগের যে ঘরখানায় একসময় হেনা আর সে দু'জনে শুতো, সেই ঘরখানা। পরে সেই ঘরখানাই নির্দিষ্ট হয়েছিল—হেনা এবং তার স্বামী এলে তাদের জন্য। এখন তারা নতুন দোতলায় শোয়। সে বিনা কোলাহল কলরবে একদিন ওই ঘরখানায় তার বই এবং বাক্স দুটো, যা তার মা রেখে গিয়েছিলেন, সব ওই ঘরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। এবং দেখে শুনে তাদের নিজস্ব যে পুরনো ফার্নিচার পেয়েছিল, তাও টেনে এনে ঢুকিয়েছিল। সব হয়ে গেলে জেঠীমাকে বলেছিল, ওঘরটা অত্যন্ত অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর, আমি আমাদের ঘরটায় থাকব আজ থেকে। অনুমতি নীরা প্রার্থনা করেনি, অত্যন্ত সহজ পদ-ক্ষেপে আপন অধিকারে প্রবেশ করেছিল। জেঠীমা কিছু বলেননি। তবে দৃষ্টিতে তাঁর একটা অবজ্ঞা ছিল। ঘরখানাকে যথাসাধ্য পরিচ্ছন্ন এবং নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করেছিল ছেদপড়া জীবনের নূতন অধ্যায়। সন্ধ্যায় জ্যাঠামশাইকে বলেছিল, আমার কয়েকখানা বই লাগবে।

ভুরু কুঁচকে পরাণবাবু বলেছিলেন, বই? কি বই? কিসের জন্যে?

—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব আমি।

—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে? যেন এর চেয়ে আশ্চর্য বা অসঙ্গত কিছু হতে পারে না।

জেঠীমা ঘরে ঢুকে হেনার চিঠিখানা তাঁর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, পড়। হেনা লিখেছে। আজকের ডাকে এসেছে। তুমি এ ঘর থেকে যাও নীরা।

নীরা চলে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর জ্যাঠামশায় ডেকে বলেছিলেন, ক'খানা বই লাগবে? কত দাম? একটা কথা আমি বলে রাখি। তোমার মা যা রেখে গিয়েছিলেন তার আর খুব বেশী অবশিষ্ট নেই।

মনের মধ্যে কঠিন কথা এসেছিল, কিন্তু সে তা বলতে পারে নি। বোধহয় এতদিন নীরব সহিষ্ণুতার অভ্যাসে খানিকটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। নীরবে দাঁড়িয়ে নখ খুঁটেছিল।

জ্যাঠামশায় বলেছিলেন, যে কটা টাকা আছে, আর তোমার অংশের বাড়ির একটা দাম ধরলে বিয়েটা অবশ্য গৃহস্থঘরে কোন রকমে হতে পারে।

জেঠীমা বলেছিলেন, পরীক্ষাটা দিতে চায়, তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

এবার নীরা বলেছিল, বিয়ে আমি করতে চাইনে। আমাকে বিয়েই বা করবে কে? পরীক্ষাটা দিয়ে পাশ আমি করবই, কোন চাকরী আমি খুঁজে নিয়ে চলে যাব। আমাকে বরং টাকাটাই দিয়ে দেবেন। বলে সে চলে গিয়েছিল। বই সে পেয়েছিল এবং কঠোর পরিশ্রমে সে পড়ছিল।

এগুলো দৃশ্যান্তরের বিরতির মধ্যেই ঘটে গেছে।

এদৃশ্য শুরু যখন, যখন নাটক এল, সেদিন তখন অপরাহ্নবেলা—সে পড়ছে; ঝি চাকরে কাজ শুরু করেছে; জেঠীমা এক ঘটকীর সঙ্গে বড়ছেলের বিয়ের কথা বলছেন। এবার বড়ছেলের বিয়ের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়েছেন; ব্যস্ত কথাটা পর্যাপ্ত নয়, উঠে পড়ে লেগেছেন। বাজারের ফর্দের মত তার বিয়ের কথাটাও আছে।

সে অবশ্য একদিন বলে দিয়েছে, আমার বিয়ের কথা কইবেন না জেঠীমা।

জেঠীমা বলেছেন, আচ্ছা। কিন্তু তবুও বলছেন। সে নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ করবার তার এই মুহূর্তে সময় নেই বলেই সে আর কিছু করেনি।

হঠাৎ মেজছেলে, হেনার ঠিক উপরের ভাই সুজিত বাইরে থেকে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকল—মা। মা! কই? মা!

জেঠীমা বিরক্তি ভরেই বললেন, কি? এইতো রয়েছি। বাইরে থেকে এমন করে চেঁচাচ্ছ কেন?

সে উঠোনে ঢুকেই বললে, তোমার বড়-ছেলের বিয়ে হয়ে গেল।

—বিয়ে হয়ে গেল? মানে? তোর বাবা বুঝি সেই পাটের দালাল হঠাৎ বড়লোককে কথা দিয়ে দিলে? আচ্ছা আমিও দেখব সে বিয়ে কি করে হয়।

সুজিত হেসেই খুন।

—হাসছিস কেন?

—হাসছি কেন? বললাম, বিয়ে হয়ে গেল, না তুমি বলছ—তোর বাবা বুঝি পাকা করলে বিয়ে? না—না। সব পর্ব খতম। বিয়ে শেষ।

—তুই কি নেশা করেছিস? বিয়ে হল কখন?

—আজ। দিনের বেলা। রেজেস্ট্রি করে বিয়ে। আমি তার একজন সাক্ষী। পাটের দালালের মেয়ে নয়। সিনেমা স্টার—এণাক্ষী বোস! ওরফে এনা বোস। ওরা আজ হোটেলে উঠেছে। সেইখানেই রাত্রে খাওয়াদাওয়া এবং বাসর!

নীরার পড়া সহজে বন্ধ হত না; সংসারের নানান আকস্মিকতার মধ্যেও পড়ে যেত। ঝনঝন করে কিছু পড়লে না, দুমদাম শব্দে বড়ভাই অজিত চাকর বা ঠাকুরকে মারলে না, ড্রইং রুমে বসে হঠাৎ সমবেত অট্টহাস্য হাসলে নী, জ্যাঠামশায় পার্টি থেকে ফিরে চিৎকার করলেও না। আজ কিন্তু তার পড়া বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল, হয়তো এমন একটা কিছু ঘটবে—যা সে কল্পনা করতে পারে না, কল্পনাতীত মর্মান্তিক কিছু; কৌতুকে নয়—আশঙ্কায়, তার পড়া বন্ধ হয়েছিল।

আশ্চর্য, জেঠীমা তার কিছুই করেন নি। চিৎকার করেন নি, মাথা ঠোকেন নি, অজ্ঞান হন নি, কিছু করেন নি, শুধু নিঃশব্দে উঠে ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। চিৎকার করেছিলেন জ্যাঠামশায়।

—ত্যাজ্যপুত্র করব আমি। বাড়ি ঢুকতে দেব না। সে বহুতর শপথ এবং আস্ফালন। সুজিত খুক্ খুক্ করে হাসছিল। সে সেই মাত্র হোটেলে বউভাতের ডিনার খেয়ে ফিরেছে।

নীরাই তাকে বলেছিল, তুমি হাসছ কেন সুজিত?

সুজিত ডিনার খেয়ে এসেছে, চোখ তার ঈষৎ রাঙা এবং ঘোরালো, কথায়-বার্তায় তার অপরিসীম কৌতুকবোধ; সে বলেছিল —ত্যাজ্যপুত্র করবে বাবা—তাই হাসছি। অজিত মুখার্জী এক্সপার্ট ছেলে—সে আট-ঘাট বেঁধে কাজ করে। আজই বাবার সই করা ব্যাঙ্ক চেকে—সেল্ফ নাম দিয়ে তিরিশ হাজার টাকা ক্যাশ বের করে পকেটে পুরে রেজিস্ট্রারের কাছে গেছে। টাকাটা সে এনা বোসকেও দেয় নি। তারপর তার নামে যা শেয়ার কেনা আছে, সেসব তার পোর্ট ফোলিওতে। টুডে—দি ওল্ডম্যান—রাগের মাথায় জাম্পিং এ্যান্ড বাম্পিং, কাল আপিসে গিয়ে শিভারিং এ্যান্ড স্ট্যাগারিং। হাসছি সেই জন্যে।

জেঠীমা নীরবে মুখ গুঁজে পড়ে ছিলেন। খান নি। জ্যাঠামশায়ের ক্রুদ্ধ শপথ এবং চিৎকার সত্ত্বেও না। শেষ পর্যন্ত তিনি—যা খুশী তাই করগে, আই ডোন্ট কেয়ার, স্ত্রী পুত্র কারুর জন্যেই আমার কোন মাথা-ব্যথা নেই—বলে—বেশখানিকটা মদ্যপান করে গাল দিয়েছিলেন জেঠীমাকে।

অনেকটা রাত্রে সে গিয়ে ডেকেছিল, জেঠীমা—ঠাকুরটা খাবার নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

তিনি পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। সে আশ্চর্য রকমের একটা আঘাত অনুভব করেছিল। চলেই আসছিল। হঠাৎ জেঠীমা ডেকেছিলেন, শোন।

ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সে।

—তুমি আমার ঘরে ঢুকলে কেন? এঘরে আমার ঠাকুর আছে।

দপ করে জ্বলে উঠেছিল নীরা। নিষ্ঠুর উত্তর দিতে গিয়ে কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছিল। জেঠীমা বলেছিলেন, তুমি, তোমার জন্যেই আমি ছেলের বিয়ে দিইনি। না-হলে এই কাণ্ড আজ ঘটত না।

নীরা আর থাকতে পারে নি, বলেছিল, ঘটত। আমার জন্যে জ্যাঠামশায় এমন করে মদ খাচ্ছেন না। খাচ্ছেন ব্ল্যাক মার্কেটের টাকার জন্যে। এ কাণ্ড আমার জন্যে ঘটেনি ঘটেছে ওই টাকার জন্যে। তবে ভাববেন না। আমি চলে যাব এবার আপনার বাড়ি থেকে। পরীক্ষার ফল বের হলেই আমার কি আছে বুঝিয়ে দেবেন—আমি চলে যাব।

তার পরীক্ষা যেদিন শেষ হল—সেদিন বাড়িতে বউ এল। এনা বোস—এখন এনা মুখার্জী এল। অজিতকে ফিরিয়ে না-এনে পি সি মুখার্জী অর্থাৎ জ্যাঠামশায়ের গত্যন্তর ছিল না। ব্যবসা অচল হত। অনেক জমি তার নামে; মোটা টাকার শেয়ারের অধিকারী সে। একটা মিটমাট হল। টাকা-শেয়ার-জমি অংশমত নিয়ে বাকীটা অজিত ফিরিয়ে দিলে; বাপ বাড়ির অংশ তাকে লিখে দিলেন। তেতলায় দুখানা ঘর উঠেছে। সেখানে হবে তাদের সুখনীড়। এনা মুখার্জী শপথ করে বলেছে, সে আর সিনেমায় নামবে না। বাস মিটে গেল।

জেঠীমা স্বতন্ত্র হবেন। রান্নাবান্না সব।

বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। মন তার ভাল ছিল না। তার চেষ্টা উদ্যম সব বোধহয় ব্যর্থ হয়েছে। পরীক্ষা তার ভাল হয়নি। অঙ্ক ভুল হয়ে গেছে। একটা সে কষতে পারেনি—তিনটের উত্তর ভুল হয়েছে। সেই যে তার মাথার মধ্যে ব্যর্থতার ক্ষোভ জন্মাল তার ফলে সারারাতটা সে ঘুমোয়নি। পরের দিন সংস্কৃতের পেপারে সে যা করেছে তা একটা ছোট ছেলেতেও করে না। একটা কোশ্চেনেরই ডবল উত্তর লিখেছে। 'অর' লেখাটা তার ওই বিভ্রান্তিতেই চোখ এড়িয়ে গেছে। তারপর তার স্নায়ু, ধৈর্য এমনই ভেঙে গেল যে, শেষের দিকে কত ভুল হয়েছে সে তা জানে না। মনে পড়ছে মধ্যে মধ্যে বানান নিয়ে ধাঁধা লেগেছে। ইতিহাসের পেপারে খ্রীষ্টাব্দ ভুল হয়েছে। রচনায় বোধ-হয় শব্দ পড়ে গেছে; অ্যাডিশানাল পেপারে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছু হয় নি; হাত কেঁপেছে; সে ঘেমেছে, কাঁদতে তার এই দিনটিতে ইচ্ছে হয়েছিল, বুক থেকে ঠেলে উঠেছিল কান্না; লজ্জাটায় কাঁদতে পারেনি। কোনরকমে আত্মসম্বরণ করে ফিরেছে। মনে পড়ল ক্লাস নাইনে উঠে অধিকাংশ মেয়ে যখন অঙ্ক ছেড়ে দিয়ে ডোমেস্টিক সায়েন্স নিয়েছিল—তখন অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো পাওয়া আদৌ অসম্ভব নয় বলে, অঙ্কই নিয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে বসে সব পড়াই বোঝা সম্ভবপর হয়েছে—অঙ্ক বোঝা সম্ভবপর হয় নি। তবুও এতগুলো ভুল হবে এ আশঙ্কা সে করেনি। হেনার ছোট ভাই রণজিৎ, সেও তার সঙ্গে পরীক্ষা দিলে। সে খুব খুশী। তার থার্ড ডিভিসন কেউ মারতে পারবে না। কিন্তু তার যে শুধু ফার্স্ট ডিভিসনেও ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

বাড়িতে যখন এল, তখন সে অত্যন্ত ক্লান্ত, হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়েছে। ইচ্ছে ছিল বাড়ি এসেই শুয়ে পড়বে। কিন্তু বাড়িতে তার অবকাশ ছিল না।

বাড়িতে তখন সমারোহের কোলাহল উঠছে। সিনেমা স্টার বউদিকে নিয়ে দেবরেরা কলকল্লোল তুলেছে। চারিদিকে আছাড় খেয়ে পড়ছে তার ঢেউ। বিয়াল্লিশ সালের সাইক্লোনের মধ্যেও সে বিঘ্ন বোধ করেনি। কিন্তু এর মধ্যে বিশ্রাম, ঘুম অসম্ভব। তেতলায় নতুন ফার্নিচার উঠছে। সুটকেস ট্রাঙ্ক উঠছে। বাড়ির দোরে দুখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একখানা অজিতদার। স্ট্যাণ্ডার্ড টুয়েল্ভ। পুরনো হলেও নতুনের মত ঝকঝকে, তার পিছনে হেনার স্বামীর গাড়ি। হেনা এসেছে। কথাটা সে শুনে গিয়েছিল, কিন্তু এমন সমারোহ উচ্ছ্বাস সে —' কল্পনা করতে পারেনি, জেঠীমা বিদ্যমানে। জেঠীমার ঘর-খানি বন্ধ। স্তব্ধ হয়ে তিনি ঘরে বসে আছেন। চাকর ঝি ঠাকুর সব ব্যস্ত। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তার ঘরের সামনের বারান্দায়! ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু দেবে কে? এক কাপ চা পাওয়ারও কোন আশা নেই।

ওর মধ্যে ওর নামটা ধ্বনিত হয়ে উঠল প্রায় কোরাসে।

—নীরা! নীরা! নীরা-দি! নীর:! নীরুদি। চিরুদি।

প্রথম ডাকটা অজিতদার। শেষেরটা হেনার।

তাকালো সে ছাদের দিকে। আলসের উপর ভর দিয়ে সারি সারি মুখ। তার মধ্যে একখানি আশ্চর্য ঝকমকে মুখ সোনা-রুপোর গহনার মধ্যে একখানি মীনা করা আভরণের মত নানা বর্ণে ঝলমল করছে।

—উপরে আয়। নীরা। চা তৈরি। বউ-দির সঙ্গে আলাপ করে যা।

এণাক্ষী মৃদু মৃদু হাসছে। বিজয়িনী গরবিনীর প্রসাদ-ঝরা হাসি। প্রকাশে সে আকারে আয়তনে মৃদু অর্থাৎ ঈষৎ, কিন্তু ওজনে সে সোনার চেয়েও গুরুভার; তার আলোর প্রতিচ্ছটায় ঝিকিমিকির মধ্যে চোখ ধাঁধানো কৌতুক: সর্বোপরি তুমি ধন্য হয়েছ, এইটে নাটকের স্বগতোক্তির মত অভিব্যক্ত।

তবু সে গেল।

তেতলার সিঁড়ির মুখে জেঠীমার ঘর। এ ঘরটা তিনি পাল্টাবেন। নইলে বউকে দেখতে হবে ওঠা-নামার সময়। সেটা পার হয়ে সে উঠে গেল। অজিতদা বললে, ইনিই শ্রীমতী নীরা, যার সম্পর্কে অনেক গল্প করেছি। আর এই তোর বউদি, ফেমাস এণাক্ষী।

অকস্মাৎ এণাক্ষী সকলকে সচকিত করে দিয়ে বলে উঠল, আরে, একেই তুমি বলতে কালো কুশ্রী! কি চমৎকার ফিগার! আর রূপ তো এই সবে ফুটছে, উঁকি মারছে।

কথাটা অন্যে বললে হেসে উঠত। কিন্তু এ এণাক্ষী বোস। এ ওর মুখ চাইলে। শুধু হেসে উঠল রণজিৎ: সে ভাবলে এ এণাক্ষীর একটা মহামূল্য ব্যঙ্গ, রস রসিকতা, স্যাটায়ার।

কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল নীরার। সে নীরা। সে বলে উঠল, ঠাট্টা করছেন? তা অবশ্য—

বাধা দিয়ে এণাক্ষী বললে, না। তোমার দাদার দিব্যি করে বলতে পারি, না। দেখ, তোমার দাদার চেয়ে আমি বয়সে কিছু বড়। ফিল্মে কাজ করেছি, রূপ আমি চিনি, গায়ের রঙে রূপ নয়, রূপ সব কিছু নিয়ে। গায়ের রঙ তো ফেরানো যায়। মুখে সফট্‌নেসের শ্রী তো আনা যায়। আমি নিজে করেছি। কিন্তু তোমার গড়নে-পেটনে রূপ ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। জাগেনি। জাগছে। কিছু মনে করো না, তুমি এত-দিন ফোটোনি গো সুন্দরী, এইবার ফুটছ, কিছুদিনেই বুঝতে পারবে;—একটা মনা বোধ নয়— ঝাঁকবন্দী মনা বোধ ভন ভন করবে চারিদিকে। তখন চড় মারতে হলে, দশভুজা হতে হবে। অদ্ভুত ফিগার তোমার। টল, গ্রেসফুল।

লজ্জায় বিস্ময়ে নীরা কেমন হয়ে গেল। এণাক্ষী তাকে মনে মনে প্রশ্ন করবার অবকাশ দিল না, এ কি সত্যি? সে তার হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে গেল, এস তো, দেখাই। ঘরে নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে তাকে বসিয়ে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার মাথার সেই সুপ্রচুর চুলগুলি নিয়ে কি করতে শুরু করলে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেন জাদু শুরু হল। শিউরে উঠল নীরা। এ কি? ও কে? ও কে? সে একটা আশ্চর্য চিত্ত উদ্বেলতা! ভুলে গেল সে তার পরীক্ষার কথা। বিস্ময়, এক অনির্বচনীয় গোপন আনন্দ, ভয়—সব এক-সঙ্গে। পরমুহূর্তেই সে উঠে দাঁড়াল।

—বস, বস!

—না। ছাড়ুন।

—বস না।

—না। তার কণ্ঠে সে রূঢ়তা ফিরে পেয়েছে তখন।

ছেড়ে দিল এণাক্ষী তাকে। হাসতে লাগল। বললে, এত ভয়?

—গরিবের অনাথার ভয়ই তো আত্ম-রক্ষার আশ্রয়।

—গরিব অনাথ অবস্থা তোমার ঘুচতে কতক্ষণ? টাকা অনেক পাবে, নাথ—? হাসতে হাসতে বললে, নাথ চাইলে অনেক জুটবে। না-চাও, অনাথের নাথ একটা ভক্তি-মান দারোয়ান রেখো, একটা অ্যালসেশিয়ান পুষো। বলো, নামিয়ে দি ফিল্মে। এমন ফিগার, এমন উচ্চারণ তোমার! ক্যামেরা-মাইকের টেস্ট তুমি উৎরবে এ আমি বিনা পরখেই বলতে পারি। নামবে?

তার সেই বিচিত্র নিষ্পলক দৃষ্টিতে নীরা এণাক্ষীর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এনা সকৌতুকে বললে, কি?

নীরা বললে, না।

—না নয়। ভেবে দেখো।

—না। ও আমি পারব না। আমাকে লোভ দেখাবেন না।

—অভিনয় তুমি খুব পারবে। অদ্ভুত পারবে। দু দিনে ভয় ভেঙে যাবে।

—অভিনয় আমার ভাল লাগে না। এবং চাই না করতে। মাফ করবেন আমাকে।

বলেই সে ফিরল এবং বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছুটে সে পালায় না, ধীরপদক্ষেপেই নেমে এল। হেনা তার পথ আটকেছিল, দেখি দেখি। তাই তো চুলটা ফেরানোতে—।

—পথ ছাড়। বলে তাকেও সরিয়ে নেমে এসেছিল।

নিজে ঘরে এসে ঘর বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে তার মায়ের পুরনো আয়নায় তার প্রতি-

বিম্বের দিকে চেয়ে বসে সে নিজের রূপকে আবিষ্কার করেছিল। তারপর সব এলো-মেলো করে দিয়েছিল।

হঠাৎ সেই অজ্ঞাত রূপসীকে সে দর্পণে আবিষ্কার করলে পূর্ণ গৌরবে—তার বিবাহসজ্জায়। ১৯৪৯ সাল—অগ্রহায়ণ মাস। এর মধ্যে সে, অর্থাৎ সে তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে, এ-কথা গোপন বা অজ্ঞাত-ছিল না। তার নিজের কাছেও ছিল না, অপর সকলের কাছেও না। তাকে সে অসম্মান করেনি, তবে তাকে আসন পেতে বসিয়ে ধূপ দীপ গন্ধে পুষ্পে অর্চনাও করেনি। ইতিমধ্যে তার সব কল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। শুধু তার দুর্ভাগ্য নয়, গোটা দেশের দুর্ভাগ্য, দুর্যোগের রূপ নিয়ে সব আচ্ছন্ন করে দিয়ে তার জীবনদুর্যোগকে অলঙ্ঘনীয় করে দিলে।

১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সে ফার্স্ট ডিভিসনেও পাস করেনি, করেছিল থার্ড ডিভিসনে। সব আশা ধূলিসাৎ হয়েছিল বললেই বলা হল না, লজ্জাতেও সে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে টিট্-কিরির সীমা ছিল না। রণজিৎও থার্ড ডিভিসনে পাস করেছে। ঘরের মধ্য থেকে নির্বাক জেঠীমার কথাও শোনা গিয়েছিল, অতি দর্পে হত লঙ্কা অতিমানে দুর্যোধন। এত অহংকার কি সয়! থাক সে-সব কথা। এণাক্ষী নিজে নেমে এসে বলেছিল, নামবে ছবিতে? দেখ?

ঘাড় নেড়ে সে বলেছিল, না।

তারপর জ্যাঠামশাইকে বলেছিল, আমার বাড়ির অংশের দাম, আর যদি কিছু আমার সে টাকার দরুণ পাওনা থাকে, আমাকে দিন। আমাকে তো পথ খুঁজতে হবে।

—পথ? মেয়েদের জন্যে পথ নয়, মেয়ে-দের জন্যে ঘর।

—ঘর ভেঙে যাদের ভগবান পথে দাঁড় করান, আমি তো তাদের একজন।

—কোন পথে হাঁটবে? আমাদের বংশের মান, সেটা তো আমাকে দেখতে হবে।

কোন বাদ্গ সে করেনি। সে বলেছিল, আমার ইচ্ছে আমি কোন ইস্কুলে চাকরী করি। সেখান থেকে আই-এ দেব। তারপর পারি তো—

—হুঁ ভাল। চাকরী পাও। দেব যা পাবে তুমি।

কিন্তু নেমে এল এক ভীষণ দুর্যোগ। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। শুরু হল কল-কাতায় ১৬ই আগস্ট, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা। তার কিছুদিন আগেই গেছে আজাদ হিন্দ দিবস। কলকাতা তখন বারুদ-স্তূপ। তার মত মেয়েও স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে-ছিল। মনা ঘোষকে সে দেখেছে। কিন্তু মানুষের এই উলঙ্গ উন্মত্ত চেহারা সে দেখেনি। ১৬।১৭।১৮ই আগস্টের সে কি রাত্রি! মনে আছে ওই অঞ্চলটা তখন ওদিকে বসিরহাট বারাসত এবং এদিকে কলকাতার মধ্যে পড়ে নিদারুণ আতঙ্কের মধ্যে কাটিয়ে-ছিল। ছাদে ইঁটপাটকেল জড়ো করে ওরা চার ভাই সেদিন এমনি একটা চেহারার আভাস দেখিয়েছিল বটে। সুজিত মেজ ভাইয়ের সে চেহারা সব থেকে স্পষ্ট। আজিতদার তখন দুটো বন্দুক, একটা রিভল-বার, একটা রাইফেল, একটা কার্টিজ ছাড়া ব্রিজ লোডিং ডবল ব্যারেল। সারারাত সে বন্দুক ছুঁড়ে বিদ্যাটা আয়ত্তে এনে ফেলে-

ছিল। অজিত শুধু মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসেছিল একখানা চেয়ারে। জেঠীমা তাঁর ঠাকুরের সামনে জপ করেছিলেন। জ্যাঠামশায় হয়ে গিয়েছিলেন একতাল মাংস-স্তূপ। আর চেহারা দেখেছিল এনার। কোমরে কাপড় জড়িয়ে রিভলবারটা হাতে নিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাববশে খানিকটা আড়ম্বর দেখিয়েছিল, কার্টিজ বেল্টটা গলায় পরে নিয়েছিল, কিন্তু সত্যই তার সাহসের অভাব ছিল না। সে স্তম্ভিত হয়ে ছাদের আলসেতে কনুই রেখে, শূন্য-দৃষ্টিতে রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে থাকত। কোন ভাবনাই তার ছিল না।

পূজার পর সে জ্যাঠামশাইকে বলেছিল, যা হয় করে দিন জ্যাঠামশায়, আমার পথ তো আমাকে করতে হবে!

—এই দুঃসময়ে?

—দুঃসময় যদি না কাটে!

—না—কাটে, আমাদের ভাগ্যে যা হবে তোমার ভাগ্যেও তাই হবে। আমি তো এ সময়ে তুমি যেতে চাইলেও যেতে দেব না মা।

এই একবার, এই একটি কথা জ্যাঠা-মশায়ের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির একটি ফাঁকে একটি নীলাভ তারার মত জেগে আছে তার স্মৃতিতে। নইলে তার জীবনে এতবড় দুষ্ট-গ্রহ আর কেউ হয়নি।

জেঠীমা কথাটা শুনে বলেছিলেন, ওর তো লাঞ্ছনার ভয়ও নেই, পাপের ভয়ও নেই। আর মায়া? ও পাথর।

জ্যাঠামশাই সেদিন বলেছিলেন, ও'র কথা তুমি ধরো না মা। ও'কে তো জান।

অমান্য সে করতে পারেনি। রণজিতের আই-এর বই নিয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করেছিল। এরই মধ্যে জীবনে তার আবির্ভূত হচ্ছিল ওই এণাক্ষীর আবিষ্কার করা রূপসী। মধ্যে মধ্যে আয়নায় তাকে দেখে, তার সেই বিচিত্র অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখত। আশ্চর্য বোধ হত। মনের মধ্যে একটি কোন সূক্ষ্ম তারে একটি নতুন সুর বাজত। বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে নিজের অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গের দিকে চেয়ে দেখত। কৈশোরে এতদিন যা কুঁড়ির মত ছিল তা স্থলপদ্মের মত ফুটছে। আশ্চর্য। জীবন যেন অকস্মাৎ মহাসমারোহের আয়োজন করছে তার দেহ জুড়ে। দেহ পুষ্ট হয়ে ভরছে। যেমন তিন বছর আগে হেনার হয়েছিল। মুখের যেন চেহারা পাল্টাচ্ছে। তার বর্ণ পাল্টাচ্ছে। আশ্চর্য! মগের পর মগ জল ঢালত মাথায়। অঙ্গ বেয়ে পড়ত, সে দেখত। হাসত। চুলের রাশি মুখে বুকে পিঠে সেঁটে লেগে যেত। সাবান মাথায় নেশা লেগেছিল। এবার সে ঘর বন্ধ করে চুল আঁচড়ে নানা ভঙ্গিতে সাজিয়ে নিজেকে তুলনা করে দেখত। তারপর দু হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিয়ে বাইরে বেরুত। রূপ তার নিজের জন্য। সে যেন বাইরে কাউকে দেখা না দেয়।

৪৭ সালে স্বাধীনতা তখন আসছে। তখন শ্যাডো মিনিস্ট্রি হয়েছে। এক মাস পর পনেরই আগস্ট দেশ ভাগ হয়ে স্বাধীন হবে। সে নিশ্বাস ফেলেছিল। এইবার সে বের হবে এ বাড়ি থেকে। হঠাৎ সুজিত মারা গেল। সে মেতেছিল ওই মহামারণে। কোথায় বোমা মারতে গিয়ে বোমা মেরে পালাবার সময় পা পিছলে পড়ে সঙ্গের অন্য বোমাটা ফেটে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জ্যাঠামশাই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সেরিব্রেল থ্রম্বসিস। পঙ্গু হয়ে বাঁচলেন। বিচিত্র জেঠীমা, তিনি বসলেন পাশে। আশ্চর্য বসা। এণাক্ষী এসেছিল, কিন্তু জেঠীমা তাকে ফিরিয়ে দিলেন।—না। তুমি ওপরে যাও। তারপর নীরার দিকে চেয়ে বলেছিলেন, তুই একটু বসবি? আমি স্নান পুজোটা সেরে আসি!

সে বসেছিল।

এরই মধ্যে কেটে গেল সাতচল্লিশ সাল। অজিত ব্যবসার মালিক হয়ে ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। নতুন বিভাগ খুলেছে। শক্তিগড়ের কাছাকাছি রাইস মিল কিনেছে। শুধু তাই নয়, রেফিউজিদের সেবা করে, দান করে নামও কিনছে। আগামী ইলেক-সনে সে দাঁড়াবে। টিকিট চাই তার। মধ্যে মধ্যে দিল্লি যায়, সঙ্গে এণাক্ষী। নতুন ব্যবসায়ে বড় ব্যবসাদার শরিক জুটেছে। প্রবীণ হুঁসিয়ার মানুষ। দ্রুত ধাবমান রথ থেকে নেমে অজিতের বৃদ্ধ অসহায় পরাণ-বাবুর শয্যার পাশে দাঁড়াবার অবকাশ কোথায়। অন্য ছেলেরা রণজিৎ অভিজিৎ তাদেরও সময় নেই। এর মধ্যে ওই জেঠী-মাকে ওই রোগীর পাশে একা রেখে আসতে সে পারেনি। কিন্তু তার যে দিন চলে যায়। দরখাস্ত কয়েকটা করেছিল, কিন্তু কোনটাতেই সাড়া মেলেনি। একে শুধু ম্যাট্রিক, তার উপর সর্বত্র সরকারী নির্দেশে রেফিউজি অগ্রাধিকার জীবনের মুক্তি পথকে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর করে দিয়েছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ মনস্থির করলে সে, আই-এ পরীক্ষা দেবে। পাস সে করবে। যে ডিভি-সনে হোক। রণজিতের বই পড়েই ছিল; সে পড়া ছেড়েছে, স্যুট পরে বিজনেসে ঢুকেছে। সেই বই নিয়ে বসল। এবং এক-দিন অজিতকে গিয়ে বললে, সে পরীক্ষা দেবে। ফিয়ের টাকা চাই। কিছু বই চাই।

অজিত বললে, পরীক্ষা? পড়লে কোথায়?

—পড়েছি। পড়েছি রণজিতের বই নিয়ে।

অনেক দিন পর এণাক্ষীর সঙ্গে দেখা। তেতলা ইন্দ্রলোক। সে মর্তভুবনের বাসিন্দা,

শরতের আবির্ভাবে উৎসবের
ঘণ্টা বেজে উঠেছে
মেঘগুলি সরে গেছে—আকাশ পরিষ্কার! উৎসবের ঘণ্টা বেজে উঠেছে।
আনন্দের ঋতু শরৎকে আগমনী জানাচ্ছে। আনন্দ এবং সুখ বয়ে এনে শরৎ এল আপনাকে আমোদিত করতে।
বাদল হোক, আর খরাই হোক, শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, সারাবছরই আপনার চুলের জন্য চাই একই প্রকারের যত্ন। সারা বছর ধরে আপনার চুলকে অপরূপ কালো এবং সুস্থ রাখবার যত্ন। চুল কালো করবার জন্যে সর্বত্র প্রশংসিত "লোমা" এই যত্ন নিতে সক্ষম। আর মনে রাখবেন "লোমা" শুধু শাদা চুলকেই কালো করে না, চুলের শাদা হওে ওঠাও রোধ করে। যে দিক থেকেই দেখুন না কেন, তুলনায় এটা আশুও ভালো।
লোমা

দেখা হয় না এমন নয়, কিন্তু সে দেখায় শুধু তাকানো, দেখা ঠিক হয় না। সে হেসে ঘাড় নেড়ে বলেছিল, তোমার কপালে শনির দৃষ্টি। না হলে, তোমার অন্ন খায় কে?

অজিত বলেছিল, থাক না ও কথা।

—থাক। তবে তুমি নামছ ওই বিজনেসে, খুব ভাল হিরোইন হত।

সে কঠিন ভাবে বলেছিল, সকল অন্ন সকলের জন্য নয় বউদি। কারও জন্যে গোবিন্দভোগ, কারুর জন্য খুদ। আমার খুদের ভাগ্য। আমাকে আপনি আর এই কথাটা বলবেন না।

এণাক্ষী রাগ করেনি। হেসে বলেছিল, চমৎকার কথা বল তুমি। আচ্ছা আর বলব না। ওগো টাকাটা দিয়ে দাও বাপু।

ওই পরীক্ষা দেওয়া তার ভুল হল। অথবা ভুল নয়, ওইটেই তার মুক্তির পথ করে দিয়েছে।

সে ফেল হয়ে গেল। পড়তে সে ঠিক পায় নি। জ্যাঠামশাই মরতে মরতে মরছিলেন না। নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও প্রাণ বেরুচ্ছিল না। ডান হাত ডান অঙ্গ অবশ। কথা বলতে পারেন না। গোঙান, প্রলাপের রোগীর মত চিৎকার করেন। আর বাঁ হাতে ডান হাতের চেয়েও জোরে এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জেঠীমাকে মারেন, তাঁর চুল ধরে টানেন। ছুটে গিয়ে ছাড়াতে হত তাঁকে। মলমূত্র বিছানায়; গায়ে লাগে; মুক্ত করেন জেঠীমা; সে অবশ্য দু চারদিন। তাঁর অগোচর ছাড়া তিনি তাকে নাড়তে দেননি। শেষে বলেছিলেন, ও তুমি করতে যেয়ো না, ও আমি কাউকে করতে দেব না। আমি পুজোয় বসি, বাথরুমে যাই, থাকবেন কিছুক্ষণ ওই অবস্থায়! ও'র অদৃষ্টে ওই রয়েছে! আমি বারণ করলাম।

হেনা আসত মধ্যে মধ্যে, নাকে কাপড় দিয়ে ঘরে ঢুকত।

পরীক্ষার ফল বেরুল, সে ফেল হয়েছে।

এর দিন দশেক পর জ্যাঠামশায় মারা গেলেন। জেঠীমা আবার ঘরে ঢুকলেন। সে তাঁর কাছে গিয়েছিল। জেঠীমা বলেছিলেন, এবার আমার বিধবার জীবন নীরা। সেবা আমি কারুরই চাইনে। তুমি আমার কিছু ছুঁয়ো না। এরপরই চলে গেলেন কাশী।

সেই দিনই সে চলে যেত। কিন্তু অজিতদা ছিল না বাড়ি। গিয়েছিল বম্বে। তার টাকায় ছবি হচ্ছে। তার কি সব করবার জন্য বম্বে গেছে এণাক্ষীকে নিয়ে।

ফিরে এলে সে বলতেই বললে, আমার ছবিটা রিলিজ হোক। টাকা আটকে গেছে। তার আগে তো পারছিনে। জোর করলেও উপায় নেই, পারব না।

ছবি রিলিজ হল। দু সপ্তাহেই ছবি শেষ। মাথায় হাত দিয়ে বসল অজিতদা। একদিন পর এণাক্ষীকে নিয়ে গাড়িতে কোথায় চলে গেল। রণজিৎ বাড়িতে বসে রইল, আপিস গেল না।

দিন কয়েক পর একখানা বড় গাড়ি এসে দাঁড়াল। রণজিৎ চাকরকে বললে, বল গিয়ে বাবুরা সব বাইরে গেছেন। কিন্তু চাকরকে ঠেলে তিনি বাড়ি ঢুকলেন। অবশ্য তার আগেই রণজিৎ খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

—অজিতবাবু! অজিতবাবু! রণজিৎ! কে রয়েছে বাড়িতে?

এবার বাধ্য হয়ে বেরিয়ে এল নীরা।—এ'রা তো কেউ বাড়ি নেই।

এক বৃদ্ধ; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিশ্চয়। তিনি বললেন, কোথায় গেছেন?

নীরা বললে, তার আগে আমার কথার জবাব দিন। আপনি এভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন কেন? আপনি কোন একজন সম্ভ্রান্ত লোক।

বৃদ্ধ নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, চাকর বললে, বাবুরা কেউ বাড়ি নেই। অজিত স্ত্রী ছাড়া কোথাও যায় না, ওর মা কাশীতে—

বাধা দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে আরোপ করে। নীরা হেসেই বললে, আরও কেউ থাকতে পারেন, দেখতেই পাচ্ছেন আমি রয়েছি।

বৃদ্ধ বললেন, আমার ভুল হয়েছে স্বীকার করছি। অজিতের কারবারে আমি অংশীদার। আমার প্রয়োজন জরুরী। আমার মনে হচ্ছে, এরা ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে দেখা করছে না। তাই ঠিক হিসেবটা হয়নি। তোমার কথা মনে হয়নি আমার। তুমি তো অজিতের খুড়তুতো বোন। কিন্তু—। কথাটা কিন্তুতেই চাপা রেখে বললেন, চমৎকার মেয়ে তো তুমি!

চুপ করে ছিল নীরা।

বৃদ্ধ বলেছিলেন, আচ্ছা আসি মা। আমি বৃদ্ধ, কোন অপরাধ নিয়ো না আমার।

পরদিন আপিসের একজন কর্মচারী এসে রণজিতের সঙ্গে দেখা করলে। রণজিত বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে। ফিরে এল হাসিমুখে। পরদিন যথাসময়ে আপিস গেল। পরদিন সেই বৃদ্ধ এলেন। এবার রণজিৎ সমাদর করে তাঁকে ড্রইংরুমে বসাল। তারপর তাকে ডাকলে, উনি একবার ডাকছেন। কি হয়েছে সে দিন! হাসতে লাগল। আসতেই হবে, নইলে উনি আসবেন। বলছেন, আমার ঠিক ক্ষমা চাওয়া হয়নি। এসেছেন ওই জন্যে। ভাল লেগেছিল নীরার সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের ওই বিনয়। সে গিয়েছিল ড্রইংরুমে একটু কুণ্ঠিত ভাবে। সে কি রূঢ় কিছু বলেছিল! ঘরে ঢুকেই কিন্তু একটু

অপ্রস্তুত হয়েছিল। একটি রূপবান যুবকও বসে আছে।

বৃদ্ধ বলেছিলেন, এটি আমার ছেলে মা। ভাল ছেলে, এম-এ পড়ে, আবার দুষ্টু ছেলে। ওকে নিয়ে এই পথে যাচ্ছিলাম, মনে হল সেদিনের ত্রুটি স্বীকার ঠিক হয়নি। তাই নেমে পড়লাম।

নীরা দুজনকেই নমস্কার করেছিল, তার-পর বলেছিল, না। ত্রুটি হয়তো আমারও হয়েছিল। আপনি যেন কিছু মনে করবেন না।

হা-হা করে হেসে বৃদ্ধ বলেছিলেন, তুমি অসামান্যা মা। শুধু ব্যবহারে নয়। রূপেও। অজিত বলত, একটু কালো বেশী, ঢ্যাঙা। তাই আমি চিনতে পারিনি। যা মিষ্টি করে আমাকে সচেতন করেছিলে! জান, এই এম-এ পড়া ছেলে আমার সামনে কথা বলতে পারে না।

ছেলেটি স্তব্ধ মৌন হয়ে বসেছিল।

তারপর ঘটনা ঘটল অত্যন্ত দ্রুত। অজিত-এণাক্ষী ফিরে এল। পুজোর পর তখন। তাকে ডেকে বললে, নীরা, একটা কথা আছে। সোমেশবাবু তোকে পুত্রবধূ করতে চান। তিনি তোকে দেখে গেছেন। ছেলেও দেখেছে, তুইও দেখেছিস। তোর ভাগ্য ভাল।

এণাক্ষী বলেছিল, বহু লক্ষের মালিক।

তার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সে অভি-ভূত হয়ে গিয়েছিল। তবু সে বলেছিল, ভেবে বলব। সারাটা রাত্রি—সে তার নিদ্রা-হীন রাত্রি। ঘরে আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার প্রশ্ন করেছিল, তুমি এত রূপসী? তুমি এত ভাগ্যবতী? আকস্মিকতায় তার অতীতের সব দুঃখ, ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে বর্ষার কালো মেঘের মত কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়ে শরৎপ্রভাব জেগে উঠেছিল। জীবনে মোহ বোধ করি ওই একবার!

বৃদ্ধ সত্যই সম্ভ্রান্ত, সত্যই অভিজাত। রূপবান যুবকটি স্তব্ধ, মৌন।

সকালবেলা অজিতই এসে ডেকেছিল, নীরা।

নীরা তখন শেষরাত্রে ঘুমিয়ে তখনও ঘুমুচ্ছে। সে জেগে উঠে বলেছিল, হ্যাঁ, বলো আমার মত আছে। তবে আমার বাবার যে টাকা কটি আছে তাই সব। তা না-নিলেও হবে না। তার বেশী নিলেও হবে না।

তাই হয়েছিল। সোমেশবাবু নিজে এসে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন, তুমি রাজ্য চালাতে পার মা। দিন স্থির হয়েছিল অগ্র-হায়ণে। জেঠীমা এসেছিলেন কাশী থেকে। সে লিখেছিল নিজে এবং অজিতকে বলে-ছিল তাঁকে আনতে হবে। তিনি না-হলে হবে না।

সেদিন তাকে সাজিয়েছিল এণাক্ষী। নিজের মধ্যের রূপসীকে পূর্ণ গৌরবে রানীর মত মহিমায় প্রকাশিত দেখে নিজের প্রেমে সে নিজেই পড়েছিল। দীর্ঘাঙ্গী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল, মধ্য-ফাল্গুনের শ্যামলতার মত উজ্জ্বলশ্যামা, আয়ত নয়না, ঘন কালো একরাশি চুলের পৃষ্ঠপটে সে যেন কোন কাব্যের নায়িকা। নায়কের জন্য প্রতীক্ষমানা। অবনতমুখী। জেঠীমা সম্প্রদান

করবেন। বিবাহের পরই তারা চলে যাবে ভারতভ্রমণে। সে এক স্বপ্ন।

অকস্মাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেল। যেমন ঝন ঝন শব্দ করে একরাশ বাসন ভেঙে পড়ে তেমনিভাবে আর্তনাদ করে।

প্রথম সন্ধ্যাতেই লগ্ন।

পাত্র এসেছে। সানাই বাজছে। চারিদিকে ব্যস্ততার কোলাহল। ফুলের মালার, ফুলের সজ্জার, পুষ্পসারের সৌরভে চারিদিক ভরে গেছে। এরই মধ্যে একটি নারীকণ্ঠ করুণ আর্ত-চিৎকার করে উঠল—আমি কি অপরাধ করলাম? বল—বল—বল। কি আমার অপরাধ! তোমার সন্তান যে আমার গর্ভে!

উচ্চ দর্পিত কোলাহলে তার আর্তকণ্ঠ ঢাকা পড়ে গেল।

•

ওঃ, সে কি নির্মম বাস্তবের নিষ্ঠুর প্রকাশ! মহাকাব্যের বর্ণনার মত আলো নেভেনি, পুষ্পসজ্জা নিষ্প্রভ হয়নি; সৌরভের হানি ঘটেনি; তবে হ্যাঁ, সানাই থেমে গিয়েছিল। ও যে মানুষে বাজায়। মেয়েরা ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল রেলিংয়ে ভর দিয়ে। কি হল? তাদের সঙ্গে সেও। থর থর করে কাঁপছিল সর্বাঙ্গ। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ভয়ে উদ্বেগে যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। মিনিটে যদি হৃৎ-স্পন্দনের সংখ্যা সীমায় বাঁধা থাকে তবে সে তখন এক মিনিটে বহু মিনিট অতিক্রম করছিল। হয়তো সমস্ত পরমায়ুর স্পন্দনসংখ্যা শেষ করে লুটিয়ে পড়তে চেয়েছিল। অথবা এই ঘটনার সময়টা সংক্ষিপ্ত করে দিতে চেয়েছিল।

একটি সুন্দরী মেয়ে। মা হবে অল্প দিনে। দু চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। বর পাথর, নতশির। যার মধ্যে তার স্বীকৃতি সুস্পষ্ট। সঙ্গে এক বৃদ্ধ, আর কয়েকজন অল্পবয়সী ছেলে।

বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত সোমেশবাবুর আজ এই মুহূর্তে এ কি মূর্তি? হাতের রুপো-বাঁধানো ছড়িটা ঠুকছেন আর বলছেন, তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি জোচ্চোর। ঠগ তোমরা! বেরিয়ে যাও! এ যেন দণ্ডমুণ্ডের কোন শাসনকর্তা—যিনি মুহূর্তে দণ্ড হিসাবে মুণ্ডটা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন।

অজিতদা তার সুরে সুর মিলিয়ে বলছে, ব্ল্যাকমেলারস!

মেয়েটির সঙ্গের বৃদ্ধ হাত জোড় করে বলছে, না—না—ঈশ্বরের শপথ করে বলছি এ সত্য। আপনার ছেলে আমার মৃতপুত্রের সহপাঠী ছিল। আমি গরিব, আমি সাধারণ, কিন্তু সে লেখাপড়ায় অসাধারণ ছিল। সেই সূত্রে আপনার ছেলে আমার বাড়ি আসত। আমার ওই মেয়ে হতভাগিনী, বিবেচনা করেনি, বিচার করেনি সম্ভব অসম্ভব, হাত বাড়িয়েছিল আপনার পুত্রের দিকে। আমার ছেলের মৃত্যুর পর স্নেহের মধ্য দিয়ে ঘটেছে এটা। দোষ আপনার ছেলেকে আমি দেব না। জেনে, অভিসম্পাত দিয়েছি মেয়েকে। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। সর্বনাশ তখন ঘটে গেছে। দয়া করুন—

—প্রমাণ কি? আপনাকে আমি পুলিশে দেব।

—এই দেখুন ওদের বিবাহের পরদিনের ছবি, জিজ্ঞাসা করুন আপনার ছেলেকে।

—কিসের বিবাহ? কই সার্টিফিকেট কই?

—রেজেস্ট্রি করে বিবাহ হয়নি। কথা ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। হিন্দুমতে ভগবান সাক্ষী রেখে।

—ভগবান সাক্ষী? আমরা ব্রাহ্মণ, আপনি কায়স্থ, হিন্দু মতে ভগবান এ বিবাহ স্বীকার করেন? করেন না। চলে যান। আপনি চলে যান।

ধীরে ধীরে এসে ঘরে ঢুকে নীরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল! এ কি হল? কি করবে সে? পৃথিবী শূন্য হয়ে গেছে তার কাছে। বুকের মধ্যে একটা ঝড় বইছে শুধু। হাহাকার ক্রোধ মিলে প্রচণ্ড একটা কিছু। কানে এল পাশের ঘরে এণাক্ষী বলছে, ওরা খবর পেলে কি করে? ছি-ছি-ছি!

অজিতদা বললে, কি করে জানব? আমি কি করে বলব। আমি বারবার সোমেশ-বাবুকে এ সব উৎসবটুৎসব করতে বারণ করেছিলাম। উনি যে নিজেকে বড় পয়গম্বর মনে করেন। হ্যাঃ—ওরা আবার কিছু করতে পারে!

এণাক্ষী বলেছিল, তারপর? বিয়ে যদি ভেঙে যায়? টাকা তো সোমেশবাবু ছাড়বেন না! আমি কি করব বলার মানেটা ভেবেছ?

সকল আবরণ ছিঁড়ে গেল। নগ্ন সত্য তার সামনে এসে ব্যঙ্গ হেসে দাঁড়াল। না, সত্য ব্যঙ্গ হাসি হাসে না; সে ভাবলেশ-হীন মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, বল, এবার কি করবে? স্থির কর তোমার পথ।

সেই তার পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দিয়েছিল, ওই পথ।

এ বাড়ির সদর দরজা পার হয়ে বিশাল পৃথিবীর দিকে দিকে পথ চলে গেছে। যে পথে বারবার চলতে চেয়েছ কিন্তু চেয়েও পারোনি। আজ বের হও। এই রাত্রেই, এই মুহূর্তে।

বিলম্ব সে করেনি। মালা ছিঁড়ে ফেলেছিল, গহনা খুলে ফেলেছিল, শাঁখা ভেঙে ফেলেছিল, কনে-চন্দন মুখের কাজল, মুখের প্রসাধন মুছে বেনারসী শাড়ি ব্লাউস বদলে সাধারণ শাড়ি ব্লাউস পরে বেরিয়ে পড়বার মুখে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

ঘরখানা মৃত সুজিতের ঘর। তার জন্য এখন থেকে সাজানো থাকবার কথা। সুজিতের ড্রয়ার খুলে সে বের করে নিয়েছিল তার একখানা ছোট নেপালী ভোজালি। ছোট, কিন্তু মারাত্মক সেটা। আর তুলে নিয়েছিল সাজানো দান সামগ্রীর মধ্যে রাখা একটি ছোট ভেলভেটের থলি। তাতে ছিল নগদ একশো এক টাকা। ধাতুর টাকা।

বিবাহ-সভার সবার সামনে এসে সে দাঁড়িয়েছিল। অকুণ্ঠিতা অসমসাহসে সে তখন অগ্নিশিখার মত জ্বলছে; প্রদীপ্ত অনবনমিতা সে তখন। সোমেশবাবুকে বলেছিল, আপনার পুত্র আর পুত্রবধুকে নিয়ে ফিরে যান দয়া করে। আমি বিবাহ করব না।

চমকে উঠেছিল সমস্ত সভাটা।

অজিত ছুটে এসেছিল।—নীরা!

সে ভোজালিটা বের করে বলেছিল, এসো না আমার কাছে। তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।

হতভাগিনী সেই মেয়েটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। নীরা তাকে বলেছিল, জোর করে তোমার স্বামীকে ওখান থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাও। সে তোমার দায়। আমি চলে যাচ্ছি।

—নীরা। অজিত আর একবার চিৎকার করেছিল।

বাকী সব স্তব্ধ স্তম্ভিত। সে তারই মধ্যে চিন্তাহীন মনে শঙ্কাহীন চিত্তে দর্পিত পদক্ষেপে বেরিয়ে গিয়েছিল সদর দরজা দিয়েই। সেখানে ডেকরেটারদের সাজানো ফটকের মাথায় রোসনচৌকীর লোকগুলি বসে ছিল অবাক হয়ে।

—নীরা! আবার চিৎকার করেছিল অজিত।

—না। থাক, মনা ঘোষের উচ্ছিষ্ট কন্যায় আমার প্রয়োজন নেই। সোমেশবাবুর গম্ভীর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিল সে।

একবার ইচ্ছে হয়েছিল সে ফিরে জবাব দিয়ে আসে, কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছিল সে।

ছোরাটায় হাত রেখে রাত্রির পৃথিবীর পথে এগিয়েছিল নির্ভয়ে; কন্যাসজ্জার এলো খোঁপাটা কখন এলিয়ে গেছে। কাজললতাটা তবু আটকে ছিল চুলে। পিঠে বিঁধছিল। সেটাকে টেনে নিয়ে ফেলে দিয়েছিল পথে।

তার মুক্তি। প্রথম অঙ্ক ওখানেই শেষ হয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ হল আজ। ৪৯ সালের নভেম্বর থেকে আজ ৫৬ সালের জুলাই; ছ বৎসর আট মাস। হ্যাঁ, ছ বছর আট মাস। দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু থেকে আজকের সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত জীবন প্রথম অঙ্কের ঠিক বিপরীত। একটানা সার্থকতার জীবন। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ সংগ্রাম। পথের পাঁচালীর বিভূতিবাবু তাঁর খাতায় লিখে দিয়েছিলেন, 'গতিই জীবন।' নীরা জেনেছে সে-গতি সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

পৃথিবী নাকি যেদিন উৎক্ষিপ্ত হয়ে

ছুটেছিল আপন বেগে, মাতৃহীনা পিতৃহীনা তার মত, সেদিন তার যে গতির সংগ্রাম, তার সঙ্গে—যেদিন সে সূর্যের আকর্ষণে বাঁধা পড়ে তাকে কেন্দ্র করে ব্যোমলোকের বাষ্প ও বায়ু-স্তর ঠেলে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে ছুটেছে, সে ছোটা ছোটা নিশ্চয়ই, কিন্তু সে প্রদক্ষিণ। সে-প্রদক্ষিণে পৃথিবী আলোকে-অন্ধকারে জলে মাটিতে ফুলে ফলে ফসলে, সুরে, সঙ্গীতে, সার্থকতায় অপরূপা হয়ে উঠেছে। সারা দ্বিতীয় অঙ্কটি তাই। হঠাৎ —থাক শেষ শেষে আছে। সাজিয়ে দেখা যাক কি করে এমন হল। যে সূর্যের আকর্ষণে সে পৃথিবীর মত প্রদক্ষিণ করছিল, শ্যাম-শোভায় লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছিল, অকস্মাৎ সে ধূমকেতু হয়ে উঠল কি করে?

সেদিন রাত্রে আশ্রয় খুঁজতে সে ভুল করেনি। সন্ধ্যাতেই লগ্ন ছিল সাতটায়। সে যখন বেরিয়ে আসে, তখন সম্ভবত সাতটারই কাছাকাছি। বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় সে বাস ধরেছিল। পৃথিবী বৈচিত্র-ময়ী। আলোর মধ্যে ছায়ায় অন্ধকারে বিচিত্রিত। কায়া চলে, সঙ্গে ছায়া চলে। অন্ধকারের মধ্যে আকাশে জ্বলে নক্ষত্রের আলো, চাঁদের আলো, মাটির উপর জ্বলে মণি-মাণিক্যের দীপ্তি, জীবনের দৃষ্টি। এ পৃথিবীতে সে আছে, হেনা আছে, এনা আছে, এই বাঙালীর সমাজে বিপ্লবী মেয়ে বীণা দাস, শান্তি দাস, কমলা দাশগুপ্তা আছেন; এই তো তারই পরিচিতা বিশ্বের অপরিচিতা, সিঁথীর মেয়ে নমিতা আছে, প্রাইভেট টিউ-শনি করে কলেজে ভর্তি হয়েছে, পড়ছে, মায়ের সংসারে খাটনা খাটছে, রান্না এক-বেলা। আবার মনা ঘোষের সঙ্গে যারা রাত্রে কলকাতায় পথে বেড়ায়, হোটেলে যায়, নাসাক্ক হেসে যায়, তারাও আছে। তারাই বেশী করে চোখে পড়ে। তেমনি সংসারে শুধু অজিত রণজিৎ মনা ঘোষ ওই সোমেশ-বাবুর ছেলে দিব্যেন্দুই নাই, নামকরা বড় বিপ্লবীরাই নাই, বহুজনের মধ্যে মিশে রয়েছে নমিতার মত, তার মত কত তরুণ বাঙালী ঘরের ছেলেমেয়ে। সেদিন বাসে উঠবার আগে পথের উপর দুটি এমনি অপরিচিত তরুণ তাকে নমস্কার করেছিল—

সে প্রতিনমস্কার না-করেই রূঢ় কণ্ঠে বলেছিল, কি চান আপনারা?

—আগেই বলি, আপনি বোন—আমরা ভাই। আমরা আপনাদের বাড়ির ওখান থেকেই বরাবর সঙ্গে সঙ্গে আসছি। আমরা গোলমাল শুনেই গিয়েছিলাম। বিয়ে ভণ্ডুল বলেই গিয়েছিলাম। আপনি নিজেই ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে আপনাকে। আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমরা সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দি। মনা ঘোষ এমনটা হবে ভাবেনি। অজিতবাবু তাকে টাকা দিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছিল। না-হলে এতক্ষণ বেগ পেতেন আপনি। বলুন, কোথায় যাবেন।

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে সে বলেছিল, কোন থানায় আমাকে পৌঁছে দিন।

—থানায়? বিস্মিত হয়েছিল তারা।

—হ্যাঁ। তা ছাড়া নিরাপদ আর কোথায় হতে পারি বলুন। এখানকার নয়, কল-কাতার কোন থানায়।

তারা তাই পৌঁছে দিয়েছিল। ইনস্পেক্টরকে বলেছিল, আমি বিয়ের আসর থেকে উঠে এসেছি। আমার বাপ নেই, মা নেই, ভাই বোন কেউ নেই, জাঠতুত ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে এক বড়লোকের পাষণ্ড ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। আমার বয়স উনিশ পূর্ণ হয়ে কুড়ি চলছে। এবার আই-এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম—। আমি আশ্রয়ের জন্যে এসেছি।

ইনস্পেক্টর বাধা দিয়ে চট করে প্রশ্ন করে-ছিলেন, কাকে বিয়ে করতে চাও? মানে যে তোমাকে বিয়ে করে এ বিপদে রক্ষা করতে পারে বল? থানা না হয় একদিনের আশ্রয়—।

সে বলেছিল, না। কাউকে না। তেমন কাউকে আমি জানিনে চিনিনে। কেউ বিয়ে করতে চাইলেও বিয়ে আমি করব না।

—করবে না?

—না। সে যে পাষণ্ড বদমাস নয় তা কি করে জানব?

—হুঁ। কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে ইনস্পেক্টর বলেছিলেন, বিয়ের জন্যে তো সারাদিন খাওনি কিছু। উপবাস করে আছ। কিছু খাও, কেমন? চল আমার কোয়ার্টারে—আমার স্ত্রী আছেন, ছেলেরা আছে, সেখানে চল।

আপত্তি করেনি নীরা। সেখানে সব শুনেছিলেন ইনস্পেক্টর। শুনে বলেছিলেন, তাই ত মা, তুমি তো কঠিন মেয়ে। চল একবার থানায় চল, একটা কেস লিখে নি। সোমেশ চাটুজ্জেকে আমি জানি। অজিত মুখুজ্জে এণাক্ষী এদেরও জানি। তোমাকে বাঁচাতে আমার মাথাটা বাঁচিয়ে রাখি।

ডাইরী লিখতে লিখতে হঠাৎ বলেছিলেন, তুমি গয়নাগুলো খুলে দিয়ে এলে কেন? সেগুলো কি দোষ করলে? সে তোমার বাপের টাকার।

—না, ইচ্ছে হল না। সমস্ত দেহমন কেমন ঘিন ঘিন করছিল।

—ঘিন ঘিন করছিল? বাঃ।

পরের দিন তিনি আমাদের এলাকার থানায় ফোন করে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন। হেসে বলেছিলেন, সোমেশ-বাবুর ছেলের বিয়ে আটকায়নি, হয়ে গেছে। ছেলেটিই শেষে অস্বীকার করেছে, বলেছে, সে বিয়ে করেনি। পাত্রী ওই তোমাদের পাড়াতেই জুটে গেছে। অজিতবাবুই দেখে জুটিয়েছেন। তাঁরা তোমাকে খোঁজেনও না, দাবিও করেন না। মামলা নেই, চুকে গেছে। এখন তুমি মুক্ত। কোথায় যাবে বল?

"গুঞ্জরি তান
উঠিল তোমার
সোনার বীণার তারে"
শ্বেত শুভ্র কাশের বনে হাওয়ার দোলায়
মালতী-শেফালীর বিকীর্ণ সুরভে,
মরালের ছন্দিত ডানায় আর অবারিত
নীল আকাশে ঝংকার উঠেছে শারদ-
লক্ষ্মীর বীণার। প্রতি বছর এই শুভমুহূর্ত-
টিকে আমরা স্মরণীয় করে রাখতে চাই
আমাদের জীবনে। 'ঝংকার' রেডিওর
সুরের স্পন্দনে এই আনন্দ আপনার
কাছে আরো বিমূর্ত হয়ে উঠবে।
ঝংকার
রেডিও
অপূর্ব ম্যাগনাটোন-সহ
পূর্বাঞ্চলের একমাত্র পরিবেশক:—
রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্ প্রাইভেট লি:
৩ ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা—১

যাঁরা চোখে অন্ধকার দেখেছিল, তাই তো, মুক্তি তো নিশ্চিন্ততা নয়। কোথায় যাবে সে? কলকাতার পথ উত্তরে-দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে সহস্র শাখায় ছড়িয়েছে। দক্ষিণে টালিগঞ্জ, মাঝপথে ভেঙে ডালহৌসি স্কোয়ার, আপিস—হাজার হাজার মেয়েরা ছোটে। আরও উত্তরে এসে বিডন স্ট্রীট থেকে চিৎপুর ধরে শতবর্ষব্যাপী নারীজীবনের নরক। পূর্ব দিকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে ইউনিভার্সিটি, পথে পথে সতর্ক দৃষ্টি শ্বাপদের মত মানুষ। যাওয়া তো সহজ নয়। যাবে সে ইউনিভার্সিটির দিকে, জীবনে সে লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়নি একবার ছাড়া, অর্থাৎ ওই বিয়েতে মত দেওয়ার বারটা ছাড়া। কিন্তু আশ্রয়?

আজ মা-বাপকে মনে পড়ছে। কিন্তু সে কাঁদেনি। অসীম সহরের সঙ্গে ভাঙা আকাশ মাথায় নিয়ে সে সেই নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে ভেবেছিল, আশ্রয়? কয়েক মুহূর্ত পর বলেছিল, শুনেছি অনাথ মেয়েদের জন্য দু একটা সত্যিকারের ভাল হোম আছে, আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিন।

—সেখানে যাবে? তাই তো! হোম ভাল আছে, কিন্তু সে তো ঠিক তোমার মত অনাথের জন্য নয়। তারা—ভাল কথা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি। তোমার মত একালের মেয়ে—তোমার ঝাণ্ডাটা কি বলতো? লাল না তেরঙা?

—আমার কোন ঝাণ্ডাই নেই, আমার ঝাণ্ডা আমার নিজের।

—গুড। এস আমার সঙ্গে। দেখি তোমার অদৃষ্ট আর আমার পুণ্য। এস।

গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে এলেন একটা বাড়িতে। ডাকলেন, দাদা আছেন? দাদা?

—কে? বেরিয়ে এলেন কৃশকায় শীর্ণ বৃদ্ধ। —আরে ঘোষাল ভাই? কি ব্যাপার? ওয়ারেণ্ট আছে না কি? এদের কার নামে বলতো? না খোদ সর্দারের নামে?

পিছনে একটি দল বাচ্চা-বাহিনী। তের চৌদ্দ হতে বছর চারেকের পর্যন্ত।

—এদের আজ সব কটাকে নিয়ে যাব।

বড়গুলি হাসতে লাগল। ছোট চারটির বড়টি ছুটে পালাবার সময় চিৎকার করলে, লড়াই লড়াই। অস্ত্র অস্ত্র!

ঘোষাল এবার বললে, দাদা, এই খুকীটিকে নিয়ে এসেছি। শুনুন বিবরণ। এ মেয়ে কঠিন মেয়ে, আপনার ঘরে তো অনেক বাচ্চা, খুদে ডাকাতের দল। ছোটগুলিকে পড়াবে আর থাকবে। আপনার আশ্রয়ে দিয়ে আমি নিজের কাছে জবাবদিহি করতে পারি, এমন মেয়েটাকে সত্যি ভাল জায়গায় দিতে পারলাম। শুনুন বিবরণ।

বিবরণ শুনে তিনি বলেছিলেন, বহুত আচ্ছা। বাহবা কন্যা! ধন্য ধন্য। তোমার পায়ের ধুলোয় পবিত্র হল ঘর। থাক তুমি এখানে। ওই ছোট দৈত্য তিনটেকে পড়াও, পড়াতে দেখে শুনে আর কয়েকটা জোগাড় হয়ে যাবে। নিজে পড়। এই আমার বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ একটি ছোটখাটো আকারের বেণী ঝুলিয়ে ঘড়ির কাঁটার মত যায় আসে। সে ওই ছেলে পড়ায় পাড়ায়। তোমারও হয়ে যাবে।

ঘোষাল বললেন, ইনি কে জান? বিখ্যাত আর্টিস্ট শিবনাথ বাঁড়ুজ্জে!

—না-না-না। ঘোষাল কিছু জানে না। আমি তো আসল পরিচয় দিইনে। তোমাকে দিই। আমি ভাই সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা। এই যে দল দেখছ, এরাই সব নয়, আরও আছে। পাশে বড় মেয়ে থাকেন, তাঁর আছে

চার, তিন কন্যা, এক পুত্র। এক পুত্র থাকেন রানীগঞ্জে, তাঁর তিন। কনিষ্ঠার এক। ওদের বন্ধু—তারা বলে পিতামহ। সকলে খুশী ক্যাম্প, তাদের ছেলেগুলো ঘোরে ফেরে—তারা শুনে শুনে জেনেছে, এর নাম পিতামহ। আমার সামনের এই ড্রেন, এতে যখন বৃষ্টির জল চলে, তখন তারা এসে পড়ে সাঁতার কাটে, আর আমি আর পিতামহ দেখি, দাঁড়িয়ে যে সাঁতার খেলা। এর মধ্যে দেবতা আছে দৈত্য আছে, যক্ষ আছে রক্ষ আছে, কিন্নর গন্ধর্ব রাক্ষস নরবানর সব আছে। আমি পিতামহ ব্রহ্মা। বাড়িটির মধ্যে অহরহ চলছে পুরাণের পালা। সমুদ্রমন্থন। দুটো বাদাম, চারটে ছোলা, একটা পেয়েরা বা নাড় বণ্টন নিয়ে চলছে মহা সংগ্রাম। তা তুমি এলে, তুমি নারী, তুমি সাক্ষাৎ মোহিনী হয়ে এদের বিবাদ ভঞ্জন করবে, থাকবে। ঠিক হয়েছে।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে, যাত্রা থিয়েটারের বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললেন বৃদ্ধ শিল্পী। চিত্ত তার ভরে গেল।

ঘোষাল বললেন, আমি নিশ্চিন্ত। শুধু তুমি আশ্রয় পেলে না, একজন অমর-শিল্পীর—

বাধা দিয়ে বৃদ্ধ আবার বক্তৃতা শুরু করে দিলেন, মূঢ়, তুমি মূঢ়। এই ডকাতের দল আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কেউ ভাল কেউ মন্দ, কেউ দেবতা কেউ পাষণ্ড। এদের জন্য কেউ বলবে ধন্য ধন্য, এমন পিতামহ না-হলে এমন নাতি! কেউ বলবে, এমন কুচক্রী মন্দ ঠাকুরদা না হলে এমন নাতি! এক অংশে চন্দন এক অংশে পঙ্ক মেখে, আমিও বলব ধন্যোহং, আমি অমর পিতামহ। এখন মোহিনী তুমি এসেছ, দেখ তোমার মোহে যদি দৈত্যেরা দেবতা হয়। আমার দুই অংশে চন্দনেই বাবস্থা হয়।

•

পূর্ণ দেড় বছর এখানে তার কেটেছিল। জীবননাট্যে অনেক দুর্যোগময় পরিবেশ এবং অনেক যন্ত্রণাময় যুদ্ধের নাট্যপ্রবাহের পর এটি একটি সুন্দর প্রভাত। মেঘ নাই, মাটি ভিজে নরম, কিন্তু পিচ্ছিল নয়, পাখিরা কলরব করে আকাশে ডানা মেলেছে; তারই মধ্যে একটি বাউল একতারা হাতে গান গাইছে—

"কাঁদিস কেন ও পোড়া মন
'রাধে' বলে নাচনা কেন?
এমন মানব জনম আর পাবিনে—
সাধে সাধ মিটনা প্রেম?
ওরে কোনে কোনে মরবি কেন—
বানে ডুবে মরবি কেন?"

এ ওই বৃদ্ধ শিল্পী শিবনাথ দাদু, পিতামহ! প্রাণে তিনি সুর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। গানটি তিনি সাঁতাই গাইতেন। গলা ছিল না, তবু গাইতেন। অবশ্য বাউল সেজে নয়। তবে পোশাক ছিল বিচিত্র, লোকে দেখে মুচকে হাসত। শিল্পী শিবনাথের এই পোশাক, এই চেহারা। খালি-গা, গলায় রাধুনীবামুনের মত মালার ঢঙে পৈতে; থান-কাপড় ডবল করে লুঙ্গির মত পরা, খালি পা, শীর্ণকায় কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধের হাতে মাটি গায়ে ধুলো। তা ওই এক ধরনের বাউল গুণ গুণ করে গাইতেন। গানটা ও'রই রচিত। বৃহৎ সংসার—তিন ভাইপো পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্র পৌত্রী চাকর ঠাকুর ঝি নিয়ে ছিল তেইশ তাকে নিয়ে হয়েছিল চব্বিশ। এ ছাড় বাড়ীতে একজন দুজন আছেনই। কেউ তার সাক্ষাৎ মা-কালী, কেউ শানিঠাকুর, কেউ দুর্গা কেউ লক্ষ্মী, অবশ্য ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে বাড়ির গৃহিণী ওদের দেখলেই চেনেন সকালে আটটা থেকে ভাত খাওয়া শুরু রাত্রে একটায় শেষ। পিতামহ মিথ্যে বলেননি বাড়িতে ওই নাতিগুলোর মধ্যে অহরহ দেবাসুর সংগ্রাম চলেছে, বাড়ির ভিতরেই দরদালানে বাড়ির সামনে একটুকরো মাঠে ফুটবলে ভলিবলে ক্রিকেটে-ক্যারমে সংগ্রাম তো চলেই, তখন ওদের বন্ধুরাও জোটে। পাশেই বড় মেয়ের ছেলেও এসে জোটে। তার তিন মেয়ে আসে। বড় মেয়েটি এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠা। আশ্চর্য গুণবতী প্রতিভাশালিনী মেয়ে। দাদুই নাম রেখেছিলেন শকুন্তলা—এখন বলেন সরস্বতী। আর দুজন মণি-রুণি। মণি মানবী, বাস্তববাদিনী, রুণিকে বলেন অপ্সরী, কারণ সে প্রায় অনবরতই নাচে। আর একজন আছে ছোট ছেলের বড় মেয়ে মঞ্জু, সে মধ্যে মধ্যে বাপের কর্মস্থল থেকে মায়ের সঙ্গে আসে,—সেও তাই—নাচে। আর একটি সর্বকনিষ্ঠা কন্যার প্রথমা কন্যা বছর দেড়েক বয়স, তার নাম লালমোহিনী। দাদু ছড়া বেঁধেছেন—

"লালমোহিনী রাণে,
লালমোহিনী মান করেছে বংশী বংশী সাধে।"

বড় নাতিকে বলেন, দেবরাজ। বড় দৌহিত্রকে বলেন, জেণ্টেলম্যান। মেজ পৌত্র 'মহারুদ্র', তৃতীয় নাতিটি বড় ভাল, শান্ত মানুষ। মধুর মানুষ। তার পরেরটির অনেক নাম—বুদ্ধিমান, জ্ঞানবৃদ্ধ—কথাটা মিথ্যে নয়, পুরাণের গল্প শুনে কণ্ঠস্থ করেছে, কখনও হয় রাম, কখনও হয় অর্জুন, কখনও বুদ্ধও সাজে; এবং দুষ্টবুদ্ধির অন্ত নেই। দোতলা থেকে পড়ে কপাল কাটে, পথে পড়ে থুতনি কাটে। তার ছোটটি শ্যাম, এটি ওরই চাপে পৃথিবীর মত উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপার মত, একটু ম্লান হয়ে গেছে। বড় লোভী। কিছু না পেলে

ভাঁড়ারের চাল নিয়ে ভিজিয়ে খায়। গোটা রেশনের চালে জল ঢেলে দেয়। তার পরেরটা দিনরাত্রি ছুতোয় নাতায় চেঁচায়; হাতে পেরেক স্ক্রু-ডাইভার ছুরি কাটারি নিচ্ছেন, একটা কিছু চাই-ই। বছর চারের বয়স, এর মধ্যে মায়ের ড্রেসিং টেবিলটা পেরেক ঠুকে ভেঙেছে। ডাক্তার আসছেই আসছেই। এর জ্বর, ওর পা কেটেছে, ওর টনসিল। আর দাদুর অসুখ লেগেই আছে। মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হয়, তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত। তবে শরীর অসুস্থ তাতে সন্দেহ নেই। বড় ভাই-পো চাকরে, কিন্তু কাব্যবিভোর। মেজ ভাইপো ডাম্বল ভাঁজে, কলেজ ইউনিয়নে সেক্রেটারি, আপন মেজাজে আছে; তার পরেরটি ঘাড় গুঁজে পড়ে, একটু গোঁয়ার, কিন্তু বেশ লোক। বড় জামাইটি আশ্চর্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ছোট জামাই ডাক্তার। বড় ছেলে ভাল চাকরি করেন। সুখের সংসার। সব সুখ ওই মানুষটাকে কেন্দ্র করে। তবু কলহ বাধে। বড় ছেলের সঙ্গে বাধে, সে তাগাদা দেয় নূতন কিছু আঁকুন।

বলে, আপনি জানেন না, কত বড় শিল্পী আপনি। উনি চটেন। মধ্যে মধ্যে ক্ষেপে যান। মধ্যে মা এবং স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেন। কারণ তিনি সংসার চালান এখন। সেটা জাহির করেন। দাদুরও স্ত্রীর সঙ্গে বাধে মধ্যে মধ্যে, সে ভীষণ বাধা। তিনি পুজো নিয়েই থাকেন। তবে তাঁর ধারণা দাদু তাঁকে ঠিক তাঁর উপযুক্ত মনোরমা মনে করেন না। দাদুর অধিকাংশ নারীমূর্তির মুখে তাঁর আদল। তারা ছবির ভাববস্তুতে মহিমান্বিত। তবু স্ত্রী বলেন, কি খারাপ করেই আঁকলে তুমি আমাকে। ক্ষোভে বিরোধ। দুর্দান্ত বিরোধ। বড় পুত্রবধূ ঝগড়া সে করে না, তবে মধ্যে মধ্যে না খেয়ে শুয়ে থাকে। বিচিত্র মানুষ, কখনও মনে হয় এ বাড়িতে এসে সে ধন্য হয়েছে, কখনও ভাবে এ বাড়িতে পড়ে তার কোন সাধই মিটল না। বড় মেয়ে পাশে থাকে। বড় জামাই তাকে আশ্চর্য গড়েছে। সুস্থ সবল মন। সকল গৃহকর্ম নিজে হাতে করে, ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, হাসিমুখে।

রোজ সন্ধ্যায় বাপ-মাকে দেখতে আসে। ছোট জামাই ডাক্তার, কৃতী ছেলে, সেও রূপোর চাঁদ নয়, সেও সোনার। ছোট মেয়ে বাপের সর্বপ্রিয় সন্তান। চমৎকার মেয়ে, কিন্তু তাতেও পোকা, সর্বদাই ভয়ে অস্থির তার টি বি হবে। ছোট ছেলে বাইরে থাকে, খুব কৃতী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বাস্তববাদী দুর্বাসা। ছোট বউটি মাটির মানুষ, বড় ভাল। তাদের বড় মেয়েটি নৃত্যপরা—দুটি ছেলে, তার একটি ওই বুদ্ধিমানের চ্যালা, অন্যটি বাচ্চা, একটা ঘোড়া ঠেলে বেড়ানোই তার একমাত্র নেশা। কলরব কোলাহল, কলহ, হাসি-কান্নার সে এক অহরহ মুখরতার মধ্যে মূল একটি সুর কান পাতলেই ধরা যায়, সে সুর আনন্দের, সে সুর সুখের। সে ওই মানুষটিকে কেন্দ্র করে। এই দেড় বৎসরে সেও ওই সুরে জীবনের তার বাঁধতে চেয়েছিল। অনেক সময় বেঁধে খুশি হয়ে ভেবেছে, বাস, এইবার সে সুখী হতে পারবে। কিন্তু আশ্চর্য, আবার কিছুক্ষণ বা কয়েকদিন পরেই দেখেছে, ঠিক সুরে সুর

মিলছে না। এবং আরও আশ্চর্য হয়েছিল, বিচিত্র বেদনাহত অবস্থায় ওই বৃদ্ধকে দেখে। যেন কত বেদনা, কত উদাসীনতা। মধ্যে মধ্যে চোখে জলও পড়তে দেখেছে। কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হয়নি। তবে মনে হয়েছে, ঠিক তারই মত দাদুর মনের মূল সুরটি এদের সঙ্গে পৃথক। স্টুডিয়োয় ঢুকলেই এই বেসুরো মানুষটা আত্মপ্রকাশ করত। উদাস দৃষ্টি বেদনায় আচ্ছন্ন, চোখে জল পড়ে। ও ঘরে সে ঢুকত না। সাহস হত না তার। ভাবত, অনধিকার চর্চা। সে নিজের অধিকারের গণ্ডি লঙ্ঘন কেন করবে? উনি স্টুডিয়োতে ঢুকলে বাড়িটার প্রত্যেকেই প্রহরারত নন্দিকেশ্বরের মত তর্জনী উদাত করে শাসন করে, চুপ। ছবি আঁকতে বসেছেন। চুপ। ও ঘরে যাবে না ছেলেরা! নিজেরাও যায় না। উনি বেরিয়ে এলে চুপি চুপি গিয়ে দেখে আসে, কি ছবি আঁকা শুরু করেছেন। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে আসে, দেখতে পায় ক্যানভাসটা শাদাই আছে। অবশ্য তাগিদে বরাতে কিছু আঁকেন, ওঁরা হৈ হৈ করে, উনি বিষন্ন হাসেন।

এরই মধ্যে সে আই-এ পাস করলে ফার্স্ট ডিভিসনে। সমস্ত কিছুর মধ্যেও আর কিছু না হোক সে পড়াশুনোর সুবিধেটা পেয়েছিল। তা পেয়েছিল। অসুবিধে ছিল, তবু আনন্দের মধ্যেই সহ্য হয়ে গেছে। এদের বাড়ি খাওয়া থাকা ছাড়া আর কিছু পেত না, তবে পুজোয় কাপড় জামা দিয়েছিলেন, আর পরীক্ষার ফিজটা দিয়েছিলেন। মাত্র এক বাড়িতে একটি ছেলেকে পড়িয়ে দশ টাকা পেত, তা থেকেই চলেছে কলেজের মাইনে। সম্বল একশো এক টাকার সবটাই খরচ হয়ে দাঁড়ালো তিরিশ টাকা।

পরীক্ষার খবরে সে খুশি হল। ফার্স্ট ডিভিসন, অখুশি হবার নয়। সে সর্বাগ্রে ছুটে গেল দাদুকে প্রণাম করতে। আজ অধিকার অনধিকার বিবেচনা করলে না, গিয়ে ঢুকল স্টুডিয়োতে। উনি চুপ করে বসেছিলেন। সামনে ইজেলে ফ্রেমে আঁটা কাপড়, তুলিটা নামানো, উনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। একটু চঞ্চল পদেই সে ঢুকেছিল, তবুও তাঁর তন্ময়তা ভঙ্গ হয়নি। অকারণে একটু কেশে সে বলেছিল, দাদু!

—কে? ও। কি খবর? কিছু সৌভাগ্য নিশ্চয়, তুমি তো কখনও এঘরে ঢোক না!

—আমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছি দাদু!

—বাঃ। বহুত আচ্ছা।

নীরা এবার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলেছিল, কিন্তু এইবার যে বড় ভাবনা হল দাদু। এরপর?

—পড়। পড়ে যাও।

—পড়া ঠিক এই রকম করে হয় না দাদু! তা ছাড়া—থাক দাদু।

—কেন ভাবছ আমি ভাবব ইঙ্গিতে তুমি আমার উপর চেপে বসতে চাও? না, তা ভাবব না। তোমাকে চিনি।

চুপ করে একটু বসে থেকে সে প্রসঙ্গটা পরিবর্তনের জন্যই বললে, কই, আঁকেননি তো কিছু? একটা দাগও পড়েনি।

—নাঃ।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব দাদু?

—কর। বল।

—বাড়িতে প্রায়ই শুনি আর-আপনি তাগিদ ছাড়া বরাত ছাড়া ছবি আঁকেন না। মানে নিজের কল্পনায়। কেন?

মুখের দিকে চেয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে জনালার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নীরা সাহস করে বললে, দাদু!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, যা আঁকতে চাই তা যে কল্পনা করতে পারছিনে। নীরা, সংসারে রূপ অপরূপ অনেক এঁকেছি। দেখেছি, এঁকেছি। অরণ্য এঁকেছি, পাহাড় এঁকেছি, সমুদ্র এঁকেছি, আকাশে সূর্য চন্দ্র, সূর্যাস্ত সূর্যোদয়, প্রতিপদ পূর্ণিমার চাঁদ এঁকেছি, লতা গাছ ফুল মানুষ, মা প্রিয়া পূজারিণী বিধবা, শিশু যুবক বৃদ্ধ, অনাথ বিদ্রোহী প্রেমিক, মৃত্যু ভাবনাহত, মৃত সদ্যপ্রসূত দেখলাম আর আঁকলাম। ঝড় এঁকেছি, আলো এঁকেছি, অন্ধকার এঁকেছি। বুদ্ধ এঁকেছি, ক্রাইস্ট এঁকেছি, গান্ধী এঁকেছি, রবীন্দ্রনাথ এঁকেছি, সুভাষচন্দ্র এঁকেছি। অনেক নাম, অনেক যশ, তার সঙ্গে অর্থও অনেক পেয়েছি। কিন্তু নিজে কি আঁকলাম? অথবা এ সবের পিছনে যিনি বা যা একটা কিছু তাকে কই আঁকলাম? পাচ্ছি না যে তাকে। যা যা যাঁনির মধ্যে এ সব আছে, সেই বিশ্বরূপ! কিসের শিল্পী আমি নীরা, তাঁকে আমি কল্পনা করতে পারিনে, তাঁকে আঁকতে পারিনে। মিছে—আমার সব মিছে হয়েছে। তাই তুলি ফেলে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শুধু ভাবি, আর কাঁদি আমি নীরা।

বলে আকাশের দিকেই চাইলেন আবার। নীরা সন্তর্পিত পদক্ষেপে বেরিয়ে এল। তিনি অবশ্য ফিরেও তাকালেন না।

এই দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। মধুর তবু প্রচ্ছন্ন বেদনা আছে। তা থাক। বেদনায় মাধুর্যে, পৃথিবীর দিনরাত্রির মত সহজ আনন্দে প্রসন্ন।

আরম্ভ হল যেন রাত্রির পর দিন।

•

দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রভাত যেন দ্বিপ্রহরের পথে অগ্রসর হচ্ছে। ডাক পড়ছে চারদিক থেকে, ঘণ্টা পড়ছে ইস্কুলে। আপিসে

আপিসে লোক ছুটছে। দরজা খুলছে। সে চিন্তায় পড়েছিল। এখানে থেকে কি করবে সে? এখানে এদের কাজ কিছু নেই। ছেলেরা ঠিক তার কাছে পড়ে না। নামমাত্র বসে। তারপর উঠে যায় ওদের কাকু শিবনাথ-বাবুর বড় ভাইপোর কাছে।

হঠাৎ সেদিন সে চমকে উঠল। দাদু উল্লাসে চিৎকার করছেন, বিনো-দা! আরে বাপরে। বিনো দা' দি গ্রেট। জয় ভগবান, সর্বশক্তিমান, জয় জয় ভবপতি। অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা! হে বিনো-দা!

হা-হা হাসিতে গোটা বাড়িটা ভরিয়ে দিয়ে কে হেসে উঠল। এবং সে এক ভরাট কণ্ঠ-স্বরে বিব্রতভাবে বললেন, আরে-আরে ওকি হচ্ছে, ওকি হচ্ছে। দাদু! ইউ আর লাভলি, ইউ আর গড-লি! আই অ্যাম- ম্যাড'লি ইন লাভ উইথ ইউ।

—চুমু খাবো বিনো-দা, তোমায় চুমো খাবো। বিশ্বাস কর, মুখে গন্ধ নেই, পুরনো দাঁত একটাও নেই, কোন জার্ম নেই। তুমি আজ দু বছর আসো নি। কিন্তু টুপিটা কেন? ওটা তো আগে পরতে না।

আবার হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, টাকের জন্যে দাদু। টাকের জন্য। দেখুন না।

—হে ভগবান! এ যে প্রায় মনুমেণ্টের পাদদেশ করে ফেলেছ। অনবরত মিটিং বুঝি? কিন্তু দেশ তো উদ্ধার হয়ে গেছে। না 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'দের দলে জুটে মিটিং বাড়িয়ে ফেলেছ? কিন্তু তারা তো আণ্ডারগ্রাউণ্ড হে। দরজা বন্ধ করব না-কি!

—রামোচন্দর। ও সব বাদ দিয়েছি। বিশ্বাস করুন। কিন্তু টাক পড়ার কারণটা বুঝলাম না। বংশে তো নেই, আমার হয়ে গেল। তা থাকগে এখন আপনার ঝণ্টুর দলকে ডাকুন, কিঞ্চিৎ বিলাতী মিষ্টান্ন আছে, অর্থাৎ টফি লজেন্স। আলাপ করা যাক, ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

—এ যে অনেক গো বিনো-দা! এত?

—সেখানে যে আমার ছেলেরা আছে। সে তো কম নয়। আপনি তো জানতেন, সাত আটটি। এখন যে পঁচিশটি! একে-বারে পাকাপোক্ত পঞ্চাশ বিঘে জমির উপর পাকাবাড়ি, ইস্কুল, বোর্ডিং। বুঝলেন না। সরকার টাকা দিচ্ছে। আমাদের এডুকেশন সেক্রেটারি গিয়েছিলেন, দেখে এসে চীফ মিনিস্টার এডুকেশন মিনিস্টারকে বলেছেন, বিশ বাইশটা ছেলে, তা বিনো সেন খুব ভাল ম্যানেজ করছে; ডাকাতের দল হবে না, ওঁকে টাকা দেওয়া উচিত। তা টাকা দিয়েছেন।

বিস্ময়ের আর বাকী ছিল না নীরার। কে এই মহাপুরুষ? এতগুলি ছেলে! পঁচিশটি! ঠিক যেন ধরতে পারছে না ব্যাপারটা। দাদুর কোন বন্ধু সন্দেহ নেই, হয় তো দাদা। তা হলে বোধ হয় নাতি। আট নয় সন্তানের পিতা, আট নয় সন্তানের গড়ে দু বছর অন্তর সন্তান হলে, দু বছরে ষোলটি আঠারোটি, তার সঙ্গে আগের সাতটি যোগ করলে অবশ্যই পঁচিশটি হতে পারে। আরও বেশী হয়নি এই আশ্চর্য। ওদিকে বাড়িতে সাড়া পড়ে গেছে, দাদুর বড় মেজ দুই নাতি উঁকি মেরে দেখে সোর-গোল তুলেছে, বিনো-দা, দিদি দিদি বিনো-দা এসেছেন, মা পিসীমা বিনো-দা!

দেখতে দেখতে ঘরটা ভরে গেল। বাচ্চা-গুলো এবার সাহস করে ঢুকেছে। সেই কণ্ঠ-

স্বর শ্নেলে নীরা। —এস বন্ধ্গণ গ্রহণ কর, টফি এবং লজেন্স! এস এস। এস এস, বীণা এস, বউমা এস।

এমন সময় ঘরে ঢ্কলেন দিদি। —আঁ বিনো-দা, পথ ভুলে নাকি? বাপ! আমি ভাবলাম দেশান্তরে গিয়ে, মানে বিলেত টিলেত গিয়ে, আজকাল তো স্বাধীনতার পর খ্ব স্ববিধে, গিয়েছেন সেখানে, কার্র প্রেমে পড়েছেন এতকাল পরে।

হেসে সারা বিনো-দা। —বলেছেন ভাল তো। কিন্তু ওটা ঠিক মনে হয়নি দিদি, নইলে চেষ্টা করা যেত। কিন্তু পোড়া বরাত আমার। সেই জঙ্গলে পড়ে আছি, আশ্রম ইস্কুল নানান ঝঞ্চাট! নিন, দ্টো লজেন্স খান।

—রসিক খ্ব। আমি লজেন্স খাব? আপনি খান।

—আমি সারা রাস্তা খাচ্ছি। খাই। দেখ্ন দাদ্কেও দিয়েছি।

—তা খান উনি, আমি খাব না।

—তবে এই নিন। ঠাকুরকে দেবেন তাদের গ্ড়। চমৎকার জিনিস।

—নীরা, নীরা। এবার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন দাদ্। আরে নীরা নেই?

বড় নাতি ছ্টে এসে তাকে ধরে টানলে, দাদ্ ডাকছে। জলদি। বিনো-দা এসেছে। এস, এস।

সেখে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ কথা শ্নে যা কল্পনা করেছে, তার কিছ্র সঙ্গে মেলে না। শ্ধ্ তাই নয়। সে প্রায় অভিভূত হয়ে গেল! ছ ফিটের উপর লম্বা, সবল স্বাস্থ্যবান। যৌবনের সীমান্তে উপনীত, রক্তাভ গৌরবর্ণ, এ যে ইতিহাসের কালের কোন মান্ষ। টিকলো নাক, খড়্গের মত, চোখ দ্টি ছোট, কিন্তু কি দৃষ্টি তাতে! তবে যত প্রসন্নতা তত কৌতুক সেখানে অহরহ। দীঘির তরঙ্গিত জলের মত আলোর ঝিলিমিলি তুলে রয়েছে; হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলে তাতে জাগে সেই আশ্চর্য দৃষ্টি, একটি স্র্যের প্রতিচ্ছটা চোখের তারায় ঝলসে ওঠে। তাকে দেখেই সেই দৃষ্টি তাঁর চোখে ফ্টে উঠল। বললেন, বাঃ!

দাদ্ বললেন, হ্যাঁ, শ্ধ্ বাঃ নয়, বাঃ বহ্ত আচ্ছা মেয়ে নীরা। ওর যা ইতিহাস সে শ্নলে—

—শ্নব পরে। কিন্তু এমন ফিগার এমন ম্খ, ওর ছবি আঁকেন নি?

—ছবি? নাঃ। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন দাদ্।

—নাও, তুমি টফি লজেন্স নাও। কি নাম? নীরা! হ্যাঁ নীরা। গ্রহণ্ কর।

আমার কাছে লজ্জা করতে নেই দেখছ, আমি বিনো-দা। ইউনিভারস্যাল।

দিদি বললেন, এই খানে খাবেন, ইলিশ মাছ আনাই।

—আনান।

—এখনও নিম-সেদ্ধ খান না-কি? ভিটামিন?

আবার হাসি। সেই ঘরভরা হাসি। তারপর বললেন, না। তা আর খাইনে। তবে খাদাটা সত্যিই ভাল ছিল।

—আর ভাল ছিল।

—ভাল ছিল না? রঙটা দেখছেন তো? এ ওই নিম খেয়ে।

—আমার আর রঙ পরিষ্কারের দরকার নেই, ওই আপনার কৃষ্ণবর্ণ দাদুকে বলুন। তারপর হঠাৎ বললেন, নীরা তুমিও খেয়ে দেখতে পার। তোমার রঙ কালো নয়, কিন্তু একটু ময়লা।

বিনো-দা বললেন, না না না। স্বর্ণ-লতায় আর শ্যাম-লতায় তফাৎ আছে দিদি। ওই শ্যামলিমাতেই ও অপরূপা। জিজ্ঞেস করুন দাদুকে। কি দাদু?

দাদু বললেন, কি বলব বল, 'তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা' ও তো পড়েনি। আর আমাদের মত শিল্পীর চোখ তো নয় ওর। ওদের হল সর্বদোষ হরে গোরা। নইলে বিনো-দা তুমিই বল, আমার ভুবন আলো করা কালোরূপে থাকতে তোমার গৌরবর্ণে মুগ্ধ হয়!

বউ মেয়ে পালাল। সঙ্গে সঙ্গে সেও ফিরল। দিদি হয় তো ঝগড়া করতেন, কিন্তু শেষটার জন্যে হাসতে বাধা হলেন, বললেন, বলব কি বলুন। বউ বেটীর সামনে, ছি! এখন চা খাবার পাঠাচ্ছি। বীণার ঘর থেকে হারমোনিয়ম পাঠাচ্ছি। গান শোনান।

—যা আজ্ঞা করবেন। কিছু লবঙ্গ পাঠাবেন তা হলে।

আবার একবার চমকে উঠল নীরা। এ কি কণ্ঠস্বর! গান রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি প্রাণ ঢেলে গাওয়া! বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনি ওঠে। জানালার লোহার গরাদেতে হাত দিলে টের পাওয়া যায় কম্পন উঠছে। গাইছিলেন—

'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি?
হায়, বুঝি তার খবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও—কি—
হায়, বুঝি তার নাগাল মেলে না।

কোলাহলমুখর চঞ্চল সংসারটার জীবন স্রোত, স্রোত কল্লোল, সব স্তব্ধ স্থির হয়ে গেছে। যমুনা হয় তো এমনই ভাবে উজান বইত। কিন্তু ভগবান যাকে দেন, তাকে কি এমনি করে দু হাত ভরে দিয়েও ক্ষান্ত হন না, পরিপূর্ণ করে উপচে মাটিতে ফেলে দেন? এ লোক তো গান গাওয়ার মত গায় না!

দিদি বললেন, তা বটে। সুধা আপনার প্রাণে আছে। খবর কেউ পেলে না।

আবার সেই হাসি।

দিদি বললেন, একখানা ভক্তি রসের হোক। রবীন্দ্রনাথেরই।

—উঁহু। এগুলো এই প্রেমের গান, নতুন শিখেছি এখন। সেগুলো পুরনো মনে হচ্ছে।

—তবে স্বদেশী।

—মহাত্মাজীকে যেদিন হত্যা করেছে, সেই দিন থেকে শব্দটাই ভুলে গেছি। খাইদাই, ওই অনাথ আশ্রমটা করেছি, তাই করি, ছবি আঁকি,. ও সব দামোদরে ভাসিয়ে দিয়েছি। *এখন গান শুনুন—বলেই ধরে দিলেন,*

কান্না হাসির দোল দোলানো
পৌষ ফাগুনের পালা—
তারই মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা।
এই কি তোমার খুশি,
আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা।

গানের পর গান, বেলা দেড়টা পর্যন্ত। তারপর স্নান খাওয়া। সে রাত্রিটাও রইলেন তিনি। ছেলেদের সংগে দেখা না করে যাবেন কি করে! বিকেলবেলা দাদু তাকে ডাকলেন, বললেন, নীরা, বিনো-দা তোমার কাহিনী শুনে তোমার ভক্ত হয়ে পড়েছেন। বলছেন, *তুমি-যদি ও'র অনাথ-আশ্রমে যাও,* কাজ কর, তবে উনি তোমায় কাজ দেবেন। বি-এ পড়ারও খুব সুবিধে করে দেবেন। অবশ্য প্রাইভেটে।

বিনো-দা বললেন, আমার এক মাস্টার-মশাই আছেন। বুঝেছ। পণ্ডিত লোক। মাস্টারি কলেজেই করতেন। রিটায়ার করে দুর্গতি, দেশে গিয়েছিলেন, ময়মনসিংহে সেই ভৈরবের ধারে। দেশভাগের সময় আসতে গিয়ে নিজে এসেছেন, দুটো নাতি এসেছে, আর বিধবা বোন, বাকী সব খতম। সর্বস্বান্ত। আমি তাকে ওখানে নিয়ে গেছি। যা পারি সেবা করি। উনি এটা ওটা করেন। তুমি পড়লে সানন্দে পড়াবেন। মাইনে দেব চল্লিশ টাকা, আর খেতে পাবে দু বেলা বোর্ডিং-কিচেনে। আরও দুটি মেয়ে-মাস্টার আছেন, একটি মহিলা আছেন ছোট্ট বাচ্চা-দের দেখেন, এঁরা সবাই কিচেনের খাবার খান, তার ওপর নিজেরা যে যা পারে করে নেয়। এই আর কি! তোমার মত একটা মেয়ে বাংলাদেশে জন্মায় শুনেই তো আমার নাচতে ইচ্ছে করে। বই-কাগজে এ দেশের মেয়েরা দুঃখে দুর্দশায় কেবল অধঃপাতে যাচ্ছে, মিথ্যে বলছে, নিজেদের বেচছে, চোখে কাঁদছে আর কাজল পরছে, ঠোঁটে রঙ মাখছে, এই তো শুনি। এমন হয়েছে যে মেয়ে দেখলেই সন্দেহ হয়, কে রে বাপু, কি এর কাহিনী। তা তোমার কথা শুনে ভারী ভাল লেগেছে। তোমার মত মেয়ের উপকারই আমি করছি তা নয়, মনে ভরসা হচ্ছে, আশ্রমটা গড়ে তুলতে পারব।

সেও এর মধ্যে বিনো-দার কাহিনী শুনে-ছিল।

বিনো-দা—বিনয় সেন, আর্ট স্কুলে পড়তে পড়তে অস্ত্রাগারের চেষ্টার অপরাধে ধরা পড়ে জেলে ঢুকেছিল। হাতেখড়ি তার আগেই হয়েছিল। তখন তার বিশ বছর বয়স, ১৯৩১ সালে।

তিন বছর জেল—সশ্রম কারাদণ্ড। তারপর ডিটেনসন। তারপর বেরিয়ে এসে গণ-সংযোগ। ছবি আঁকা অবশ্য বন্ধ হয়নি। জেলে প্রথম কাঠকয়লা। তারপর কাগজ রঙও জুটেছিল। ডিটেনসনে সব যোগাড় হয়েছিল, ইজেল থেকে বিলিতি তুলি রঙ, সব। ডিটেনসনের আর একটা সুবিধে হয়ে-ছিল, গ্রামটা ছিল বোলপুরের কাছে। মহান শিল্পী নন্দলালের কাছে মাঝে মাঝে যেতেন। ওখানকার অন্য শিল্পীদেরও সাহচর্য শিক্ষা তাও পেয়েছিলেন। বেরিয়ে এসে গণসংযোগ করতে করতে হঠাৎ কলকাতায় এসে আবার বছরখানেক আর্ট ইস্কুলে পড়ে বেরিয়ে এলেন খ্যাতিমান হয়ে; সেবারকার একজি-বিসনে সোনার মেডেল পেলেন। তখন এক বছর খাঁটি শিল্পী হয়ে কলকাতায় কাটিয়ে-ছিলেন। সেই সময়েই দাদুর সংগে আলাপ। কিছুদিন শিষ্যত্বও করেছিলেন। সেই সময় বিনয় সেনের চেলারা এসে ডাকত 'বিনো-দা'। একদা দাদুও বললেন 'বিনো-দা'। সে নামটা কলকাতায় ছড়াল। বেশী বয়সীরাও বলতে লাগল, বিনো-দা। তারপর বিনো-দা হঠাৎ আবার উধাও। এবার একেবারে মহাত্মাজীর আশ্রমে। সেখানে বছরখানেক থেকে ফিরে এসে এবার গণসংযোগ। সেই সময়েই ওই অঞ্চলে গিয়েছিলেন। বছর আড়াই পরে—বিয়াল্লিশ সাল। ফের বিনো-দা জেলে। বেরুলেন পঁয়তাল্লিশ সালে। তখনই এই আশ্রমের পত্তন। বিয়াল্লিশে এই জংগলে লুকিয়েছিলেন ব্রাত্যদের ঘরে। ফিরে যখন সেখানে গেলেন, তখন দুর্ভিক্ষে মড়কে গ্রাম শেষ। ছিল গুটি তিনেক ব্যাধিগ্রস্ত কঙ্কালসার মেয়ে, একটি পুরুষ আর গুটি চারেক ছেলে। কাজ শুরু করেছিলেন তাদের নিয়ে। সাত-চল্লিশে দেশ স্বাধীন হল, সেবার তিনি পেলেন একটি বড় শিল্পীর সম্মান। সেই বছরই তিনি গেলেন ফ্রান্সে। আশ্রমের ভার দিয়ে গেলেন এক অনুগামী কর্মীকে। ফিরে এলেন গান্ধীজীর তিরোভাবের পর। অর্থাৎ মাস কয়েক থেকেই। বললেন, কি হবে আর ছবি এঁকে! চাকরী তিনি দু তিনটে পেয়ে-ছিলেন। কিন্তু তার কোনটা নিলেন না, এসে বসলেন এই অরণ্যভূমে, সেই গ্রামটিতে। গড়ে তুলতে লাগলেন। মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসতেন, তখন ঘন ঘনই আসতেন, দাদুর বাড়ি আসতেন, দু বেলা খেয়ে গান শুনিয়ে তবে যেতেন। মধ্যে মধ্যে দিল্লিও যেতে হত। একদা মহাত্মার স্নেহ পেয়েছিলেন, আজ যাঁরা রাষ্ট্রের কর্ণধার তাঁরা এই খেয়ালী প্রিয়-দর্শন শিল্পী কর্মীকে চেনেন, তাঁর গানও

শুনেছেন। তাঁকে ডাকতেন শিক্ষাদপ্তর; সমাজকল্যাণ দপ্তর। তিনি যেতেন। পথে দাদুর বাড়ি ইলিশ মাছ না খেয়ে আর গান না শুনিয়ে যেতেন না। তারপর এই দু বছর একেবারে আসেননি: দু বছর পর এসেছেন, বাড়ি মেতে উঠেছে। উজ্জ্বল বাড়ি উজ্জ্বলতর হয়েছে। এই সর্বজনীন বিনো-দা; শিল্পী দেশসেবক বিনয় সেন। তিনি বললেন, যাবে আমার সঙ্গে? দেখ!

নীরা বললে, যাব।

এতো তার ভাগ্য! একজন খ্যাতিমান লেখক সেদিন তার অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দিয়েছেন—

পিছে তোর পড়ে থাক নগরীর দীপ

মানুষের ঘরে জ্বালা ভীরু শিখা আলো—
ভয় কিরে? চিরদিন আঁধার সমুদ্রে

যাত্রীদলে নক্ষত্রেরা দিগন্ত দেখালো।
এতো ধ্রুবতারার আলো।

চল উত্তর মুখে। ওই তো শ্রেষ্ঠ পথ।

॥ ছয় ॥

এসেছিল বিনো-দার সঙ্গে অনাথ আশ্রমে। এই তৃতীয় দৃশ্য, এই দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য। ছ বছর ধরে একটি দৃশ্য। শেষ হল আজ। আকাশের নক্ষত্রও খসে প'ড়ে অঙ্ক শেষ। নাটক নয়? থাক সে কথা। আশ্চর্য বিশ্বাস এবং আশা নিয়ে এসেছিল। এখানে পোঁছনোর দিনের কথা মনে পড়ছে। বিনো-দার সঙ্গে সে এসে নামল। চারিদিকে নূতন বাড়ির পত্তন হয়েছে, রাজমিস্ত্রী মজুর খাটছে। একপাশে কতকগুলি মাটির বাড়ি। সবই দো-চালা ঘর। সামনে শালখুঁটির বারান্দা। আঁকা-বাঁকা কাঁচা শাল কেটে লাগানো হয়েছে—যথাসম্ভব কম খরচের জন্য বোধহয়। ওদিকে যার পত্তন হয়েছে সে এর তুলনায় রাজসূয়ের আয়োজন। শান্ত শ্যামশোভায় স্নিগ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে ঘন গেরুয়া রঙের কাঁকুরে প্রান্তর, তার মধ্যেও ছোট ছোট শাল-চারা জন্মেছে অজস্র। পথে দামোদর-ভ্যালি কর্পোরেশনের দুর্গাপুর ব্যারেজের কাজ শুরুর আয়োজন দেখে এসেছে! তারা যেতেই গোটা আশ্রমে সোরগোল উঠেছিল।

বিনো-দা এসেছে। বিনো-দা, বিনো-দা, বিনো-দা! গোটা আশ্রমের ছেলে মেয়ে। শিক্ষয়িত্রীরা তিনজন। বিনো-দার চ্যালা কজন। দেখতে কয়েকজন গ্রামের লোকও এসেছিল। গ্রামে আবার লোকজন বসতে শুরু করেছে। ঘরদোর করেছে। এক বৃদ্ধও এলেন। চিনতে বাকী রইল না—ইনিই সেই মাষ্টার মশাই। কিন্তু উল্লাস উচ্ছ্বাসটা যেন ঘা খেলে। সকলের চোখে মুখে একটি প্রশ্ন জেগেছে—সঙ্গে এ কে? অর্থাৎ নীরা। নীরা মুখ নত করতে বাধ্য হল। শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে গোপনে ইশারা শুরু হয়েছে, একজন একজনের আঙুল টিপছেন। কিন্তু চোখ তারই উপর। একজন স্থূলাঙ্গী—একটু বয়স হয়েছে। অপরজন ক্ষীণাঙ্গী, বয়স ধরা যায় না, তবে বয়স অপরজনের কাছাকাছিই হবে। তাদের পাশে আর একজন, বিধবার সজ্জা—মেয়েটি সুন্দরী—তার থেকে কিছু বয়স বেশী, হয়তো বত্রিশ চৌত্রিশ। নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকে দেখছেন। আশ্চর্য বিস্ময় এবং প্রশ্ন তাঁর চোখে। বৃদ্ধটি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কে বিনো?

বিনো-দা বললেন, ও নীরা, এক ভৈরবী মেয়ে। এখানে কাজ করবে। ওই দুষ্টুদের শায়েস্তা করবে। আর আপনার ছাত্রীও বটে, আপনার কাছে পড়বে। আই এ পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিসনে। বি এ-র ভার আপনার মাষ্টার মশাই। আরে জামা ধরে টানিস কেন? কোনটা রে?

পিছন দিকে তিন চারটে বাচ্চা ও'র জামা ধরে টানছিল।

স্থূলাঙ্গী মেয়েটি হেসে বললে—ওদের পাওনার জন্যে ওরা যে সব চুল-বুল করছে।

বিনো-দা বললেন, আমার সন্দেহ, ওদের চুলবুলুনির পিছনে লীডারদের ওস্কানি আছে। আমি তো পলিটিকাল লীডার ছিলাম, আমি তো জানি, র‍্যাঙ্কের হুকুম না এলে ফাইলদের অ্যাকশন শুরু হয় না। এবং আমি আরও জানি যে, ওদের দিদি-মণিরা ও মা-মণি ওদের চেয়েও লজেন্স টফি খেতে ভালবাসেন।

একেবারে হেসে ভেঙে পড়লেন স্থূলাঙ্গী, তিনি ওই ক্ষীণাঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়ে হাসছিলেন, ক্ষীণাঙ্গীও হাসছিল। বিনো-দা বললেন, একটু সামলে অণিমাদি, বেচারী কমলা কাঠির মত মানুষ আপনার ভারে ও মট করে না ভেঙে যায়।

সমবেত সকলেই হেসে উঠল। এমন প্রসন্ন রসিকতায় সব যেন ঝলমল করে উঠেছে। অণিমাদি তো হেসেই খুন। ক্ষীণাঙ্গী কমলাও খিলখিল করে হাসছে। নীরাও হাসছে। কিন্তু হঠাৎ চোখ পড়ল বিধবাটি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। বিনো-দা এগিয়ে গিয়ে টফি এবং লজেন্সের ঠোঙা তার হাতে দিয়ে বললেন, নাও, দাও বণ্টন করে। কিন্তু তুমি হাসছ না কেন প্রতিমা?

—হাসছি তো!

—না! যাও ছেলেদের মা-মণির কার্য কর।

কতকগুলো হাতে নিয়ে বাকীটা ঠোঙা-সুদ্ধ তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, দিদিমণিরা আমার কাছে। এখানে উল্টো ক্রম, মানে, বড় থেকে ছোট। ফার্স্ট অণিমাদি। কাম। নাও কমলাদি। নাও শ্রীমতী নীরা—এস-এস। আচ্ছা। এইবার মাষ্টার মশাই। এবার আমি। নিজের মুখে লজেন্স পুরতে পুরতে

বললেন, দিল্লি থেকে ফেরার পথে বেনারসে নেমেছিলাম স্যার। গোপীনাথ কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে দেখাও করেছি। আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, এ প্রশ্ন কার? তোমার তো হতে পারে না। বললাম—কেন বলুন তো? বললেন, এ প্রশ্ন যারা করবে তাদের মুখের চেহারা আলাদা হয়। আর সে বয়সও নয় তোমার। বুঝুন!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। কি বললেন?

—বললেন—একটু নির্জনে চলুন, বাচ্চারা হৈ হৈ করছে।

নীরাকে টেনে নিয়ে তখন অণিমাদি আলাপ জুড়ে দিয়েছেন।

—আশ্চর্য চেহারা ভাই তোমার। দেখলেই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে, আবার ভয়ও হয়। বলেই জড়িয়ে ধরে আলাপ শুরু।

—কিন্তু ভবিষ্যতে যদি মোটা হও, তবে আর দুঃখের সীমা থাকবে না। এই লম্বা তুমি, আমার ডবল মোটা হয়ে যাবে। বলেই হাসতে শুরু করে দিলেন।

কমলাদি বললেন, নামটিও তোমার বেশ ভাই। নীরা!

নীরা এবার বললে, প্রতিমাদি কি এখানে? আপনারা দিদিমণি উনি মা-মণি কেন?

হাসি শুরু করেছিল অণিমাদি কিন্তু কমলা একটু রূঢ় স্বরেই বললেন, অণিমাদি! ওকি! সে থেমে গেল।

কমলাদি বললেন, উনি ছোট বাচ্চাদের দেখেন। তাই মা-মণি।

তারপর আবার বললেন, দেখ, আমরা ঠিক জানিনে। তবে মনে হয় জীবনে সন্তান হারিয়েছিলেন, বিনো-দাকে তো দেখলে, উনি এখানে এনে অনেক ছেলের মা করে দিয়েছেন। অবশ্য প্রতিমাদি আমাদের আগে এসেছেন। বোধ হয় উনি বিনো-দার আত্মীয়া, তা না-হয় তো আগের চেনা লোক। বিনো-দার একটু বেশী স্নেহও আছে. প্রতিমাদির দাবীও একটু বেশী। মানে আমরা যা পারি না। এই আর কি! প্রতিমাদির জীবনে দুঃখ আছে। বুঝেছ না। উনি ওইরকম।

নীরার দৃষ্টি এরই মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিল বৃদ্ধ শিক্ষক এবং শিবোর দিকে। গভীর আলোচনায় মগ্ন দুজনে। এ বিনো সেনকে সে এই কদিনের মধ্যে দেখেনি। এ এক নূতন মানুষ; গোপীনাথ কবিরাজের কথা এই কিছুদিন আগে আনন্দবাজারে পড়েছে। বিরাট মনীষী। যে মানুষ তাঁর কথা নিয়ে আলোচনা করছে সে যেন ঝড়ে বাতাসে চঞ্চলপল্লব বনস্পতি নয়, সে যেন এই মুহূর্তে একটি পাথরের বা ধাতুর তৈরী স্তম্ভের মত হয়ে গেছে। গুরু শিষ্য দুজনেই শুধু নির্বাক হয়ে ওই স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে আছেন।

হঠাৎ গোলমাল উঠল। অণিমাদি বলে উঠলেন, গেল, গেল, দুটোর একটা গেল।

নীরা ফিরে দেখলে প্রতিমার দেওয়া টফি লজেন্স নিয়ে দুটি বড় ছেলেতে প্রচণ্ড মারামারি বাধিয়েছে। প্রতিমা একটা বাখারি কুড়িয়ে নিয়ে ওদের পিটছে নির্মম ভাবে। তবু ওরা ছাড়ছে না।

—আমি এ গতর নিয়ে ছুটতে পারব না, তুমি যাও কমলা ভাই।

—আমি পারব ওই দৈত্যদের সঙ্গে? তার উপর প্রতিমাদি রাগলে যা করেন, জানো তো। ডাকো বিনো-দাকে ডাক।

নীরা বললে, আমি যাচ্ছি। সে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল। সঙ্কোচ করলে না। এবং দুই হাতে দুজনকে
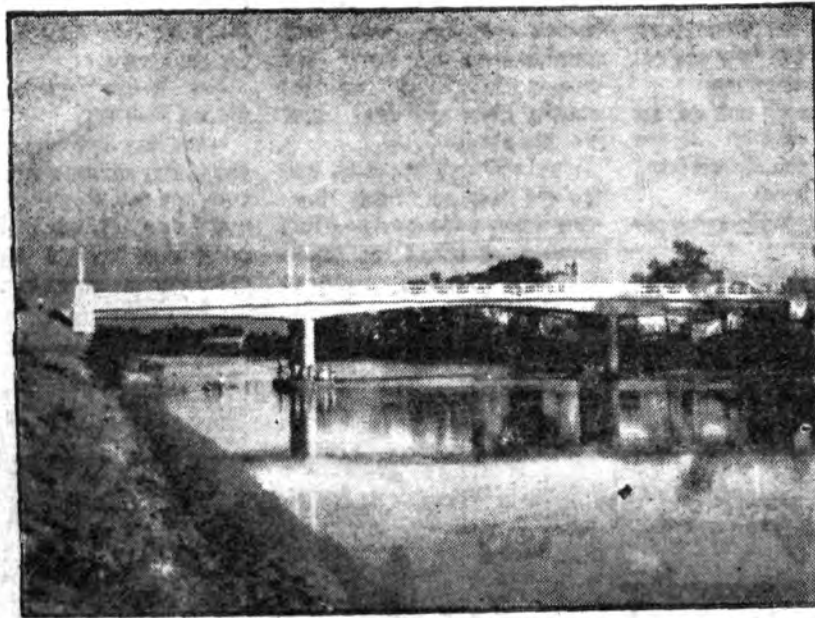
ধরে কঠিন কণ্ঠে বলল, ছাড়! ছাড়!

অপরিচিত একটি মুখ এবং সে মুখে যেন একটা কিছু ছিল যা তারা মা-মণি বা দিদিমণিদের মধ্যে দেখে নি। দেখে তারা ছেড়ে দিল; কিন্তু মুহূর্ত পরেই একটি ছেলে ক্রুদ্ধ হয়ে তার উপর লাফিয়ে পড়ল। চুলের মুঠোয় ধরে সে তাকে তুলে মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে—তোমাকে আরও নিষ্ঠুর শাস্তি দিতাম আমি, কিন্তু আজ তোমাকে ক্ষমা করলাম।

প্রতিমা সেই বিস্মিত তিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। নীরা বললে, আপনাকে আঁচড় কামড় দেয় নি তো।

—না। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েই সে ফিরল। এবং টফি লজেন্সের ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে অণিমাদি বললে—ওঁকে বলো, এ আর আমি পারছি না। লোকও এসেছে, লোকেরও অভাব হবে না। আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে। বলেই সে চলে গেল মাঠ ভেঙে ওদিকের ঘরগুলির দিকে।

অণিমাদি এবার হাসলে না—বললে, মরণ তোমার!

কমলাদি একটু হাসলে। নীরা বললে, কি ব্যাপার বলুন তো?

—ব্যাপার? মরণের ব্যাপার! আবার কি? তার ওপর তুমি এসেছ। আর রক্ষে আছে?

কমলাদি বললেন, থাকতে থাকতে সবই বুঝবে ভাই। থাক কিছু দিন।

অণিমাদি বললেন, বুঝবে আর ছাই। ওই শিবের মত লোকটাকে অতিষ্ঠ করে দিলে গা!

কমলাদি বললেন, দোষ মিছে দিচ্ছ ভাই। মন যে বড় অবুঝ!

অবুঝ মেয়েটিকে তখনও দেখা যাচ্ছিল, ওই ও প্রান্তে মাটির ঘরগুলির এলাকায় সবে ঢুকছে। মন্থর ক্লান্ত গতিতে।

নীরার আর সমবেদনার সীমা রইল না। সে বুঝেছে—ওই সুন্দরী মেয়েটি বিনো-দাকে ভালবেসেছে। বিনো-দাও তা জানেন। হয় তো বা ভালও বাসেন। তবে? তবে, কেন তাকে এ দুঃখ দিচ্ছেন? কিসের জন্য? এমন মানুষের একি আচরণ? একটু মনে লাগল তার। কিন্তু হঠাৎ এমন আচরণ করলেন কেন? হঠাৎ নিজের মনেই প্রশ্ন করলে, তাকে দেখে? সে হাসতে গেল কিন্তু পারলে না। ছি!

পরের দিন থেকে শুরু হল কর্মজীবন। 'বিনো-দাই' এসে তাকে ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি নীরা-দি, বুঝলে। ইনি তোমাদের অঙ্ক কষাবেন, ইতিহাস পড়াবেন। আর তোমাদের খেলার মাঠে তোমাদের তাড়াবেন চরাবেন খেলাবেন। কাল দুই ষণ্ডকে যা শায়েস্তা করেছেন শুনেছি আমি। দেখছ কতটা লম্বা—কেমন হাত। তিনি হাতখানা টেনে তুলে দেখালেন। আবার তেমনি সুন্দর মিষ্টি চেহারা এবং মন। তোমাদের ঝগড়া-ঝাঁটির বিচারও উনি করবেন। তোমাদের মা-মণিকে তোমরা বড্ড বিরক্ত কর। উনি শান্তশিষ্ট মানুষ; এই সব দুর্দান্তপনা সইতে পারেন না। ওঁর প্রমোশন হল, উনি আপীল শুনবেন আর ওই ছোট বাচ্চাদের দেখবেন, মানে মোটামুটি সবই দেখবেন। আপিসে বসে থাকবেন। বুঝেছ?

প্রতিমা বিনো-দার সঙ্গেই এসে ঢুকেছিলেন ক্লাসে। প্রসন্ন মুখেই এসেছিলেন। কাজ তার ভারী ভাল লাগল। সারাটা দিন আনন্দের মধ্যে দিয়ে দিনটা যে কোনদিকে গেল সে বুঝতেই যেন পারলে না। সব সময় ক্লাস ঘরে নয়; মাঠে গাছতলায়। ওরই মধ্যে একজন চাষী মাষ্টার আছেন, তিনি ছেলেদের নিয়ে মাঠে খাটেন খাটান। তখন অনেক বাদাম হয়েছে, তোলা হচ্ছে। অণিমাদি দুপুরে ঢুলতে শুরু করেন, তখন গোলমাল করলে একেবারে রেগে খুন হন। দুহাতে পেটেন। কমলাদি বিকেলের দিকে মাড় হয়ে যান, দুর্বল মানুষ। নীরার ডিউটি আছে খেলার মাঠে, তাই এক ঘণ্টা আগে ছুটি। আপিস-ঘরে বইটইগুলি রাখতে এসে প্রতিমাদির সঙ্গে আলাপও হল। স্বল্পভাষী মেয়েটি। দেহে মনে খুব সবল নন বরং দুর্বল, তার উপর সারা-অন্তর-জোড়া দুঃখ। বললেন, তোমার কথা সব শুনলাম ওঁর কাছে। মানে তোমাদের বিনো-দার কাছে। ওঃ খুব শক্ত মেয়ে, বাহাদুর মেয়ে তুমি।

নীরা বললে, জলে ফেলে দিলে সবাই সাঁতার শিখে যায়। ভগবানই বলুন আর অদৃষ্টই বলুন আমাকে যে জলে ফেলে দিয়েছিল। কি করব, হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে কূল পেয়ে গেলাম।

প্রতিমাদি ঘাড় নাড়লেন—না। কি বোঝাতে চাইলেন তিনিই জানেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, শিবনাথ দাদুর বাড়িতে ক'বার ও'র সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?

—এই তো এবারই। একদিন।

—সে কি? কবারই তো উনি গেছেন কলকাতা! দিল্লির পথে।

—তা জানিনে। আমি তো দেড় বছরের মধ্যে দেখিনি।

—ও হ্যাঁ। উনি যে এ-কবার আসানসোলে উঠেছেন, আসানসোলে নেমেছেন। তারপর হঠাৎ উঠে এসে তার হাত ধরে বললেন, তোমার সঙ্গে কাল আমার কথা বলা হয়নি। ছেলে দুটো এমন করলে! একটু হাসলেন, হেসে বললেন, কিছু মনে করনি তো?

—না—না। সত্যিই আপনার যা নরমস্বভাব আর ডেলিকেট শরীর তাতে ও সামলানো সম্ভবপর হত না। বোধহয় ফেলে দিত আপনাকে। তবে, বড় সুন্দর আপনি—ওদের তাতেই বশ মানা উচিত।

মুখ ফিরিয়ে তাকালেন খোলা দরজার দিকে—তারপর বললেন, রূপ! তিক্ত হাসি ফুটে উঠল মুখে। নাঃ! সেই দুর্বোধ্য —না!

খেলার মাঠে সে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। শুধু দাঁড়াল না, যে যখন পড়ল তাকে গিয়ে তুললে। ধুলো ঝেড়ে বললে, যাও যাও, ফের যাও।

বিনো সেন একটা চুরুট মুখে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। খেলার শেষে বললেন, ওয়াণ্ডারফুল। কনগ্র্যাচুলেশনস।

সন্ধেবেলা অণিমাদি স্থূলকায় দেহ নিয়ে কাত হয়ে শুয়ে বললেন, কেমন লাগল?

—খুব ভাল।

কমলাদি একটা ওখানকার তৈরী ডেক চেয়ারে শুয়ে কপাল টিপছিলেন—হেসে বললেন; স্বাস্থ্য ভাল ভাই। ভাল লাগল। বাপ, খেলার মাঠে যা মূর্তি তোমার!

নীরা বললে, আজ কিন্তু প্রতিমাদিকে ভাল লাগল। আলাপ হল। বেশ মানুষ!

অণিমাদি বললেন, কাল যে লেকচারিফায়িং হয়েছে। দেড় ঘণ্টা!

—মানে বিনো-দা?

—হ্যাঁ গো। রোজ একটি করে লেকচার। অবশ্য এই এলেন বলে। সকলের ঘরে এসে খোঁজ করবেন, হাসবেন, হাসাবেন। লোকটা সাক্ষাৎ শিব, বুঝেছ! তারপর ওঁর ঘরে গিয়ে কোনদিন আধঘণ্টা কোনদিন এক ঘণ্টা। অবিশ্যি, পড়ান—ধর্মশাস্ত্র গীতা জাতক। কিন্তু কে শোনে? ওই ছাই চাপা দিয়ে যান, ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উড়িয়ে দেয়। কিছুতেই বুঝবে না বিনো সেনের মত মানুষ কাউকে ভালবাসে না, বাসতে পারে না!

নীরা বললে, কেন বলুন তো? উনি কি এমন, যে কাউকে ভালবাসেন না, বাসতে পারেন না?

কমলাদি বললেন, না। ঠিক তা নয়। উঁনি যে মানুষ তাতে বিয়ে আর করতে পারেন না। ভালো উঁনি প্রতিমাকে বাসেন, কিন্তু ও'র ভালবাসা প্লেটোনিক। আর প্রতিমাদি তার ধার ধারেন না।

—কমলাদি! অণিমাদি! বাইরে থেকে সেই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল। বিনো সেন।

ধড়মড় করে উঠে বসলেন অণিমাদি। —আসুন!

—এসেছি। আরে বাপরে, নীরাদি সুন্ধ? ত্রিমূর্তি?

অণিমাদি বললেন, হ্যাঁ। তিনকন্যে বেড়ী। এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান—এক কন্যে রাগ করে বাপের বাড়ী যান।

—তা হলে শিবঠাকুর খুঁজি আমি। কিন্তু—

—কি কিন্তু?

—নীরা কন্যে যা কন্যে—তাতে ও সতীনও নেবে না—বুড়ো শিবও নেবে না। দেখেছেন তো খেলার মাঠে? ওঃ, চুলগুলো যা উড়ছিল, একরাশ কালো চুল। ওয়াণ্ডারফুল।

নীরা বললে, ওসব বললে আমি কিন্তু খেলার মাঠের ভার নিতে পারব না।

—আচ্ছা আচ্ছা বলব না। আমি একটা পরীক্ষা করলাম। ছেলেরা তোমাকে পেরে খুশি হবে ভেবেছিলাম। তা হয়েছে। এখন চল, মাষ্টারমশায়ের কাছে—পড়বে। বসে আছেন তিনি।

অণিমাদি বললেন, প্রতিমাদির বাড়ি যাবেন না?

—সেরে এসেছি।

বৃদ্ধ হরিচরণ বাবু সর্বরিক্ত বেদনাহত মানুষ। বললেন, নেবার আর কিছু নেই মা। সব গেছে, নেব কার জন্যে? নিয়ে করব কি? সবই বাহুল্য মনে হয়। তবে যেটুকু আছে, যতক্ষণ পারি দিয়ে যাই। তুমি যখন সুবিধে হবে আসবে। পড়াতে পেলে সব ভুলে থাকি। তুমি আমায় বাঁচালে।

পড়া শেষ করে যখন ফিরল তখন প্রায় দশটা। বাইরে বিনো-দার গান শোনা যাচ্ছে; একটু এসেই দেখলে আপন বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি গান গাইছেন, 'কান্নাহাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা।' ছোট একটি চিমনী জ্বলছে টেবিলের উপর। একখানা বইও নামানো। তিনি রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে গাইছেন। তিনি তার পায়ের শব্দে তাকালেন বোধহয়। একটা মাটির খোলা তার পায়ের স্লিপারের চাপে মড়মড় শব্দে ভেঙে গেল। —কে? নীরা?

—হ্যাঁ।

—পড়া শেষ করে ফিরছ বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আলো নেই কেন? এখানে সাপ আছে।

—এইটুকু তো পথ।

—না। দাঁড়াও। একটু আগে একটা বড় সাপ বেরিয়েছিল মাঠে। টর্চটা নিয়ে পথে নামলেন। চলতে চলতে প্রশ্ন করলেন, কেমন পড়লে?

—খুব ভাল।

—হ্যাঁ খুব ভাল পড়ান উঁনি। জান, সংসারে উজাড় করে দিতে চেয়েও সবাই তা পারে না। সেইটেই মানুষের বোধ হয় সব থেকে বড় ট্রাজেডি। যারা পারে, তারাই মহত্তম মানুষ। উঁনি তাই। পড় ও'র কাছে ভাল করে।

তারপর হঠাৎ বললেন, দেখ, প্রতিমাকে একটু সহ্য করে চলো। করুণা করো। ও বড় দুঃখী। ও—। মানে কথাটা তোমাকে বলাই উচিত, ও ঠিক তোমাকে পছন্দ করেনি। প্রশ্ন করো না। যাও।

ঘরে এসে বসে পড়ে খানিকটা স্তব্ধ হয়েছিল সে। ভুরু দুটি কুঁচকে উঠেছিল। —কেন? পছন্দ করেননি? তিনি কি ভাবেন—সে বিনো-দাকে ভালবাসে? না। সে দাঁড়িয়ে পড়তে এসেছে। 'জীবনে সে পথ করে নেবে।

নক্ষত্রের আলো ডাকে আঁধার সমুদ্র বক্ষে
নূতন দিগন্তে যারা তরণী ভাসালো।

বিনো সেন তখনও গাইছেন—এই কি তোমার খুশি—আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা!

তিন বছর পর ১৯৫৪ সালে বি এ পরীক্ষা দিয়ে সে ডিস্টিংশনের সঙ্গে পাস করলে। খবর পাঠিয়েছিলেন দাদু। টেলিগ্রাম করেছিলেন। বিনো-দা টেলিগ্রাম হাতে এসে বলেছিলেন, টেলিগিরাপ দিদি-মণি—বকশিস। সেলাম করে দাঁড়িয়েছিলেন।

বুঝতে পেরেছিল সে। ঢিপ করে একটা প্রণাম করে সে বলেছিল, দিজিয়ে, বকশিস তো মিল গিয়া।

—নাও। শুধু পাস নয়, উইথ ডিস্টিংশন'। আজ আমি ভোজ দেব। স্কুলের ছুটি। ছুটি তোমাদের, সব ছুটি আজ। নীরা দিদিমণি খুব ভাল করে বি এ পাস করেছে। রাতে আজ লুচি মাংস মিষ্টি।

নীরা ছুটে গিয়েছিল হরিচরণবাবুকে প্রণাম করতে। হরিচরণবাবু মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বিশীর্ণ মুখে কৃষ্ণা চতুর্দশীর শেষ রাত্রির আকাশের ক্ষীণ চন্দ্রলেখার মত শীর্ণ রেখায় একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। সে বুঝলে বেদনার অন্তর্নিহিত অর্থটুকু। তিনি মধ্যে মধ্যে বলতেন, এই পৌত্র দুটির বড় ভাই অর্থাৎ বড় পৌত্রের কথা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছেলে ছিল। সে থাকলে সেও এবার বি এ দিত।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়তে চাইছিল, সেটাকে চেপেই সে বেরিয়ে এল। তারও মনে পড়ছে মাকে। বেরিয়ে এসে সে ফিরেই যাচ্ছিল ইস্কুলে। ওই ডাকাতদের সঙ্গে খানিকটা হৈ চৈ করতে হবে। ওরা তাকে বড় ভালবাসে। ও সেই একদিনই সেই ছেলে দুটোকে মেরেছিল। তারপর আর মারেনি। সে তো জানে এই সকল আপনজন-হারা ছেলেগুলির জীবনের কি ক্ষোভ: কি অবিশ্বাস! মূল আছে তাই ফুল ফোটে। পরগাছা অর্কিডেও ফুল ফোটে, তাতে আর একটি গাছকে জীবনের সকল রস দিয়ে পরিপুষ্ট করতে: বুকে ক্ষত করে রক্ত দিয়ে লালন করার মত।

তাই সে দিতে চায়। প্রত্যেক ক্ষোভের ক্ষেত্রে, নিজের বাল্যকালের কথা স্মরণ করে, মিলিয়ে দেখে বিচার করে সে। আজ সে তার বাল্যকালের অন্যায়কেও সে দেখতে পায়। আজ সে ওদের সঙ্গে হাসবে খেলবে গান করবে।

> আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—
> হায়, বুঝি তার খবর পেলে না।

ছেলেদের নিয়ে সে গানটা রপ্ত করছে। শোনায় এবং বলে সমাজকে, সংসারকে। আজ সে নিজে বলবে। সবাইকে বলবে। জীবনে কিছু কিছু সঞ্চিত সুধা-নির্ঝরের যেন স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। আপন মনেই সে আবৃত্তি করতে করতে চলেছিল আনন্দচঞ্চল পদক্ষেপে—

> আমি ঢালিব করুণা ধারা,
> আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,

আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—
প্রাণ হয়ে আছে ভোর॥

হঠাৎ সব ছন্দ তাল কেটে গেল। কাকে যেন স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসছে? সঙ্গে বিনো-দা। পিছনে দাঁড়িয়ে অণিমাদি আর কমলাদি!

কে আবার? বুঝতে বাকী রইল না। প্রতিমাদি। নইলে প্রতিমাদি কই? এই দিকেই আসছে যে। এইদিকেই তো তাদের কোয়ার্টার। এর মধ্যে তাদের কোয়ার্টারগুলি নূতন হয়েছে।

পথে দেখা হল। প্রতিমাদিই বটেন। বিনো-দা একটু হেসে বললেন, প্রতিমা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তুমি যাও—আপিসে। কাগজপত্র দেখে সামলে রাখো। এরপর তো গোটা ইস্কুলের ভার পড়বে তোমার উপর। স্ট্রেচারের মধ্যে প্রতিমাদি প্রায় মরার মত নিথর হয়ে পড়ে আছেন।

অণিমাদি কমলাদি'র সঙ্গে দেখা হতেই তাঁরা বললেন, মা। কি কাণ্ড!

—কি হ'ল বল তো?

—কি আবার? ঝগড়া করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল। তোকে নিয়ে ঝগড়া।

—মানে?

—ন্যেকী তুই।

কমলাদি বললেন, আপিসে এস। এখানে—ছেলেদের সামনে নয়।

আপিসে সে শুনলে—কমলাদি আর অণিমাদি ক্লাসেই ছিলেন, ছুটি পেয়ে ছেলেরা নাচছিল। হঠাৎ চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে দেখল অফিস-রুমের দরজা বন্ধ। প্রতিমা প্রায় আর্তনাদ করছে, কই আমার জন্যে তো কর নি। আমিও তো পড়তে পারতাম। পাস করতে পারতাম। দুবার ফেল করেছি বলে—তুমি—। বিনো-দা বলছিলেন, তার আগেও তুমি কলকাতায় একবার ম্যাট্রিক দিয়ে ফেল করেছিলে। এখানে দুবার ফেলের পর আমি বুঝেছিলাম, তুমি পড় না। পড়তে চাও না। আমি নিজে তোমাকে পড়িয়েছি। তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত। তুমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তুমি কখনও আকাশের দিকে তাকাতে পারলে না। তোমার আমার সম্পর্ক—তাও—তুমি—

অণিমাদি বললেন—এই না ভাই, সে কি চিৎকার। ওই—ওই—ওই সব বিষিয়ে দিলে—টানছে—। বাস উনি গম্ভীর গলায় বললেন, প্রতিমা। তারপর ধড়াস্। পতন ও মূর্ছা।

কমলাদি হাসলেন একটু। সেও একটু স্তব্ধ থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, প্রতিমাদি আমায় টানেন কেন?

—উনি জানেন, বিনো-দা তোমার প্রেমে পড়েছেন!

—অণিমাদি!

—তোর ধমকে আমি ভয় পাইনে। আমি পুরুষ মানুষ হলে আমিই তোর প্রেমে পড়তাম। তোর পিছু পিছু ঘুরতাম।

—আমি ছেলে বয়সে একজনকে এক চড় মেরেছিলাম।

—সেটা হাঁদা। আমি এক গালে চড় খেলে আর একগাল পেতে দিতাম। চড় মার, ঝাঁটা মার—দেহি পদপল্লবমুদারম।

এবার সে না হেসে পারে নি। কিছুক্ষণ পর সে বিনো-দার কাছে গিয়েছিল।—বন্ধ করুন খাওয়া দাওয়া। প্রতিমাদির অসুখ। উনি বলেছিলেন না। সেরে যাবে অসুখ সন্ধ্যার মধ্যে। তাঁর সে মুখ দেখে প্রতিবাদের সাহস হয়নি। বাড়ি ফিরে এসে সে বসে ভেবেছিল, কিছু কি সত্যই করেছে সে আপন অজ্ঞাতসারে? না। দিনের পর দিন, সেই সকালে উঠে ছেলেদের খবর নেওয়া, কে কেমন আছে। তারপর ইস্কুল। বিকেলে খেলা দেখা। সন্ধ্যায় একবার করে বিনো-দা সবার কাছে আসেন, তার কাছেও আসেন। খবর নিয়ে যান। তারপর সে যায় হরিচরণবাবুর কাছে পড়তে। কোন কোন দিন অবশ্য বিনো-দা সঙ্গে যান। রাত্রে ফেরার সময় তিনি বারান্দায় কোনদিন গান করেন, কোনদিন ছবি আঁকেন, হেজাক বাতি জেলে—তাকে দেখলেই নেমে সঙ্গে তার বাড়ির দোর অবধি আসেন, এই পর্যন্ত। কই কখনও তো এমন কোন কথা বলেন নি যার মধ্যে এতটুকু অনুরাগের কথা আছে। শুধু একটা কথা, তুমি ওয়াণ্ডারফুল। আশ্চর্য মেয়ে! মধ্যে মধ্যে ছেলেদের নিয়ে পিকনিক হয়েছে, তাতে হৈচৈ হয়েছে, হুল্লোড় সবাই করেছে, বিনো-দা সব থেকে বেশী। একদিন ছেলেদের সঙ্গে রেস দিয়েছিলেন, তাতে তিনি তাকেও টেনেছিলেন। হাঁ সে যোগ দিয়েছিল। অণিমাদি মোটা, কমলাদি রোগা, প্রতিমাদি মাটির পুতুল। তার শক্তি আছে উৎসাহ আছে—সে রেস দিয়েছিল। বিনো-দা জিতেছিলেন, সে সেকেণ্ড হয়েছিল, ছেলেরা দম রাখতে পারে নি। তার মধ্যে প্রেম কোথায়? মধ্যে মধ্যে বিনো-দা মিটিং করেছেন সমাজ-সংস্কার নিয়ে, মুগ্ধ হয়ে সে শুনেছে। নিশ্চয় চোখে মুখে ফুটে উঠেছে সে মুগ্ধতার ছায়া। তাই বা প্রেম হবে কেন?

সে এমনই ক্ষুব্ধ হয়েছিল—যে সে হঠাৎ উঠে কোন বিবেচনা না-করেই গিয়েছিল প্রতিমার কোয়ার্টারে। কেন—কেন তিনি এমন সন্দেহ করবেন!

তিনি বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। দেখে তার মায়া হয়েছিল। হায়রে অবুঝ মন! সেইদিন টেবিলের উপর পড়েছিল বিনো-দার ওই ছোট চিঠিখানা।

সে নিজেকে সম্বরণ করতে পারে নি। চিঠি-খানা তুলে নিয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই মুখ তুলেছিল প্রতিমা। এবং সংগে সংগেই মুখ গংজে পড়ে বলেছিল, তুমি যাও। তুমি যাও। আমাকে কি মরতেও দেবে না শান্তিতে? কাঁদতেও দেবে না?

সে বলেছিল, আমি আসতাম না প্রতিমা দি। কিন্তু আপনি যে আমাকে বিশ্রীভাবে জড়িয়ে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন। কেন আপনি এ রকম ভাবেন?

—ও তোমাকে ভালবাসে না?

—না। আমি অন্তত মনে করি না। স্নেহ করেন। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তার মধ্যে আপনি যা ভাবেন তার লেশমাত্র নেই।

—লেশমাত্র নেই! ব্যঙ্গ ভরে সে বলেছিল। চোখ বুজে ভেবে দেখ!

তারপরই কেঁদে উঠেছিল হু হু করে। সে চলে এসেছিল নিরুপায় হয়ে। একে সে কি বলবে? ঘৃণা হয়েছিল, করুণাও হয়েছিল। বাসায় এসে খেয়াল হয়েছিল চিঠিখানা তার মুঠোর মধ্যেই রয়ে গেছে। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে সে ভাবতে বসেছিল, বিনো-দা'র প্রতি তার কি—? বিনো-দা'র কথা বিনো-দা জানেন। না, সে ও জানে, ও মানুষ ভাল কাউকে বাসে না! জগৎ ওদের কাছে তুচ্ছ, ক্ষুদ্র। হায় প্রতিমাদি, তুমি যদি জানতে যে এ মানুষের কাছে নীরারও দাম নেই। আর সে? না। সে কোনদিন মনে ঠাঁই দেয় নি। কোনদিন না। এই মুহূর্তে চোখ বুজলে হয় তো তার মুখ দেখবে সে তোমার কথার সূত্র ধরে কিন্তু তা বলে তাই সত্য নয়। সে মনে করে দেখছে। ভাল করে খতিয়ে দেখছে। হিসেব সে তোমাকে দেবে।

হঠাৎ সে চাবুক খেয়ে চমকে উঠল যেন। মনকে সন্ধান করে দেখতে গিয়ে দেখলে, বিনো-দা। বিনো-দা। বিনো সেন। হ্যাঁ। এ হয় তো প্রকাশ সে করে নি, তার কর্মে তার বাক্যে, কিন্তু কত নিদ্রাহীন রাত্রে তন্দ্রার মধ্যে বিশেষ করে জীবনের পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় যত উদাস-করা দিবারাত্রি গেছে, তার মধ্যে তো ওই একটা লোকই ভেসেছে চোখের উপর।

ঠিক এই সময় পড়ল কিচেন ঘণ্টা।

—নীরি। নীরি। আঃ যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। তোর পাসের ভোজ, তুই কি করছিস? ঘরে ঢুকেছিল অণিমাদি—বলি ধ্যান করছিস কার?

—কারও নয় চল। জীবনটা খতাচ্ছিলাম। মাথা ধরে গেছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে সে আবার এসে ভাবতে বসেছিল। ঘরে গরম বোধ হচ্ছিল। বাইরের বারান্দায় ডেক-চেয়ার টেনে আকাশের দিকে চেয়ে বসে ছিল। ভাবতে ভাবতে সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘ ছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। তারই মধ্যে মনটা শূন্য হয়ে যাচ্ছিল যেন। কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ একটা চড়া বিদ্যুতের আলোয় ঘুম ভেঙে গেল। তারপরই কড় কড় শব্দে মেঘের ডাক। চমকে উঠেছিল সে। কাপড়চোপড় শরীর সব ভিজে ভিজে হয়ে গেছে বৃষ্টির ছাটে। বৃষ্টি নেমেছে তখন। ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল। আঃ বিনো সেনের মুখ। দেওয়ালে ফটোটা টাঙানো রয়েছে। টেবিলে বাতিটা জ্বলছে। কিন্তু উঠতে যে সে আর পারছে না। সে পাশ ফিরে শুয়েছিল।

পরের দিন সে যখন উঠল তখন শরীরটা

জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা, দেহে যন্ত্রণা। শরীর মন সব যেন ঝিম ঝিম করছে। কি হল তার? ডাকলে—অণিমাদি।

পাশের ঘরেই থাকে অণিমাদি। সাড়া দিলেন—কি?

—এস না ভাই একবার। দেখ না আমার কি হল? বড্ড খারাপ করছে শরীর।

—এযে বেশ জ্বর রে। কপালে হাত দিয়ে বলেছিলেন অণিমাদি।

সেই জ্বর বত্রিশ দিন। সুস্থ যখন হল তখন চল্লিশ দিন। সে দিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। এ কালের চিকিৎসা—উপবাসের চিকিৎসা নয়। কঙ্কালসার হয় নি, তবে রোগা হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকেছিল অণিমাদি। —কি দেখছিস? কত সুন্দর হয়েছিস?

—সুন্দর হয়েছি? তোমার কি ,সব তাতেই ঠাট্টা?

—উঁহু। বিনো-দা বলেছে। তোর ছবি তুলে নিয়ে গেছে।

—মানে?

—বত্রিশ দিনে তোর জ্বর ছাড়ল। তুই অঘোরে ঘুমুচ্ছিস, কাত হয়ে শুয়ে আছিস, মুখটা একটু পিছনের দিকে হেলে গেছে। হাত দুখানা প্রায় জোড়হাতের মত; চুলের তো পাঁজা, সে খোলা, মাথার উপর দিকে ছড়িয়ে আছে। বিনো-দা কলকাতা গিয়েছিলেন ফিরে এসেই বরাবর এলেন তোকে দেখতে। আমি পাশে বসে বললাম, সকাল বেলা জ্বর ছেড়ে গেছে। উনি একদৃষ্টে তোকে দেখছিলেন, আমাকে বললেন, জানালাগুলো খুলে দিন তো। বললাম, রোদ্দুর আসবে। বললেন, সে তো পরে বন্ধ করলেই হবে। বলে নিজেই জানালা খুলে দিয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, এখানে আসুন। এইবার দেখুন। বললাম, কি দেখব?—নীরাকে কি সুন্দর লাগছে! ওয়াণ্ডারফুল। শুয়ে আছে দেখুন! ঠিক যেন সতী সদ্য দেহ-ত্যাগ করেছেন। ওয়াণ্ডারফুল। বলেই গলায় ঝোলানো ক্যামেরা তুলে ক্লিক ক্লিক করে দিলেন। তারপরই আবার ওদিকে সেই কাণ্ড! দেখবি বোধ হয় সতীর দেহত্যাগ ছবি হবে।

কোথায় যেন লেগেছিল। সারা চিত্তটা বিমুখ হয়ে উঠেছিল। শক্তি থাকলে সে তখনই যেত। কিন্তু যেতে পারে নি। বিকেল বেলা বিনো-দা এলে বলেছিল, ওভাবে আমার ফটো নিয়ে ছবি আঁকবেন কেন?

বিনো-দা বলেছিলেন, সেটা দুর্লভ মুহূর্ত, ছবিটা নিয়ে রেখেছিলাম। আঁকলে তোমার অনুমতি না নিয়ে আঁকতাম না। ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু পারলাম না। মনে হল তোমাকে যেন মেরে ফেলছি। অন্তত মৃত্যু কামনা করছি।

বড় ভাল লেগেছিল কথাটা। সব উত্তাপ জুড়িয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে নীরা গাঢ় কণ্ঠে বলেছিল, আমি এবার চলে যেতে চাই বিনো-দা! আমি এখানে—

—হ্যাঁ। শান্তি পাচ্ছ না। সহ্য করে থাকতে পার না?

—না।

হাসলেন বিনো-দা। তারপর বললেন, জোরই বা কোথায় আমার? যাবে। তবে সে ব্যবস্থা আমিই করব, অন্তত সেটুকু ভার আমাকে দিয়ো। একখানা দরখাস্ত লিখে টাইপ করিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সই করে দিয়ো। একটা বিদেশী স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে শিক্ষা সম্পর্কে পড়াশুনো করে এস। তোমার আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যত চাই।

সে উঠে তাঁকে প্রণাম করেছিল। তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে পায়ের তলায় বসিয়ে তার চুলের রাশির খানিকটা মুঠোয় পুরে বলেছিলেন, শোন—একটা কথা বলব।

—বলুন।

—বিচলিত হবে না যেন।

বুক তার ঢিপ ঢিপ করে উঠেছিল। নীরবে প্রতীক্ষা করেছিল সে।

—দাদু নেই।

—অ্যাঁ!

—না। না। চঞ্চল হতে নেই। কাঁদতে নেই তাঁর জন্যে। তিনি বারণ করে গেছেন সকলকে।

উঠে গেলেন। যাবার সময় হেসে বলে গেলেন, আমার মৃত্যুতেও কেঁদো না। যেখানেই থাক। আমিও তাই বলে যাব সকলকে।

কি নিষ্ঠুর মানুষ! সে কাঁদে নি। আকাশ পানে চেয়ে বসেছিল।

*

তারপর এ ক'টা মাস সে সেই দরখাস্তের উত্তরের অপেক্ষা করেই রয়েছে এখানে। এর মধ্যে প্রতিমার মনের অসুখ দেহকে চেপে ধরেছে। সে বড় ক্লান্ত বড় ক্লিষ্ট। বিনো-দা তাকে বিশ্রাম দিয়েছেন। বিশ্রাম করো। প্রতিমা ঘুরে বেড়ায় উদভ্রান্তের মত। মায়া হয়।

হঠাৎ আজ—বিনো সেনের জন্মদিন। জন্মদিন প্রতিবারই প্রতিপালিত হয়। উদ্যোগ করেন অণিমাদি। এবার সে ভার নিয়েছিল। সে চলে যাবে, আসছে জন্মদিনে থাকবে না। তাই তার মনের মত করে সব করেছিল। নিজে মালা গেঁথেছিল; নিজে অভিনন্দন রচনা করেছিল। লিখেছিল, 'তোমার জীবনকেন্দ্রে আছে একটি অমৃত-বিন্দু—সে বিন্দু আজ সিন্ধুর মত করুণা-তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত। তোমার জন্মমুহূর্তে জন্মভূমি তোমার ললাটে পরিয়ে দিয়েছিলেন বৈরাগ্যের তিলক, তুমি জন্ম-বৈরাগী। কোন বন্ধনে তুমি বাঁধা পড় না, অথচ সকলকে তুমি বাঁধো এক অচ্ছেদ্য গভীর বন্ধনে। মন তোমার রামধনুর সপ্তবর্ণের ভাণ্ডার; তোমার তুলিতে তুমি সৃষ্টি কর অপরূপের। রূপ তোমার পায়ে এসে নিজেকে অঞ্জলি দেয়।'

কথাটা সে প্রতিমাকে স্মরণ করেই লিখেছিল। কিন্তু বিনো সেন—। বিনো সেন তখন

ভ্রষ্ট হয়েছেন, কামনা জেগেছে। তিনি ভাবলেন, নীরা বুঝি নিজের কথাই লিখেছে। বিনো সেন যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠে গেলেন সভার শেষে। ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বললেন, আমায় যেন কেউ না ডাকে! সারাটা দিনের পর সন্ধ্যায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন নীরার বারান্দায়।

—নীরা!

—আসুন। আপনি এমন করে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ভাবলাম শরীর খারাপ। আবার ভাবলাম, হয় তো অন্যায় কিছু লিখেছি। বলেছি।

বিনো সেন বিচিত্র দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে বলেছিলেন—না।

তবে?

এটা ধর আগে। তোমাকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে, তোমার সেই স্কলারশিপের জন্য। একখানা খাম এগিয়ে দিলেন। সে কি বলবে ভেবে পেলে না। কিন্তু একটা বেদনা যেন সে অনুভব করলে। চলে যাবে সে এখান থেকে।

—তারপর—। চুপ করে গেলেন বিনো সেন।

—বলুন।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, এই চিঠিখানা—

—কার চিঠি?

—পড়ে দেখো। ধর। বলেই তিনি উঠে পড়লেন।—প্রতিমা আজ একটু বেশী অসুস্থ, আমি যাই দেখে আসি।

চিঠি হাতে করেই নীরা তাঁর দিকে তাকালে—প্রতিমা! প্রতিমা! প্রতিমা! চাঁদে কি কলঙ্ক থাকেই!

"নীরা

বহু দ্বন্দ্ব করে শেষে নিজেকে নিঃসংশয়ে যাচাই করে তোমাকে পত্রখানা লিখছি। আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে তুমি বললে, 'তোমার জন্মমুহূর্তে জন্মভূমি তোমার ললাটে পরিয়ে দিয়েছিল বৈরাগ্যের তিলক, তুমি জন্ম-বৈরাগী! কোন বন্ধনে তুমি বাঁধা পড় না অথচ সকলকে বাঁধো অচ্ছেদ্য গভীর বন্ধনে।' বুকটা আমার হাহাকারে ভরে উঠল। এ হাহাকার চিরদিন আছে নীরা। ইদানীং অনুভব করছি আমার কেউ নেই। কেউ আমার নয়। আপনার, একান্ত আপনার কাউকে যে আমি চাই। আমার আত্মা ব্যাকুল। তোমাকে আমি চেয়েছি। অনেকদিন থেকে চেয়েছি। কিন্তু—আজ যখন চিঠি এল, বিদেশে যাবে তুমি, সব সম্পর্ক কেটে যাবে, তখন আর যে আমার নিবেদন না-জানালে নয়। আমার আত্মা শতবাহু বিস্তার করে তোমাকে চায় তার বাহুবেষ্টনের মধ্যে, হৃদয়ে চায় মনে চায়। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

তোমাকে আমি বিবাহ করতে চাই। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস। প্রতিমা কোন বাধা নয়—।"

আর নীরা পড়েনি। চিঠিখানা হাতে করে একেবারে যেন জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে গেল।—লম্পট। ভ্রষ্ট! প্রতিমার জীবনটা নষ্ট করে আবার—।

দুই হাতে দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে সে দাঁড়াল বিনো সেনের সামনে।

পর মুহূর্তে শোনা গেল, বিনো সেন যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, আমি ক্ষমা চাচ্ছি, আমার অন্যায় হয়েছে। আমাকে ক্ষমা কর।

—না—না—না। চিৎকার করে উঠল নীরা—আপনি লম্পট আপনি ভ্রষ্ট, আপনি মুখোসধারী।

রাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে সে চিৎকার ছড়াচ্ছিল। গোটা আশ্রমটা চকিত হয়ে উঠল। কি হল।

বিনো সেন আর্তনাদ করছেন, আমাকে ক্ষমা কর। আমি হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাচ্ছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

—ক্ষমা! ওই প্রতিমা—। এই চিঠি!

স্তব্ধ হয়ে গেলেন বিনয় সেন। অপমানে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিয়ে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তুমি ভণ্ড তুমি লম্পট। নীরা যুদ্ধ করে অনেক জয় করে এসেছে। এখানেও সে হারবে না। সে জিতবে।

বিনয় সেন বললেন—নাটক শেষ হয়ে গেছে। যাও সব যে যার চলে যাও।

নাটক শেষ হয়ে গেছে? না।

চলে যাচ্ছে নীরা আশ্রম থেকে। ডাকছে তাকে বৃহত্তর পৃথিবী। নামকে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা।

॥ সাত ॥

ঠিক দু বছর পর। ১৯৫৮ সাল। দমদম এরোড্রোমে এসে নামল—নামল একখানা বড় প্লেন। প্লেন থেকে নামল নীরা। দু বছর পর ইংলণ্ডে পড়া শেষ করে সে ফিরছে। লীডস্ ইউনিভারসিটিতে শিশু শিক্ষার জন্যই সরকারী বৃত্তি সে পেয়েছিল, তাই শেষ করে ফিরছে। রোগা হয়ে গেছে সে। রঙটা খানিকটা উজ্জ্বল হয়েছে, কিন্তু একটা ক্লান্তি যেন তার সর্বাঙ্গে। সেই আয়ত দীপ্ত চোখ দুটিতে যেন একটা কিছুর ছায়া নেমেছে। বর্ষার আকাশে দিগন্তে জলভারাবনত কালো মেঘ উঠলে, আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য থাকতেও যেমন একটা ছায়া নামে তেমনি একটি ছায়া। সেদিন যাত্রা করেছিল—মনে পড়ছে সেদিন বলেছিল, ফিরে এলে নাটকের যবনিকা ওঠে যেন। দূরে বিদেশে যেন জীবন নাটক না হয়ে ওঠে। ভারাক্রান্ত মন নিয়েই গিয়েছিল। প্রথমটা মন বিদ্রোহ করেছিল। না, বিনো সেনের ক'রে দেওয়া বৃত্তি নিয়ে সে যাবে না। সে জানত এর পিছনে বিনো সেনের সুপারিশ আছে। নইলে দরখাস্ত করলেই বৃত্তি হয় না। কিন্তু শেষটা সে প্রশ্ন ক'রেছিল—দেশ কি বিনো সেনের? সে হকদার নয়? পরীক্ষা তো একটা দিতে হবে। তাতে সে উত্তীর্ণ হলে কেন নেবে না? পরীক্ষায় পাস ক'রে সে গর্ববিনীর মতই নিয়েছিল বৃত্তি। টাকা তার এ কয়েক বছরে কিছু জমেছিল। তা ছাড়াও আর একটা সুবিধে হয়েছিল একেবারে আকস্মিকভাবে। ভাগ্য ছাড়া তার আর সংজ্ঞা হয় না। পাসপোর্ট আপিসে মুখোমুখি দেখা হয়েছিল এণাক্ষীর সঙ্গে। সে চমকে উঠে বলেছিল, নীরা!

—হ্যাঁ। তোমাদের সব ভাল?

—আমার ভাল। আর যাদের কথা বলছ তাদের কথা ঠিক জানিনে। মানে তোমার অজিতদা'র সঙ্গে ডাইভোর্স হয়ে গেছে আমার। ওঃ তুমি সেদিন যা বেরিয়ে এসেছিলে! বাপরে বাপ! তা এখানে? যাবে নাকি কোথাও?

—হ্যাঁ। ইংল্যাণ্ড যাচ্ছি। গবর্ণমেণ্ট স্কলারশিপ পেয়েছি।

—স্কলারশিপ! খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, ওঃ দেখালে খুব। আমি যাচ্ছি ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে। ইংল্যাণ্ডও যাব। ঠিকানা দিও। হ্যাঁ একটা সংবাদ দিই তোমাকে। বিদেশে যাচ্ছ সুবিধে হবে। অজিতের প্রায় সব গেছে। বাড়ি বিক্রির কথা চলছে। কিন্তু তোমার অংশ তো তোমার সই ছাড়া বিক্রি হবে না। কেউ নিচ্ছে না। তুমি গেলেই টাকাটা পেয়ে যাবে। যাবামাত্র। তোমার খোঁজ করছে। শেষ কথা হয়েছে, না পেলে তোমার অংশের টাকা কেটে রেখে দেবে।

টাকাটা সে পেয়েছিল। টাকাটা কম নয়, আট হাজার টাকা। ইচ্ছে ছিল পড়া শেষ করে ইউরোপ ঘুরবে। কিন্তু তা হয়নি, ভাল লাগেনি। প্রথম দিকটা তার বড় শান্তভাবে চলেছিল; ইউনিভারসিটির অধ্যাপক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দিনগুলি

স্বচ্ছন্দগামিনী নদীস্রোতের মত চলেছে! বিচিত্র দেশ, মুক্ত, স্বাধীন। জীবন যে এত মুক্ত এবং হাস্যমুখর হতে পারে, তা সে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। সেও হাসতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। মনে হয়েছিল যে হাসি, যে গতিবেগ তার জীবনে ছিল, তাও যেন স্তিমিত হয়ে গেছে। হৃদয় যেন ভারাক্রান্ত। এত দূরে গিয়ে তার মনে হয়েছিল, যে রূঢ় আচরণ সে বিনো-দা'র সঙ্গে করে এসেছে, তা ঠিক হয়নি। আরও সহজভাবে হতে পারত। সে চিঠি লিখে জবাব দিয়ে চলে আসতে পারত। একটি কথায় জবাব হ'ত, ছি, বিনো-দা! দেবতা যখন কাঙালীপনা করে তখন মানুষ কি করে বলুন তো?

না, ওটা বড় বেশী নরম হত। সে তো লিখতে পারত—। না, এ লেখা যেত না। আপনি প্রতিমাকে ভালবেসে আবার আজ আমাকে ভালবেসেছেন। আমি জীবনে কাউকে ভালবাসিনি। আমার এ অনুচ্ছিষ্ট হৃদয় কি যার হাত উচ্ছিষ্ট তার হাতে দেওয়া যায়? না। এ লিখতে সে পারত না। এতে যে স্বীকার করা হত যে সে তাকে ভালবাসত। আজও কয়েকটি বিনিদ্র রাত্রে বিনো সেন, বন্ধ ঘরের সার্সীর গায়ে যেন ভেসে ওঠে। স্বপ্নেও তাকে দেখে। হয়তো উপকারের জন্য। না। কানে যে ভেসে ওঠে "আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—" মনে পড়ত সকাতর মিনতি—"ক্ষমা কর। আমি হাত জোড় ক'রে অপরাধ স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা কর।" প্রচ্ছন্ন বেদনায় সে যেন বদলে শান্ত স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল দেশে ফিরে একবার গিয়ে বলে আসবে, ভুলে যাবেন সেদিনের কথা। কিন্তু সব আবার বদলে গেল। আবার সে জ্বলে উঠল। গিয়েছিল ইণ্ডিয়া হাউসে—ইউ-রোপের বড় শহরগুলির এনডোর্সমেণ্টের জন্য এবং ভিসার সাহায্যের জন্য। সেখানে একজন বিশিষ্ট কর্মচারী তাকে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন—স্ট্রেঞ্জ! আপনি—? শুধু তিনিই নন—আরও ক' জনও সবিস্ময়ে তাকে দেখছিল। সে বিব্রত এবং বিরক্ত হয়ে বলেছিল—আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না।

অবশেষে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছিল। ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় শিল্পীদের কিছু ছবি সদ্য এসেছে। তার মধ্যে একখানি বড় ছবি এসেছে। মহাশ্বেতা! ছবিখানি যত ভাল—তত ভাল তার বিষয়টি। অপূর্ব রোমাণ্টিক! কবি বাণভট্টের কাদম্বরীর অন্তর্গত।

সন্ধ্যার মানসপত্র, পদ্মের মধ্যে জন্ম—নাম পুণ্ডরীক—ঋষিকুমার। আর মহাশ্বেতা অপরূপা গন্ধর্ব রাজকন্যা। দুজনে দুজনকে

কল্যাণীর

আনন্দময়

– পরিবেশে –

দেখে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু মিলনের পূর্বেই বিরহ সইতে না-পেরে পুণ্ডরীকের মৃত্যু হল। মহাশ্বেতা আত্মহত্যা করতে গিয়ে দেবতার আদেশে সে অভিপ্রায় ত্যাগ করে হলেন তপস্বিনী। ওই তপস্যায় ফিরে পাবেন তাঁর দয়িতকে। পুণ্ডরীক জন্মগ্রহণ করল বৈশম্পায়ন হয়ে। এক রাজার মন্ত্রীপুত্র হয়ে। রাজার পুত্র চন্দ্রাপীড়ের সখা, ভাবী মন্ত্রী।

রাজকুমারের সঙ্গে বৈশম্পায়ন গিয়েছিলেন সৈন্যবাহিনী নিয়ে গন্ধর্ব লোকে। সেখানকার রাজকন্যা কাদম্বরীর সঙ্গে চন্দ্রপীড়ের প্রণয়ই মূল ঘটনা—কিন্তু সে অন্য কথা। সেই অরণ্যে শিলার উপর ব্রহ্মাসনে বসে মহাশ্বেতা তপস্যা করছিলেন মৃত্যুপুর থেকে দয়িতের প্রত্যাগমনের জন্যে। এলেন দয়িত। বৈশম্পায়ন অকস্মাৎ তপস্বিনীকে দেখে যেন কোন অস্পষ্ট অথচ দুর্নিবার স্মৃতির আকর্ষণ অনুভব করলেন। অনুভব করলেন সর্বদেহ দিয়ে ওই দেহ স্পর্শের উন্মাদনা তিনি অগ্রসর হলেন, তুমি আমার। তুমি আমার। তপস্বিনী মহাশ্বেতা আকস্মিকতার মধ্যে চিনতে পারলেন—ঠিক। শীর্ণ দেহ তপস্বিনী প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর আয়ত চোখে আগুন ঝলসে উঠল—ফিরে আসা হারানো দয়িত সেই বহ্নিতে ভস্ম হয়ে গেল। এ সেই ছবি। কিন্তু ছবির মহাশ্বেতা আর নীরা যেন এক। আশ্চর্য সাদৃশ্য—দেখলেই চেনা যায়। মনে হয়, যেন তাকে মহাশ্বেতার মডেল করে বসিয়ে শিল্পী এ ছবি এঁকেছে। দেখেছিল সে সে-ছবি। বিনো সেনের আঁকা। মহাশ্বেতা সে-ই। মনে পড়ল অসুখের পর পথ্যের দিন সে আয়নায় তার রোগক্লিষ্ট মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ছিল সেই সময় অণিমাদি এসে বলেছিল, বিনো সেন একদিন তার ঘুমন্ত অবস্থায় ফটো নিয়েছিল, বলেছিল, সতীর দেহত্যাগ ছবি আঁকবে। মুহূর্তে তার রাগ হয়ে গিয়েছিল। চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। এ ঠিক সেই ছবি! আর সামনে ভস্মীভূত বৈশম্পায়নের মুখে অবয়বে বিনো সেনের নিজের আদল। ক্রিমেটোরিয়ামে দাহ করা মূর্তির মত, তবু তার মধ্যে মানুষটিকে চেনা যাবার মত করে এঁকেছে বিনো সেন। দেখতে দেখতে ইণ্ডিয়া হাউসের অনেকজনের কাছে খবর পৌঁছেছিল এবং অনেকজন উঁকি মেরে দেখেছিল তাকে। সে নিজে শুধু অস্বস্তি অনুভব করে নি, মনে হয়েছিল এরা সকলে মনে করছে এ অতি নিষ্ঠুরা অতি ভাগ্যহীনা। তারপরও যতদিন গিয়েছে এরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। একদিন কাগজওয়ালারা অতর্কিতে ফটোও নিয়েছিল। মনটা তার বিষিয়ে গিয়েছিল। ছি—ছি—ছি। আপনি তো মরেন নি বিনো-দা। তবে? ছি—ছি। ক্ষোভ নিয়ে নেমেছিল সে। যাবে সে একবার! নাটক আর সে করবে না। তবে বিনো-দাকে জিজ্ঞাসা সে করবে, পুণ্ডরীক পরজন্মে বৈশম্পায়ন—তার কি প্রতিমার মত আর কোন প্রণয়িনী ছিল? এবং সে কি মহাশ্বেতার মত প্রণয়মুগ্ধ গন্ধর্ব রাজকন্যা? যাকে জীবনে পথের খোয়ায় কাঁটায় পা দুখানা ক্ষতবিক্ষত করে চলতে হয়েছে, যে জীবনের প্রেমের স্বপ্নকে রূঢ়ভাবে নিজের হাতে ভেঙে দিয়েছে, মুছে দিয়েছে। তাকে এমন ব্যঙ্গ এমন অপমান আপনি কেন করলেন। এমন অপমান যে মনা ঘোষ করে নি, সোমেশবাবুর ছেলে করে নি! ছি! ছি! ছি!

—নীরা!

কাস্টমস সেরে বেরুতেই সে শুনলে—নীরা! পরিচিত কণ্ঠস্বর। কে? বহুলোকের মধ্যে—কে?

—আমি রে—অণিমাদি!

হাঁ। অণিমাদিই তো বটে। এগিয়ে এসে একটু হেসেই বললেন—তুই ফিরলি?

—হাঁ। এই তো বেরুচ্ছি। কিন্তু অণিমাদি অনেক পালটেছেন। খুব একচোট হেসে গলা জড়িয়ে ধরে গুরুভার দেহখানি নিয়ে তার উপর ঢলে পড়লেন না।

—ভাল ছিলি? কিন্তু রোগা হয়ে গেছিস। খানিকটা পাল্টে গেছিস।

—মেম সাহেব হয়েছি?

—না। তোর ও—। না থাক। এখন উঠবি কোথায়?

—দেখি। কোন হোটেলে বা বোর্ডিংয়ে। দাদু থাকলে সেখানে যেতে পারতাম। তা—। একটু চুপ করে থেকে বললে—তা তুমি এখানে কোথায়? কেউ আসবে বুঝি? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—বিনো কেন। মুহূর্তে সে ব্যস্ত হয়ে বললে—আমি যাই।

দাঁড়া না একটু। কেউ আসছে না—আমি যাচ্ছি।

—প্লেনে? কোথায়?

—ডালহৌসি।

—ডালহৌসী? বিস্ময়ের আর সীমা রইল না নীরার।

—বিনো-দা সেখানে। চাকর আছে আর তো কেউ দেখবার নেই। অত্যন্ত কাতর। আমি দেখি তাঁকে। আমাকে জোর করে পাঠিয়েছিলেন আশ্রমের সব দলিলটলিল নিয়ে। কাল এসেছিলাম রাইটার্স বিল্ডিংয়ে দিয়ে আজ ফিরে যাচ্ছি। গবর্নমেন্টকে দিয়ে দিলেন আশ্রম। কি করবেন? আর ক'টা দিনই বা?

—অণিমাদি! আর্তস্বরে প্রায় চিৎকার করে উঠল সে। —কি বলছ তুমি?

—বিনো-দা'র টি বি হয়েছে রে।

—টি—বি? সে কি?

—হাঁ। সেই সর্বনাশী! প্রতিমা—তার রোধ হয় ছিল—প্রকাশ পেল, স্যানাটোরিয়ামে দেবার কথা হ'ল—তা হাউ হাউ করে কান্না। ওঁকে ছাড়লে না। উনিও সেবা করলেন দুহাত দিয়ে। বললে বলতেন, না করলে? বিবাহ করেছি। আমার স্ত্রী। আমাদের মনে হত যেন তোর ওপর আক্রোশ করে!

—আমার উপর আক্রোশ তো তিনি ছবি এঁকে মিটিয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর সেবা করেছেন—তাকে ভালবাসতেন—এর মধ্যে আমাকে টানা কেন? তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন

এতে অবশ্য আমি দুঃখী। বিনো-দা'র মত লোক প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। আচ্ছা আমি যাই। হাত টেনে ধরলেন অণিমাদি। —না শোন। শুনে যা লোকটার যা ক্ষতি তুই করেছিস তা শত্রুতেও করে না অথচ তুই তাকে ভালবাসতিস।

—না।

—আমি জানি। তোর অসুখের সময় আমি তোর শিয়রে থাকতাম। বিনো-দা থাকতেন বাইরে। যেদিন প্রলাপ বকেছিলি—তার মধ্যে অনেক বলেছিলি। বিনো-দা বলেছিলেন, এ কথা যেন কেউ না শোনে অণিমাদি। ওকেও বোলো না। তুই নিজেও জানিস না। তাই শুনে যা। প্রতিমা ও'র এক বন্ধুর স্ত্রী। সে বন্ধু বড়লোক মানীলোক—আজও বেঁচে আছেন। তিনি আবার বিয়ে করে প্রতিমাকে তাড়িয়ে দেন। প্রতিমা রাস্তায় দাঁড়াতে গিয়েছিল। উনি ওকে এখানে নিয়ে আসেন। প্রতিমা আক্রোশভরে বিধবা সেজেছিল। উনি আপত্তি করেন নি। ওতে অন্তত বন্ধুর মানটা বাঁচবে। কেউ এটা জানবে না। আমাকে সব বলেছেন কিন্তু বন্ধুটির নাম বলেন নি। এখানে ওকে এনে বলেছিলেন, এই বাচ্চাদের মা হয়ে দুঃখ ভোল। কিন্তু প্রতিমা ভয়ংকর মেয়ে। এখন বিনো-দা আমাকে সব বলেন। আর তো কেউ নেই। বোন মরেছে। ভাগ্নী শ্বশুরবাড়ি, বিয়ে হয়েছে। ভাগ্নেরা চাকরি করে। আমি পারিনি ওঁকে ছাড়তে। বলেন, দিদি না-বলে মা বলতে ইচ্ছে করে। সব বলেন। বলেন, ভগবান জানেন দিদি ওকে আমি ও-চক্ষে কোনদিন দেখি নি। কিন্তু এসপ্লানেডে পথের ধার থেকে যেদিন ওকে নিয়ে এলাম ওকে বাঁচবার জন্যে, সেদিন থেকে ওর ধারণা হল আমি ওকে ভালবাসি। আমি বলেছি বারবার, তোমাকে আমি ওই চোখে দেখি নে। আমাকে বার বার বলেছে, তবে আমাকে সেদিন ঘুরিয়ে আনলে কেন? পড়ালাম—

পড়লে না। শুধু আমাকে গ্রাস করতে চাইলে। তবু বুঝিয়ে তিরস্কার করে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। আর হিন্দু-বিবাহের ভয়। তারপর নীরা এল। হ্যাঁ। ওকে আমি ভালবেসেছিলাম। সত্যিই মনে হয়েছিল, এই মেয়েটির জন্যে জন্মান্তরে তপস্যা করেছি—এ জন্মেও এতদিন ওর পথ চেয়েই বসে আছি। আমার বয়স বেশী হয়েছিল। কিন্তু আমি জীবনে তপস্যা করে নিজেকে শতঞ্জীব করতে পারতাম। তাই, সে দিন, যখন ওর স্কলারশিপের চিঠি এল; আমিই ব্যবস্থা করেছিলাম; সেদিন মনে হল, এই তো নীরা আমার চিরজীবনের জন্য হারিয়ে যাবে, তখন আর থাকতে পারি নি। ভুলের মাথায় পত্রখানা লিখে ফেললাম। নীরু আমাকে আঘাত দিয়ে চলে গেল। লোকের কাছে—প্রতিমা সম্পর্কে অপরাধের রায় দিয়ে গেল বিচারকের মত। ওদিকে ডাইভোর্স বিল পাস হল। ডাইভোর্স করিয়ে অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে রাক্ষসীকে বললাম—নে গ্রাস কর আমাকে। দিদি—ও আমাকেও বলেনি ওর ব্যাধির কথা। প্রথম দিনেই দেহ স্পর্শ করে বুঝলাম। কিন্তু তখন আর তো পথ ছিল না। আর এত সেবা? এটা কি করে অবহেলা করব বল? তা-ছাড়া আবার কি—? কি হবে বেঁচে! ডাক্তারও তাই বলেন, বাঁচতে যে চাচ্ছেন না উনি!

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীরা।

পায়ের তলায় পৃথিবীটার এপাশ উঠছে—ওপাশ নামছে। না—চারিটা দিক পাক খেয়ে বনবন করে ঘুরছে। সব হিজিবিজি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

অণিমাদি বললেন—নীরা—নীরা! টলছিস। নীরা!

চেতনা হতেই সে ডাকলে—অণিমাদি!

অণিমাদি! কোথায়? অণিমাদি!

—এই যে! যাক সুস্থ হয়েছিস আর একটু শুয়ে থাক!

—আমি তোমার সঙ্গে যাব। অণিমাদি!

উঠে বসল সে। চোখ দিয়ে তার জল পড়ছে। মায়ের মৃত্যুর পর আজ সে প্রথম কাঁদছে। হেরেছে সে। সে হারে তার লজ্জা নেই, দৈন্য নেই, গোপনের চেষ্টা নেই—পৃথিবীর সবার সামনে সে কাঁদছে—কাঁদবে।

*

ডালহৌসিতে যখন পোঁছুল তখন অপরাহ্ন বেলা। তার জন্যে প্রায় বারোঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। একটা মোড় ফিরেই—অণিমাদি বলতে গেলেন—ওই বাংলো—। কিন্তু নীরাই বললে—ওই যে!

গান ভেসে আসছে। সে কণ্ঠস্বর আর নেই—তবুও তার অবশেষ তো যাবার নয়।

"আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে,
চাও কি—
হায়, বুঝি তার খবর পেলে না।"

রিক্‌শাটা থামল। উনি ওদিকের বারান্দায় বসে গেয়ে চলেছেন—সামনে টাঙানো 'মহাশ্বেতা' ছবি—শেষ কলি গাইছেন—

"ডাক উঠেছে বারেবারে,
তুমি সাড়া দাও কি।
আজ ঝুলনদিনে দোলন লাগে,
তোমার পরাণ হেলে না॥
হায়, বুঝি তার খবর পেলে না।"

নীরা এসে পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

—কে? —কে?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে নীরা। বাঁধ ভেঙেছে গঙ্গোত্রীর!

—নীরা?

—আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

—ক্ষমা? আমার ক্ষমার মূর্তিই যে তুমি। কিন্তু এত দেরি করে এলে?

—না—আসি নি। দেরি হয় নি! কিন্তু তুমি মহাশ্বেতার ও কি ছবি এঁকেছ?

—বেশ, কাল থেকে পুণ্ডরীকের পুনর্জীবন আঁকব।

আবার কাঁদতে লাগল নীরা। তার মাথায় হাত রাখলেন বিনয় সেন।

হে অদৃশ্য রঙ্গমঞ্চ-পরিচালক—আর না। যবনিকা ফেল। শেষ কর!

সমাপ্ত

বাংলা ছবির বিবর্তন

সেবাব্রত গুপ্ত

গত এক দশকের বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত-পূর্ণ ও বৈচিত্র্যাভিগ। এই দশকে বাংলা ছবির কূলে এসে আঘাত করেছে বিচিত্র প্রাণচাঞ্চল্যের ঢেউ, পরিচিত তীর থেকে নতুন দিগন্তের সন্ধানে নোঙর তুলেছেন দুঃসাহসিক নবাগতরা। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে বাংলা ছবির ব্যবহারিক ও মানসবাণিজ্যও বিস্তীর্ণ হয়েছে এই অতি আধুনিককালে। অপূর্বতা ও আবিষ্কার ধর্মের এই ব্যাপ্তিকে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া যায় কি না সে প্রসঙ্গ আপাতত স্থগিত রেখে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলা ছবি এখন প্রাচীনের অস্তরাগ ও নবীনের পূর্বরাগের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারের অনুবীক্ষণে এই নব-উন্মেষের মধ্যেও অবক্ষয়ের কোন প্রচ্ছন্ন বীজাণু ধরা পড়বে কি না এই প্রশ্ন আমরা সবিনয়ে উত্থাপন করতে পারি।

আলোচনার ভূমিতে পৌঁছবার আগে সামান্য ভূমিকার প্রয়োজন। চলচ্চিত্র যে শুধু নিষ্প্রাণ যন্ত্রের কারিগরি নয়—এ-সত্য নিঃসংশয়ে স্বীকৃত। গল্প লেখা বা কবিতা রচনা করা হাতের কাজ হয়েও যেমন আর্ট, চলচ্চিত্রও তেমনি যন্ত্রের কারিগরি হয়েও রূপ ও বাণীর মায়াসৃষ্টির ভেতর দিয়ে আর্টের পর্যায়ে উন্নীত। আর সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের সম্বন্ধ যেমন নিবিড়, ছায়াছবির সঙ্গেও দর্শকের সম্বন্ধ তেমনি প্রত্যক্ষ। ছায়াছবি সাহিত্যের ভাষাকে দেয়

উত্তম - সুপ্রিয়া
অভিনীত
উত্তর মেঘ
পরিচালনা
জীবন গাঙ্গুলী
সঙ্গীত · রবীন চ্যাটার্জী
ন্যাশনাল মুভিজ রিলিজ

শুভমুক্তি সমাসন্ন

রূপ ও বাণী। তাই ছায়াছবি জীবনের চলচ্চিত্র, জীবননাট্যের শিল্প বা আর্ট।

বাংলা ছবির নতুন ধারায় চলচ্চিত্রের এই মূল্যায়ন কেমনভাবে এবং কতটুকু স্বীকৃত —এই আলোচনার মাধ্যমেই প্রচ্ছন্ন অবক্ষয়ী বীজাণুর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে। বাংলা চলচ্চিত্রের যে নব-উন্মেষের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তার সুলক্ষণ বহুমুখী—কথাবস্তুর অভিনবত্বে, শিল্প-শোভনতায়, আঙ্গিক সৌষ্ঠব ও কলা-কৌশলের চমৎকৃতিতে এই সুলক্ষণ বেশী স্পষ্ট। শিল্পের দুই রূপ—বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ, বহির্মুখী আর অন্তর্মুখী। গত অর্ধ-দশকের মধ্যে (যদিও বাংলা ছবির নতুন যুগের সূচনা গত এক দশক যাবত) চলচ্চিত্রপটে নতুন বিপ্লবের ধারা যাঁরা এনেছেন তাঁদের সাধনায় চলচ্চিত্র-বিশ্বে বাংলা ছবির মান বেড়েছে—তাঁরা আমাদের গর্বের ধন। কিন্তু এই নতুন দিশারীরা চলচ্চিত্রের বহিরঙ্গ শিল্পে যে বিপ্লব এনেছেন, সেই অনুযায়ী জীবনভাবনার বিচ্ছুরণে ছায়াছবিকে তাঁরা ততটা স্বদীপ্ত করে তুলতে পারেননি (সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী" এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম)।

অলঙ্কার পর্যাপ্তকে ছাড়িয়ে যায়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত শোভাকে বাড়িয়ে তোলে। আর্টের ধর্ম শোভিত হওয়া! সেদিক থেকে বাংলা ছবিকে শোভমান করেছেন এই প্রতিভাবান নবাগতরা। বাংলা ছবিকে তাঁরা অলংকারযুক্ত করেছেন। নববধূর সালংকারা হওয়ার প্রয়োজন লোকসমক্ষে বাহ্য-আড়ম্বরের প্রয়োজনে, দয়িতের সঙ্গে নিভৃত মিলনের মধুক্ষণে অলংকার শুধু অঙ্গের বোঝা, আবর্জনামাত্র। তেমনি ছায়াছবির রূপবৈভবও আবর্জনার মতোই এক পাশে পড়ে থাকে যখন বিস্ময়ের আঘাতে, মূর্ত ও অমূর্তের সম্বন্ধ স্থাপনে ছায়াছবিতে রূপ পায় জীবনের প্রকৃষ্ট চলচ্চিত্র।

শ্রুতিমোহন ও দৃষ্টিনন্দন বিন্যাসের মধ্য দিয়েই ছায়াছবিতে রূপ নেবে জীবনের প্রতিভাস। এ-কথা কখনও দাবী করবো না যে ছায়াছবির রূপকারও কবির মতো বলবেন—"আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার"। অলংকার থাকবে, থাকবে শিল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বরাজ্য—কিন্তু তাতে সঙ্গে সঙ্গে থাকবে জীবনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, চলচ্চিত্রের ভাষা ভাবনার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে উঠবে, শিল্প বহিরিন্দ্রিয়ের প্রতি দাস্যভাব থেকে মুক্ত হয়ে অতীন্দ্রিয়কে করবে ইঙ্গিতময় ও ইঙ্গিতগ্রাহ্য।

নতুন যুগের ইঙ্গিতধর্মী, ব্যঞ্জনাশ্রয়ী ও বুদ্ধিদীপ্ত যে চিত্রসৃষ্টি—যার উদ্ভবের জন্য দায়ী পূর্বোক্ত রূপকারগণ—তাতে যেন অপণ্ডিতের অধিকার নেই। জীবনরসের স্বতঃস্ফূর্তি এতে বর্জিত, হৃদয় আবেদনের পরিবর্তে এতে শুধু কৌশল, নৈপুণ্য ও বুদ্ধিগত প্রাধান্য। পাশ্চাত্য "নিও-রিয়ালিজম" (Neo-Realism)-এর প্রভাব তাঁদের ছবিকে হয়তো সুমিত ও নিয়মের শাসনে মার্জিত ও নিস্তাপ আবেগে মণ্ডিত করেছে; কিন্তু জীবননাট্যের রসে সর্বজন-

গ্রাহ্য, রসোত্তীর্ণ করে তুলতে পারেনি। এ-সকল ছবি বর্তমানে ক্ষণিক আলোড়ন আনবার ক্ষমতা রাখে হয়তো, কিন্তু ভাবীকালে বেঁচে থাকবার ছাড়পত্র থেকে বঞ্চিত হয় অতি সহজেই। নতুন যুগের দিশারীদের ছবিতে আমরা এমন শোভন-শিল্পের প্রকাশ দেখেছি যা চলচ্চিত্রকে আশ্চর্যভাবে সুষমামণ্ডিত করেছে—তাঁদের প্রতিভা শিল্পমানের দিক থেকে বাংলা ছবিকে রক্ষণশীল বিধিবন্ধতার হাত থেকে বাঁচিয়েছে, এই শিল্পমাধ্যমকে পরম রূপৈশ্বর্যে ভূষিত করেছে। প্রয়োগনৈপুণ্য ও শিল্পরূপ-গরিমার দিক থেকে বাংলা ছবি তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছে চিরন্তন আর্টের রাজ্যে স্থায়ী প্রবেশপত্র। কিন্তু সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের যাত্রাস্থল যেখানে এক—মানুষকে জীবন-অভিজ্ঞতার অংশভাগী করা, তার সঙ্গে একীভূত করা—সেখানে এই রূপকারেরা শিল্পীর ঋষিপদ লাভ করতে পারেননি। চলচ্চিত্রের সত্য মূল্যায়নে—চলচ্চিত্র সেখানে শুধু বহিরঙ্গ শিল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বরাজ্যেই অধিষ্ঠিত নয়, জীবননাট্যের নিরুচ্ছ্বাস অবগাঢ়তায় উদ্বেল—তাঁরা সর্বক্ষেত্রে আর্ষ-প্রয়োগের গৌরব অর্জন করতে পারেননি। আশা করবো, নবযুগের পথিকৃৎদের কাছে রসিকজনের এই দাবী একদিন মিটবে।

কিন্তু শিল্পের বহিরঙ্গতার দিকে নতুন যুগের রূপকারদের এই যে অতি-ব্যগ্র অভিযান—যেখানে প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিভার শক্তিকে দাঁড় করাবার নিঃসীম প্রয়াস, শিল্প-আভিজাত্যের রথচক্রতলে জীবনায়ন যেখানে অপঘাত-মৃত্যুর সম্মুখীন, জীবনের ভাষা যেখানে ব্যাকরণিক—তার মধ্যে বিপ্লবের উত্তেজনা আছে, কিন্তু বিবর্তনের স্থিতনিষ্ঠ নির্দেশ নেই। বাংলা ছবির নব-উন্মেষের আলোড়নে এই যে বহির্মুখী শিল্প-সাধনা—অন্তর-চেতনায় যা উদ্বুদ্ধ নয়, জীবনের মর্মরসে যা আলিপ্ত নয়, অনুভূতির সংঘাতে উদ্দীপ্ত নয়—তার মধ্যে চলচ্চিত্রের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নেই। এই সাধনায় চলচ্চিত্র জীবনবিচ্ছিন্ন—জীবন ও শিল্পের যে বিচ্ছেদে আত্মগোপন করে আছে অবক্ষয়ের নির্মম সম্ভাবনা।

যাত্রা ও গীতিনাট্য

প্রভাংশু গুপ্ত

বাংলা দেশের যাত্রা ও গীতি-নাট্যের সম্পর্ক অতি নিবিড় বলা যেতে পারে। এই গীতি-নাট্যের জন্মপরিচয়ের অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এ ধরনের নাটিকার মূল উৎস বাংলার যাত্রা। পাশ্চাত্ত্য দেশের গীতি-নাট্য সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না, কারণ ওই সব দেশের সংগে যাত্রার কোন-দিন পরিচয় ছিল না। পাশ্চাত্ত্যে গীতি-নাট্যের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি নিতান্ত স্বতন্ত্র ধরনের। ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যে গীতি-নাট্যকে বলে অপেরা। অনেকে অপেরা ও ব্যালে, এই দুটিকেই একই শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করে থাকেন, কিন্তু সেটা সংগত নয়। অপেরা মানে গীতিনাট্য। ব্যালে বোঝায় নৃত্যনাট্য।

বাংলা দেশে ইংরেজী ধরন ও ঢঙের থিয়েটার, প্রতিষ্ঠিত হবার আগে, অর্থাৎ উনবিংশ শতকে এবং তারও বহু আগে যাত্রার বহুল প্রচলন ছিল। সাধারণের আনন্দ পরিবেষণে যাত্রার প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। যাত্রার মাধ্যমেই বিতরণ করা হত লোকশিক্ষা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, ভক্তি ও আনন্দ।

যাত্রার আগে বাংলাদেশে আনন্দের রস যোগান দিত ঝুমুর, পাঁচালী, কবির লড়াই, কথকতা প্রভৃতি। বিভিন্ন শ্রেণীর হলেও উপাদান প্রায় অভিন্ন বলে এগুলিকে এক কথায় পালাগান বলা চলে। তবে বোল আনা পালাগানের সংগে ঝুমুর প্রভৃতির কিছুটা তফাত ছিল বইকি! পালা-গান কোন একটা পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে অংগভঙ্গি ও সংগীতের সাহায্যে পাত্র-পাত্রী অভিনয় করতেন। তাতে কমপক্ষে দুই বা তিন জন পাত্র-পাত্রী থাকতেন। সামান্য কিছু সংলাপও থাকত। আজকালকার সিরিয়স বা গুরুত্বপূর্ণ নাটকে গুরুভার দৃশ্যাবলীর মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়, ওই সব পৌরাণিক ভক্তিরসাত্মক পালাগানেও মাঝে মাঝে হাস্য-রসেরও ব্যবস্থা করা হত। মূল গায়েন ও তাঁর দোহারেরা এই পালাগানের সংগীতাংশ ও নাটকীয় আলাপ অংশ চালাতেন। ঝুমুরে চলত দৈবতগান ও নৃত্য। পাঁচালীতে পাত্র-পাত্রী বলতে থাকত একজন। তার হাতে থাকত একটি চামর।

বাংলা দেশে এই পালাগানের পরবর্তী রূপ হল যাত্রা। যাত্রা ঠিক কবে থেকে এদেশে আত্মপ্রকাশ করে, তার সঠিক সন বা তারিখ না জানলেও একথা জানা যায়, ষোড়শ শতকে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এক যাত্রার পালায় অভিনয় করেছিলেন। যাত্রা-পালাটির নাম 'রুক্মিণী-হরণ'। শ্রীচৈতন্য-দেব লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। যাত্রার প্রথম যুগে বাঁধা পালার আবির্ভাব হয়নি। পাত্র-পাত্রীরা যাত্রার আসরে অভিনয়ের সময়ই গান, কথাবার্তা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী তৈরি করে নিতেন। তার পর এল বাঁধা পালা। এই বাঁধা পালার অভিনয় চলত তিন-চার দিন ধরে। তবে প্রতিটি দিনের অভিনয় অংশটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল,—এই নিয়মেই বাঁধা পালা রচনা করা হত।

অতি প্রাচীন যাত্রার মধ্যে 'কৃষ্ণযাত্রা', 'চণ্ডীযাত্রা', 'চৈতন্যযাত্রা' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব যাত্রায় পাঁচালী ও পরে কীর্তনের প্রভাব খুব বেশী এসে পড়ে। গোপাল উড়ের 'বিদ্যা-সুন্দর' যাত্রার পালা এককালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'কমলে কামিনী', 'ঊষা-হরণ' প্রভৃতি যাত্রা পালাগুলিও কম খ্যাতি অর্জন করেনি। যাত্রার মূল পরিচালক ছিলেন অধিকারী। এই অধিকারীরাই বাঁধা পালা রচনা করতেন,—অর্থাৎ তাঁরা গান বাঁধতেন, গানে সুর দিতেন, পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে মাল-মসলা নিয়ে ঘটনাবিন্যাস ও সংলাপের ব্যবস্থা করতেন। অধিকারীদের এই সব যাত্রাগানের পাণ্ডুলিপির অধিকারী ছিল তাঁদেরই সন্তানরা। অন্য কারও অধিকার ছিল না এই সব পাণ্ডুলিপির।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে-সব যাত্রাগানের প্রচলন হয়, তা প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় বলা চলে। ইংরাজী

নাটকের অনুকরণে সংলাপ ও তার সঙ্গে প্রাচীন যাত্রা, পাঁচালী, কীর্তন ইত্যাদির সংমিশ্রণে যাত্রার নতুন রূপ সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম নাটক তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাত্রাপালার সংশোধিত সংস্করণ এই নাটককে বলা যেতে পারে। যাত্রার পালা-বাঁধার ও থিয়েটারের নাটক রচনার মূলগত পার্থক্য খুব বেশী হলেও 'ভদ্রার্জুন' নাটকে যাত্রার রচনাপদ্ধতিই বেশী অনুকরণ করা হয়েছে।

এই সময়ে যাত্রা ও গীতিনাট্যের মাঝামাঝি একপ্রকার গীতাভিনয় এদেশে দেখা গিয়েছিল। এই সব গীতাভিনয় প্রায় ষোল আনা নাটকের মতই। তফাতের মধ্যে অভিনয়ে দৃশ্যপটাদির ব্যবস্থা ছিল না। এর কারণ সম্বন্ধে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-'-এ লিখেছেন—"রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া সকলের পক্ষে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন সম্ভবপর ছিল না।"

কাজেই খোলা আসরে বিনা দৃশ্যপটে ও ঐকতানবাদনে যাত্রার অনুকরণেই এই সব গীতাভিনয় হত। তবে যাত্রার 'জুড়ি-দোহার' এই সব গীতাভিনয়ে ছিল না। কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাজসজ্জার পরিবর্তন ছিল। যাত্রায় কিন্তু এই সাজ-সজ্জার পরিবর্তনের বালাই ছিল না।

ক্রমে এই গীতাভিনয় গীতিনাট্যে রূপান্তরিত হল। গীতাভিনয়ের কাঠামোর পরিবর্তন হল না। পরিবর্তন হল আনুষঙ্গিক পরিবেশ। এল ঐকতানবাদন, দৃশ্যপট, বিবিধ সাজসজ্জা ও অভিনয়ের আসর বসল ইংরেজী ধরনের রঙ্গমঞ্চের উপর—খোলা আসরে নয়।

যাত্রার মূল প্রাণ তার প্রচণ্ড গতিবেগ,—যেটাকে আমরা ইংরেজীতে বলি 'টেম্পো'। যাত্রার গানের মাধ্যমে কাহিনী যেন রুদ্ধ-নিশ্বাসে ছুটতে থাকে, যতক্ষণ না সে তার

লক্ষ্যস্থলে অর্থাৎ যবনিকাতে এসে পৌঁছয়। কিন্তু থিয়েটারের নাটকে কাহিনীর এ-রকম প্রচণ্ড গতিবেগ নেই। থিয়েটারের নাটকের পর্যায়ভুক্ত একমাত্র গীতিনাট্যে যাত্রাসুলভ এই গতিবেগের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যাত্রায় কাহিনী প্রধানত সংগীতের এবং কিছুটা কথোপকথনের মাধ্যমে এগতে থাকে। গীতিনাট্যেও ব্যবস্থা অনুরূপ। টেকনিক প্রায় একই রকমের। তবে চমকপ্রদ দৃশ্যপট, ঐকতানবাদন, আলোর বাহার এবং বিচিত্র সাজসজ্জা ও তার ঘন ঘন পরিবর্তন, এই সব পরিবেশের ভিতরে গীতিনাট্য নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। এই জন্য যাত্রাগান ও গীতিনাট্য মনে-প্রাণে এক হলেও এ দুটির বাইরের রূপ হুবহু এক নয়। কিন্তু বাংলা দেশে যাত্রাগানের বিবর্তনের পরিসমাপ্তি গীতিনাট্যে। তাই শুরুতেই বলেছি, বাংলা দেশে যাত্রাগান ও গীতিনাট্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়।

নাটকের শ্রেণী বিভাগের পরিধি থেকে গীতিনাট্যকে এবং নৃত্যনাট্যকে বাদ দিয়ে বাকী যে-সব নাটক থাকে—অর্থাৎ ট্র্যাজেডি বা দুঃখময় নাটক, কমেডি বা সুখময় নাটক, ভাবপ্রধান নাটক, বস্তুতান্ত্রিক নাটক, মেলোড্রামা, রোমান্টিক নাটক ইত্যাদির সঙ্গে যাত্রার একেবারে মিল নেই।

যাত্রার সঙ্গে থিয়েটারের নাটক বলতে যা বোঝায়, তার পার্থক্য সম্বন্ধে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক দৃষ্টান্তের উদাহরণ দিয়ে চমৎকার বুঝিয়ে দিয়েছেন—"ধর কালিদাসের 'শকুন্তলা' আরম্ভ হল—হরিণ-শিকারে চলেছেন রাজা রথ চালিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে। থিয়েটারওয়ালা এখানে ঠেকবে, এটা নিশ্চয়। গতিবেগ নেই রথের, হরিণের, কিছুরই; স্থির দৃশ্যপট, স্থির কাঠ-কাগজে-কাদায়-মাটিতে গড়া রথ ঘোড়া সবই—তার উপরে খাড়া সচলাচল রাজা স্টেজের উপরে, রাজার মৃগয়াযাত্রার একটা বৈরূপ্য ঘটন ছাড়া কিছুই সম্ভব হয় না। কাজেই থিয়েটারের স্টেজে এ অংশ সুযোগ্য লোকে বাদ দিয়ে যান। যাত্রাওয়ালা এখানে নির্ভয়—সে গানের পর জুড়ির গান বর্ণনা জুড়ে দর্শকের মনোরথ তেজে নিয়ে ফেলে আশ্রমের কাছে। গীতচ্ছন্দে স্যন্দন চলল হরিণ দৌড়ল নানা বর্ণের মধ্যে দিয়ে দৃশ্য-

পরম্পরা ছাড়িয়ে, চলে গেল মন অতি সহজ উপায়ে যাত্রাতে,—সচল মনোরথ (স্বচ্ছন্দ গতি পেলে সুর ও ছন্দের সাহায্যে)—এই ছিল যাত্রার বিশেষত্ব। থিয়েটারে যেটা ঘটানো অসম্ভব, সেটা সুসম্ভব হল যাত্রার অধিকারীর কাছে (দিলে সে হাঁকিয়ে রথের জুড়ি ঘোড়া আসরের মধ্যে। নির্ভয়ে—ধুলো লাগল না দর্শকের গায়ে, বালি পড়ল না কারুর চোখে, দুয়ো দিলে না কেউ।" (যাত্রা ও থিয়েটার)

কিন্তু গীতিনাট্যের বেলায় এই কথাটা সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা যায় না। যেহেতু দুইয়ের কাঠামো প্রায়ই এক এবং গীতের সাহায্যেই ঘটনাবলীকে যাত্রা ও গীতিনাট্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গীতিনাট্যের সঙ্গে যাত্রার যেখানে অমিল তা পূর্বেই বলেছি। গানের সাহায্যে ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় যাত্রায় জুড়ির গানের ও অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে। গীতিনাট্যে ঘটনা এগতে থাকে অভিনেতা-অভিনেত্রীর গানের

ও অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে।

বাংলা দেশে যাত্রার পরিপুষ্টি সাধন হয় সবচেয়ে বেশী ১২৮০ সালে।

যাত্রার উৎকর্ষ সাধনে উপরে যে কয়েক-জনের নাম উল্লেখ করলাম, তাঁরা ছাড়াও আরও অনেকে যাত্রার ক্রমোন্নতিতে সাহায্য করেছেন। তাঁরা ছিলেন যাত্রার অধিকারী।

ইংরেজের অনুকরণে থিয়েটার বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে যাত্রার প্রভাব ও আদর কমতে শুরু হল। ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত যাত্রার বেশ প্রচলন ছিল।

বর্তমানে বাংলার রঙ্গমঞ্চে সামাজিক, সমস্যামূলক বা বস্তুতান্ত্রিক নাটকের সমাদর বেশী। কাজেই ভাল গীতিনাট্য হালফিল আর রচিত হয়নি এবং রঙ্গমঞ্চেও দেখা যায়নি।

গীতিনাট্যকে বাংলা দেশে অনাদর করলে চলবে না, কারণ বাংলার নিজস্ব যাত্রার পরিণত-বয়স্কের রূপ হল বাংলার গীতি-নাট্য।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার, ৬নং সুতারকিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১, আনন্দ প্রেস, হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।